পদ্মার পলিদ্বীপ

আবু ইসহাক

BanglaBook.org

আবু ইসহাক শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন শিবঙ্গল গ্রামে ১৩৩৩ সালের ১৫ই কার্তিক (১লা নভেম্বর, ১৯২৬) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৪ সালে আই. এ পাশ করেন। এর ষোল বছর পর ১৯৬০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান পাকিস্তান) থেকে বি.এ. পাশ করেন। দেশে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে এবং বিদেশে কূটনৈতিক পদে তিনি কর্মরত ছিলেন। দেশের বাইরে আকিয়াব ও কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ভাইস-কনসাল ও ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী ১৯৬২-৬৩ সালে তাঁকে সাহিত্য-পুরস্কারে সম্মানিত করে। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে ১৯৮১ সালে তিনি সুন্দরবন সাহিত্য পদক ও ১৯৯৭ সালে একুশে পদক লাভ করেন। তিনি ২০০৪ সালে মরণত্তোর রাষ্ট্র প্রদত্ত স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন। আবু ইসহাক বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রতিভা। তাঁর রচিত উপন্যাস *'সূর্য-দীঘল বাড়ী'* একটি স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি।

www.BanglaBook.org

উভয় বাংলার অল্পক'টি সার্থক উপন্যাসের মধ্যে সূর্য-দীঘল বাড়ী একটি। তাঁর লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস *'পদ্মার পলি দ্বীপ'* পদ্মা পাড়ের বেঁচে থাকার জীবন যুদ্ধেরত মানুষের কঠিন ও বাস্ড়ব চিত্র গাঁথা।

সূর্য-দীঘল বাড়ী অনূদিত হয়ে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সূর্য-দীঘল বাড়ী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র ছ'টি আন্তর্জাতিক এবং বিভিন্ন বিভাগে ন'টি জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

তাঁর ছোট গল্পগ্রন্থ 'মহাপতঙ্গ' গ্রন্থের 'The Dragonfly' (মহাপতঙ্গ) গল্প অবলম্বনে রচিত চিত্রনাট্য সুইজ্যারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে। 'হারেম' নামে তাঁর প্রথম ছোটগল্প-গ্রন্থটির তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অভিশাপ' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত নবযুগ (কলকাতা) পত্রিকায়।

প্রচ্ছদ : রাগীব আহসান

আমেরিকা, নিউইয়র্ক থেকে

www.BanglaBook.org

পদ্মার পলিদ্বীপ

আবু ইসহাক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

Padmar Palidwip A Novel By Abu Ishaque.
Published by Eftakher Rasul George on be-half of Nawroze Sahitya Samvar/Nasas 46 P. K. Ray Road/Banglabazar, Dhaka-1100. First Print April 1986. 6th Edition August 2016. Cover by Ragib Ahshan. Price Taka Three hundred Only.

ISBN 984-702-019-6

@ পরিবারবর্গ

অনলাইনে আমাদের বইয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
www.rokomari.com অথবা কল করুন এই নাম্বারে : ০১৫১৯-৫২১৯৭১-৫

একমাত্র পরিবেশক	: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
কলকাতা পরিবেশক	: রিতা ইন্টারন্যাশনাল, কলকাতা-৭০০০৪৯
গ্রন্থপল্লী পরিবেশক	: উত্তরণ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
কানাডা পরিবেশক	: অন্যমেলা, ৩০০ ড্যানফোর্ট এভিনিউ, ফার্স্ট ফ্লোর সুইট # ২০২, টরেন্টো, কানাডা।
	: এটিএন মেগা স্টোর, ২৯৭০ ড্যানফোর্ট এভিনিউ, টরেন্টো, কানাডা।
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	: সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ইউ. কে.।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশনায়	নসাস নওরোজ সাহিত্য সম্ভার'-র পক্ষে ইফতেখার রসুল জর্জ ৪৬ পি. কে. রায় রোড/বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ	এপ্রিল ১৯৮৬
ষষ্ঠ সংস্করণ	অগাস্ট ২০১৬
নব প্রচ্ছদ	রাগীব আহসান
কম্পোজ	ক্রেস মিডিয়া'-র পক্ষে নসাস ঢাকা'-র কম্পিউটার বিভাগ ৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে	প্রান্তিকা মুদ্রণী ৪৩ ডি. এন. এস রোড, ঢাকা-১২০৪
মূল্য	তিনশত টাকা মাত্র

উৎসর্গ

বড় ভাই মোহাম্মদ ইসমাইল-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

পদ্মার পলিদ্বীপ সম্পর্কে দেশি-বিদেশী অভিমত

...একখানা উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। ইহার অনেক জায়গা একাধিকবার পড়িয়াছি। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ছাড়িয়াই দিলাম।...এত ব্যাপক, বিস্তৃত, জটিল অথচ সুসংহত এবং স্বচ্ছন্দ কাহিনী কমই পড়িয়াছি।...এই উপন্যাসে নানা কাহিনীর সুষম সমাবেশ হইয়াছে, পদ্মার বিধ্বংসী লীলার যথাযথ বর্ণনা আছে,...। এই বর্ণনা প্রত্যক্ষ, পুঙ্খানুপুঙ্খ অথচ সংযত, অশ্লীল কাহিনীতে কোথাও শ্লীলতার অভাব দেখা যায় না। জরিনা-ফজলের যৌনমিলনের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহার মধ্যে জরিনাই অগ্রণী। তাহার ধর্মবোধ তীক্ষ্ণ। সে জানে সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় নীতির দিক দিয়া সে পাপিষ্ঠা, কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় বলা যাইতে পারে, *'পর্বত গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী সিন্দুর উদ্দেশে, কার সাধ্য রোধে তার গতি'*। ব্যভিচারের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ, অথচ সংযত বর্ণনা আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।
ইতিহাস মানুষের কাহিনী বলে, যে কাহিনী ঘটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য জীবন্ত, তাহার প্রধান গুণ উর্ধ্বমুখী অভীপ্সা এবং তাহার প্রাণ আইডিয়া। চরের প্রজারা জমিদার ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গোদের দ্বারা অপমানিত হয়। হেকমত সমস্ত জীবন মহাজনের ঋণ শোধ করিতেই চুরি করিয়া বেড়ায়। ফজল ছেলেমানুষ, কিন্তু জমিদারের নায়েব যে তাহার পিতাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় নাই তাহার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর সে দিয়াছে। রূপজান কিছুতেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে পীরসাহেবের বিবি হইতে চায় নাই। জরিনা ধর্মভীরু। কিন্তু যে শাস্ত্র তাহার হৃদয়ের অন্তরতম সত্যকে উপলব্ধি করে নাই তাহাকে সে মানে নাই আর আদর্শবাদী বিপ্লবী এই উপন্যাসকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।

ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
১৯ জুন, ১৯৯১ তারিখে আবু ইসহাককে লিখিত তাঁর পত্রের কিছু অংশ।
সম্পূর্ণ পত্রটি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র-এর মাসিক মুখপত্র 'বই' নভেম্বর, ১৯৯১-এ প্রকাশিত।

...পদ্মার পলিদ্বীপ প্রতিভার সৃষ্টি। ...এই উপন্যাসের জরিনার মত চরিত্র এক শরৎচন্দ্র আঁকিতে পারিতেন। একাধিক বার পড়ার পরও আমি এই চরিত্রটির রহস্য অনুধাবন করার চেষ্টা করি। বারংবার প্রশ্ন জাগে—যদি হেকমত জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিত তাহা হইলে এই ধীর স্থির অবিচলিত রমণী কি উত্তর দিত।

আবু ইসহাক-এর নিকট ২৮ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে
ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-এর লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃতি।

তাঁর প্রথম উপন্যাসের মতো এটাও পল্লীজীবন ভিত্তিক, এখানেও জীবনবোধ তীক্ষ্ণ, বাস্তব জীবনের পরিবেশন অকৃত্রিম ও সত্যনিষ্ঠ। তবে *'সূর্য-দীঘল বাড়ী'*-র চাইতে বর্তমান উপন্যাসের পরিমণ্ডল বৃহত্তর, জীবন সংগ্রামের চিত্র এখানে আরো দ্বন্দ্বমুখর ও তীব্র নাটকীয়তা তা অধিকতর উজ্জ্বল। এবং কাহিনীর পটভূমি-পরিবেশও ভিন্নতর।...উপন্যাসটিতে লেখক একই সঙ্গে গভীরতা ও বিস্তার এনে একে এপিকধর্মী করার প্রয়াস পেয়েছেন।

দীর্ঘদিন পরে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশিত হলেও আবু ইসহাক *'পদ্মার পলিদ্বীপ'* উপহার দিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর পূর্বখ্যাতিকে শুধু অমলিন রাখেননি, আমার বিবেচনায় তাকে আরো সম্প্রসারিত করেছেন।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বেতার বাংলা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭.

আবু ইসহাকের এই উপন্যাসটিও সাহিত্য-রসাস্বাদক। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে চ্যালেনজ রাখার সাহস রাখে। টানাপোড়েন সমাজ-জীবনের জলজ্যান্ত নিখুঁত ছবিতে উপন্যাসটি ভরিয়ে তোলায় লেখক আরেকবার প্রমাণ করলেন নিছক কাহিনী নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা, জীবনসংগ্রাম, প্রেম, যা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে ভাবায়, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কাঁদায়, সেগুলোই সাহিত্যের আসল মূলধন। এই মূলধনকে সাহিত্য করে তোলায় আবু ইসহাকের ক্ষমতা অপরিসীম। তাই এই রচনা সমাজের রসকষহীন প্রিনটেড ডকুমেন্ট হয়ে ওঠেনি।

একথা স্বীকার করতেই হয়, আবু ইসহাক পাঠককে টেনে রাখার জাদু জানেন। গ্রাম্য সেন্টিমেন্টের সঙ্গে ত্রিকোণ প্রেম, ত্রিকোণ প্রেমের সঙ্গে বাস্তব বোধ, বাস্তব বোধের সঙ্গে গ্রাম্য রাজনীতি সব মিলিয়ে একটি আদর্শ উপন্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুরঙ্গ : কলকাতা এপ্রিল, ১৯৮৭.

প্রাণবন্ত, যথাযথ আঞ্চলিক ভাষার বলিষ্ঠ ব্যবহার উপন্যাসকে খুবই আকর্ষণীয় করেছে; বলাবাহুল্য, 'পড়তে শুরু করলেই বই শেষ না করে থাকা সম্ভব নয়'—কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। একই কারণে বইয়ের প্রতিটি চরিত্রই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।...জরিনার চরিত্রটি নায়ক ফজল ও নায়িকা রূপজানের চরিত্রের চাইতেও বেশি জীবন্ত মনে হয়েছে। যেন টলস্টয়ের বিখ্যাত নায়িকা আনা কারেনিনার গ্রাম-বাংলার চর অঞ্চলের অতি চেনা সংস্করণ।

দীপঙ্কর : মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা : বৈশাখ, ১৩৯৪.

কিন্তু এই মিলনান্ত নাটকীয়তার সঙ্গে মিশেছে একটা বলিষ্ঠ আধুনিক চেতনা। এটাও এ উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য বটে, এ কালের আধুনিকতার সেই মেরুদণ্ডহীন শিল্পাদর্শ থেকে যা ভিন্ন। বিবাহ, তালাক ইত্যাদিকে ঘিরে ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার মনের অন্ধকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস করে, এই গল্পের নায়ক সেটিকে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

দৈনিক বাংলা : ঢাকা : ১১ আষাঢ়, ১৩৯৪.

...*'পদ্মার পলিদ্বীপ'* ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, ভাষা বাকভঙ্গী নিয়ে এক অনবদ্য সৃষ্টি। *'সূর্য-দীঘল বাড়ী'*-তে যে আবু ইসহাক অপরিমেয় অভিজ্ঞতায় সমতলের সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামের নিবিড় কাহিনী তুলে ধরেছিলেন; *পদ্মার পলিদ্বীপে* তিনি হয়েছেন আরো বেশি জীবনঘনিষ্ঠ, চরের সংগ্রামী মানুষের ব্যথা বেদনায়, ক্রোধ-মমতায় আরো বেশি

নিবিষ্ট। তাই *'পদ্মার পলিদ্বীপে'* জীবন ধরা দিয়েছে কোন তন্ত্র কিংবা দর্শন নির্ভর করে নয়। এই উপন্যাসে চিত্রিত জীবন-সংগ্রামে নদীনালা-নির্ভর বাংলাদেশের এক উপেক্ষিত অথচ বৃহত্তর পরিধির আকাশ-বাতাস, ঘাস-জমিন, মাছ-ফসল, প্রকৃতি আবহাওয়া যেন কথা কয়ে গেছে একান্ত নির্লিপ্তভাবে।....

দৈনিক ইত্তেফাক : ঢাকা : ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৭.

'পদ্মার পলিদ্বীপ'-এ চিত্রিত হয়েছে পদ্মার চরাঞ্চলের জীবন, এই জীবনের সঙ্গে আবু ইসহাক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।...তিনি একটি জটিল জীবনের চিত্র এঁকেছেন, এই জটিলতা *'সূর্য-দীঘল বাড়ী*-তে নেই।...আবু ইসহাক পল্লীজীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। *পদ্মার পলিদ্বীপে* পল্লীজীবনের একটা বিশেষ দিক, চরাঞ্চলের সংঘাতময় জীবনের কথা নিয়ে লিখেছেন। এই বিশেষ দিকটির সঙ্গে তিনি উত্তমরূপে পরিচিত। বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার জগৎকে তিনি জানেন এবং তার অনেক চিত্র দিয়েছেন।

উত্তরাধিকার : বাংলা একাডেমীর সাহিত্য-পত্রিকা, অকটোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭.

সবশেষে ঔপন্যাসিক যে ভাবেই শেষ করুন না কেন ফজল-জরিনার মানবিক সম্পর্ককে সত্যিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সামাজিকতা, ধর্মীয় অন্ধতা, বিবেকের উত্তেজনা সবকিছুকে ছাপিয়ে কিভাবে দুটি কাঙ্ক্ষিত হৃদয় পরস্পর কাছাকাছি নিবিড় আলিঙ্গনে যায় তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পটভূমি গ্রাম কিন্তু বিশ্লেষণটা আধুনিক—এখানেই আবু ইসহাকের শিল্পের সার্থকতা।

দৈনিক বাংলা : ঢাকা : ৩ জুন, ১৯৯৪.

Though the total context and plot of Ishaq's second novel *Padmar Palidwip* is a different one, here the indomitable human spirit is also present as a theme as experienced in the first novel. The vast canvas encompassing the whole populace of the story's locality, their thoughts and feelings, love and hatred, their invincible zeal and their defeat, gives the book and epic disposition.

Weekend Magazine of the Independent :
Dhaka, dated May 28, 1999.

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নসাস প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

- ❒ *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ) নসাস ঢাকা
- ❒ *পদ্মার পলিদ্বীপ* (পঞ্চম সংস্করণ) নসাস ঢাকা

সমগ্র

- ❒ *উপন্যাস সমগ্র* নসাস ঢাকা
- ❒ *নির্বাচিত গল্প* সমগ্র নসাস ঢাকা
- ❒ *গল্প সমগ্র* নসাস ঢাকা

কিশোর রহস্যোপন্যাস

- ❒ *জাল* নসাস ঢাকা ঢাকা
- ❒ *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (কিশোর) নসাস ঢাকা

গল্পসঙ্কলন

- ❒ *হারেম* নসাস ঢাকা
- ❒ *মহাপতঙ্গ* নসাস ঢাকা
- ❒ *স্মৃতিবিচিত্রা ও অগ্রন্থিত গল্প* (প্রথম মুদ্রণ) নসাস ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পুর্বের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। টুকরো টুকরো মেঘের ওপর লাল হলুদের পোঁচ। দপদপ করে জ্বলছে শুকতারা। ঐদিকে তাকিয়ে ফজল বলে, 'ধলপহর দিছেরে নূরু, পোয়াত্যা তারা ওঠেছে। আরো জলদি করণ লাগব।'

দুজনেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সূর্য ওঠার আগেই কাঁকড়ামারির মুখে পৌছতে হবে তাদের। আলো দেখার সাথে সাথে মাছ তাদের রাতের আস্তানা ঢালু কিনারা ছেড়ে সরে যাবে গভীর পানিতে।

নদীর ঢালে জাল দিয়ে মাছ ধরছে চাচা। দশ বছরের ভাইপো ডুলা নিয়ে ফিরছে তার পিছু পিছু। চাচা জাল ঝেড়ে মাছ ফেলে। ভাইপো কুড়িয়ে নিয়ে রাখে ডুলার ভেতর। চিংড়ি আর বেলে মাছই বেশির ভাগ।

ফজল আবার জালটাকে গোছগাছ করে তার একাংশ কনুইর ওপর চড়ায়। বাকিটা দু'ভাগ করে দু'হাতের মুঠোয় তুলে নেয়। তারপর পানির দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁকি মেলে ছুড়ে দেয় নদীর পানিতে। দূরে গিয়ে অনেকটা জায়গার ওপর ওটা ঝপ করে ছড়িয়ে পড়ে।

ঝাঁকি জাল। কড়া পাক দেয়া সরু সুতোয় তৈরি। পানিতে ভিজে ভিজে সুতো পচে না যায় সেজন্য লাগানো হয়েছে গাবের কষ। কষ খেয়ে খেয়ে ওটা কালো মিশমিশে হয়েছে। জালের নিচের দিকে পুরোটা ঘের জুড়ে রয়েছে *'ঘাইল'*—মাছ ঘায়েল করার ফাঁদ। ঘাইলগুলোর সাথে লাগান হয়েছে লোহার কাঁঠি।

এ লোহার কাঁঠির কাজ অনেক। কাঁঠির ভারে ভারী হয় বলেই জালটাকে দূরে ছুড়ে মারা সম্ভব হয়। আর ওটা তাড়াতাড়ি পানির তলায় গিয়ে মাটির ওপর চেপে বসতে পারে। জাল টেনে তুলবার সময় আবার কাঁঠির ভারের জন্য ফাঁদগুলো মাটির ওপর দিয়ে ঘষড়াতে ঘষড়াতে গুটিয়ে আসে। গুটিয়ে আসে চারদিক থেকে মুখ ব্যাদান করে। জালের তলায় আটকে পড়া মাছ পালাবার পথ পায় না।

জালটা স্রোতের টানে কিছুটা ভাটিতে গিয়ে মাটির ওপর পড়েছে। ফজল তার কবজিতে বাঁধা রাশি ধরে ওটা আস্তে আস্তে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে টেনে তোলে। যেন কোনো জলরাক্ষসীর উপড়ে তোলা একমাথা চুল।

জালের মধ্যে ছড়ছড় আওয়াজ। চকচকে সাদা মাছগুলো অন্ধকারেও চেনা যায়। কয়েকটা টাটকিনি। নূরু খুশি হয়ে ওঠে।

ফজল মাছগুলো জাল থেকে ঝেড়ে ফেলে। নূরু চট্‌পট্‌ হাত চালিয়ে ডুলায় তোলে শুনে শুনে, এক-দুই-তিন—। বড় একটা টাটকিনি তার হাত থেকে পিছলে লাফ দিয়ে গিয়ে পানিতে পড়ে। ওটা ধরবার ব্যর্থ চেষ্টায় ওর কাপড় ভিজে যায়। কাদা মেখে যায় শরীরে।

জাল ফেলতে ফেলতে তারা উজানের দিকে এগিয়ে যায়। রাত তিন প্রহরের সময় তারা মাছ ধরতে এসেছে। ডুলাটা মাছে ভরে গিয়েছিল একবার। ফজল সেগুলো গামছায় বেঁধে নিয়েছে। ডুলাটা আবারও ভরভর হয়েছে। ওটা বয়ে নিতে নূরুর কষ্ট হচ্ছে খুব।

পশু-পাখির ঘুম ভেঙেছে। জেগে উঠেছে কাজের মানুষেরা। গস্তি নৌকার হালে গুড়ি মারার শব্দ আসছে কেড়োত-কোড়োত। ঝপ্‌পত্‌ঝপ্‌ দাঁড় ফেলছে মাঝিরা। অনুকূল বাতাস পেয়ে নৌকায় পাল তুলে দিয়েছে কেউ বা রাত্রির জন্য কোনো নিরাপদ ঘোঁজায় তারা পাড়া গেড়ে ছিল। বিশ্রামের পর আবার শুরু হয়েছে যাত্রা। অন্ধকার মিলিয়ে যেতে না যেতে অনেক পানি ভাঙতে হবে তাদের।

আলো আর আঁধারের বোঝাপড়া শেষ হয়ে এসেছে। আঁচল টেনে আঁধার ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে। চরের লটা আর কাশবন মাথা বের করেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে ঘোলাটে পানি।

আশ্বিন মাস। পদ্মা এখন বিগতযৌবনা। তার ভরা যৌবনের তেজ আর দুরন্তপনা থেমেছে। দুর্দম কাটালের কলকলানি আর নেই। পাড়ের দেয়ালে নিয়ন্ত্রিত তার গতি শ্রান্ত শিথিল স্রোত কুলুকুলু ধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছে এখন

'দুদু, অ দুদু!'

'কি রে ?'

'শিগগির আহো। ঐখানে একটা বড় মাছে ডাফ দিছে।'

'দুও বোকা! ডাফ দিয়া ও কি আর অইখানে আছে!'

ফজল তবুও জাল ফেলে। পায় দুটো বড় বেলে মাছ। বেশ মোটাসোটা। সে নিজেই এ দুটো ডুলায় তুলে দেয়। নূরুর ছোট হাতের মুঠোয় এ দুটোকে সামাল দেয়া সম্ভব নয়।

ফজল চারদিকে চোখ বুলায়। তরতর করে উজিয়ে যাচ্ছে পালতোলা নৌকা। মাঝনদীতে চেরা চিচিঙ্গের মতো লম্বা জেলে নৌকা মৃদু ঢেউয়ের দোলায় দুলছে এদিক-ওদিক। জগতবেড় জাল ফেলে রাতভর প্রহর গুনছিল জেলেরা। রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই জাল টানতে শুরু করেছে তারা।

পুব আকাশে সোনালি সূর্য উঁকি দিয়েছে। কালো রেখার মতো দিগন্তে গাছের সারির আভাস ফুটে উঠেছে।

ফজল এগিয়ে গেছে কিছু দূর। চট্‌পট্‌ পা চালিয়ে নূরু ধরে ফেলে চাচাকে। সে সামনের দিকে তাকায়। কাঁকড়ামারির মুখ এখনো দেখা যায় না। তাদের ডিঙিটা কাঁকড়ামারির খাঁড়িতে লটাখেতের আড়ালে বেঁধে রেখে এসেছে তারা। সামনের বাঁকটা পার হলেই সেই খাঁড়ির মুখ দেখা যাবে। নদীর এ সরু প্রশাখাটি উত্তর-পশ্চিম থেকে চরের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে নদীর দক্ষিণ শাখায় গিয়ে মিশেছে।

'ও-ও-ও-দুদু, দুদু...!'

'কিরে কি...কি ?'

ফজল জালের মাছ ঝেড়ে রেখে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। নূরুর ভীত কণ্ঠের ডাক শুনে ছুটে আসে সে।

মাছ কুড়াবার সময় নূরুর ডান হাতে একটা কাঁকড়া লেগেছে। দুই দাড়া দিয়ে চেঙ্গি দিয়েছে ওর বুড়ো আর কড়ে আঙুলে।

ফজল দাড়া দুটো ছিঁড়ে ফেলে কাঁকড়াটাকে ছুড়ে ফেলে দেয় পাড়ের দিকে। দাড়া দুটো খসে পড়ে আঙুল থেকে।

'ইস্‌, রক্ত ছুটছে রে! তুই নায় যা গিয়া নূরু। লটা চাবাইয়া ঘায়ে রস লাগাইয়া দেগা। আমি এডুক শেষ কইর‍্যা আইতে আছি।'

BanglaBook.org

নূরু ডুলাটা রেখে রওনা হয়। ওর লুঙ্গি থেকে পানি ঝরছে। পানিতে ভিজে শিটে মেরে গেছে পা দুটো। ভোরের বাতাসে শীত-শীত করছে, খাড়া হয়ে উঠেছে শরীরের রোম। হাঁটতে হাঁটতে সে কাঁকড়ামারির মুখে চলে যায়। লটাখেতের ভেতর দিয়ে পানি ভেঙে নৌকায় গিয়ে ওঠে।

দূরে স্টিমারের সিটি শোনা যায়। চাটগাঁ মেল বহর এসে ভিড়ল।

নূরু একটা লটা ভেঙে দাঁতের তলায় ফেলে। চিবিয়ে রস দেয় ঘায়ে। রসটা মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। সে লটা চিবিয়ে চিবিয়ে রস চুষতে শুরু করে দেয়।

জালের খেপ শেষ করেছে ফজল। দূর থেকে সে দেখতে পায়, নূরু লটা চিবোচ্ছে। তার হাসি পায়। সে ডেকে বলতে যাচ্ছিল, 'কিরে নূরু, গ্যাণ্ডারি পালি কই ?' কিন্তু বলতে পারে না সে। লটা চিবোতে দেখে হাসি পায় বটে, আবার একই সঙ্গে মায়াও লাগে। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে ওর। ভোর হয়েছে। ভোরের নাশতা চিড়ে-মুড়ি নিয়ে এতক্ষণে বসে গেছে সব বাড়ির ছেলে-মেয়েরা।

ফজল নৌকার দিকে আসছে। শব্দ পেয়ে নূরু চট করে লটাটা ফেলে দেয় পানিতে। চাচা দেখে ফেলেনি তো!

মুখ থেকে লটার রস নিয়ে সে ঘায়ে লাগাতে থাকে। চাচাকে বোঝাতে চায়, ঘায়ে রস লাগাবার জন্যই সে লটা চিবুচ্ছিল।

ফজলের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে। হাসি গোপন করার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'এই নূরু, আরো পাঁচটা ছাড়া ইচা পাইছি রে! মুগুরের মতন মোটা এক-একটা।'

ফজল নৌকায় ওঠে। ডুলার আর গামছায় বাঁধা মাছগুলো সে ঢেলে দেয় নৌকার ডওরায়।

বেলে বা অন্য কোনো মাছ দেখে নয়, বড় বড় গলদা চিংড়ি দেখে খুশি হয় নূরু। সে একটা একটা করে গুনতে শুরু করে।

গলদা চিংড়ি আঠারোটা, বেলে মাছ ছোট-বড় মিলিয়ে তিন কুড়ি চারটা আর কিছু টাটকিনি আর গুঁড়োগাড়া মাছ।

'নাও ছাইড়্যা দে নূরু। এইবার দাউন কয়ডা উডাইয়া ফালাই।'

দু'জনেই বৈঠা হাতে নেয়। নূরু পাছায়, ফজল গলুইয়ে। কিছুদূর উজিয়ে তারা দাউন বড়শি তুলতে শুরু করে। লম্বা ডোরের সাথে খাটো খাটো ডোরে পরপর বাঁধা অনেকগুলো বড়শি। টোপ গেঁথে তিন জায়গায় পাতা হয়েছে এ বড়শি।

ফজল একটা একটা করে দাউন তিনটে তুলে নেয়। প্রথমটায় বেঁধেছে একটা শিলন আর একটা ছোট পাঙাশ মাছ। দ্বিতীয়টা একদম খালি। তৃতীয়টায় বেঁধেছে বড় একটা পাঙাশ মাছ। তেলতেলে মাছটা চকচক করছে ভোরের রোদে।

ফজল বলে, 'মাছটা খুব বুড়ারে। তেল অইছে খুব। এইডার পেডির মাছ যে গালে দিব, বুঝব মাছ কয় কারে! মাইনষে কি আর খামাখা কয়—পক্ষীর গুড়া আর মাছের বুড়া, খায় রাজা আঁটকুড়া।'

মাছ ধরা শেষ হয়েছে। এবার বেচবার পালা। নূরুকে বলতে হয় না। সে নৌকার মাথা ঘুরিয়ে দেয় নিকারির টেঁকের দিকে। ভাটির টানে ছুটছে নৌকা। নূরু হালটা চেপে ধরে বসে থাকে মাথিতে। ফজল তার হাতের বৈঠা রেখে মাছগুলো বাছতে শুরু করে। আকার অনুযায়ী সে হালি ঠিক করে রাখে। গোটা দশেক টাটকিনি আর ছ'টা গলদা চিংড়ি বাদে সবগুলোই

BanglaBook.org

বেচে দিতে হবে। বড় পাঙাশ মাছটা নিজেদের জন্য রাখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা হলে বাকিগুলোয় আর ক'টা পয়সাই আসবে। সের চারেক ওজনের পাঙাশ মাছটায় কমসে কম বারো গণ্ডা পয়সা পাওয়া যাবে। ঘরে চাল নেই। তেল-নুন আরো অনেক কিছুই কিনতে হবে। শুধু মাছ খেয়ে তো আর পেট ভরবে না। মাছটার দামে কেনা যাবে দশসের চাল—সংসারের চারদিনের খোরাক।

গত তিন বছর ধরেই টানাটানি চলছে সংসারে। ডিঙ্গাখোলা আর লক্ষ্মীচর ভেঙে যাওয়ার পরই শুরু হয়েছে এ দুর্দিন। এই দুই চরে অনেক জমি ছিল তাদের। বছরের খোরাক রেখে অন্তত পাঁচশ টাকার ধান বেচতে পারত তারা। প্রতি বছর পাট আর লটা ঘাসে আসত কম করে হলেও হাজার টাকা। পদ্মার অজগরস্রোত গিলে খেয়েছে, উদরে টেনে নিয়েছে সব জমি। গুণগাঁর নমকান্দি থেকে শুরু হয়েছিল ভাঙা। তারপর বিদগাঁও কোনা কেটে, দিঘলির আধাটা গিলে, কাউনিয়াকান্দা, ডিঙ্গাখোলা, লক্ষ্মীচর আর মূলভাওরকে বুকে টেনে চররাজাবাড়ির পাশ কেটে উন্মাদিনী পদ্মা গা দোলাতে দোলাতে চলে গেছে পুব দিকে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এঁকেবেঁকে চলেছে ডানে আর বাঁয়ে।

চরের বসত আজ আছে, কাল নেই। নদীর খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে চরের আয়ু। তার খুশিতে চর জাগে। তারই খেয়ালে ভেঙে যায় আবার। এ যেন পানি আর মাটির চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ, দশ, বিশ বছরের মেয়াদে বুকের ওপর ঠাঁই দেয় পানি। মেয়াদ ফুরালেই আবার ভেঙেচুরে নিজের জঠরে টেনে নেয়। চরবাসীরা তাই স্থায়ী হয়ে বসতে পারে না কোনো দিন। তাদের বাপ-দাদার ভিটে বলতে কিছু নেই। বাপ-দাদার কবরে চেরাগ জ্বালবার প্রয়োজন হয় না তাদের কোনো দিন। ফজলের বাবা এরফান মাতব্বর প্রায়ই একটা কথা বলে থাকে, *'চরের বাড়ি মাটির হাঁড়ি, আয়ু তার দিন চারি।'*

এরফান মাতব্বরের বাড়ি ছিল লক্ষ্মীচরে। এগারো বছর কেটেছিল সেখানে। এ এগারো বছরের আয়ু নিয়েই জেগেছিল চরটা। মেয়াদের শেষে পদ্মা গ্রাস করেছে। এই নিয়ে কতবার যে লক্ষ্মীচর জেগেছে আর ভেঙেছে তার হিসেব রাখেনি এরফান মাতব্বর। সে ঘর-দোর ভেঙে, পরিবার-পরিজন, গরু-বাছুর নিয়ে আটিকান্দি গিয়ে ওঠে। দুটো করে টিনের চালা মাটির ওপর কোনাকুনি দাঁড় করিয়ে খুঁটিহীন কয়েকটা দোচালা তৈরি হয় মামাতো ভাইয়ের বাড়ির পাশে। মাতব্বরের সংসার এভাবে *'পাতনা'* দিয়ে ছিল বছর খানেক। তারপর ঐ চরেই জায়গা কিনে বছর দুয়েক হলো সে আবার বাড়ি করেছে।

ফজল আগে শখ করে মাছ ধরতে যেত। মাছ ধরাটা ছিল তখন নেশার মতো। এখন অনেকটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ উপজীবিকার আশ্রয় না নিয়ে উপায় ছিল না। সংসারে খাবার লোক্ অনেক। সে তুলনায় এখন জমির পরিমাণ সামান্য। চরদিঘলিতে মাত্র কয়েক নল জমি আছে তাতে যে ধান হয় তাতে টেনেটুনে বছরের চারমাস চলে। বাকি আটমাসের পেটের দায় ছাড়াও খাজনা রয়েছে। চর থাকুক আর না থাকুক জমিদারের নায়েবরা খাজনার টাকা গুনবেই। নয়তো তাদের কোনো দাবিই থাকবে না যদি আবার কখনো চর জেগে ওঠে সে এলাকায়।

ফজল লুকিয়ে-চুরিয়ে মাছ বেচে। গেরস্তের ছেলের পক্ষে মাছ-বেচা নিন্দার ব্যাপার। আত্মীয়-কুটুম্বরা জানতে পারলে ছি-ছি করবে। হাসাহাসি করবে গাঁয়ের লোক। দুষ্ট লোকের মুখে মুখে হয়তো একদিন মালো বা নিকারি খেতাব চালু হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

দিনের পর দিন অভাব অনটনের ভেতর দিয়ে সংসার চলছিল। মাছ বেচার কথা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবেনি ফজল। শখ করে একদিন সে লেদ বড়শি নিয়ে নদীতে গিয়েছিল। বড়শিতে উঠেছিল একটা মস্ত বড় আড় মাছ। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল নিকারি-নৌকা। মাছ দেখে ডাক দেয় মাছের ব্যাপারি, 'ও ভাই মাছটা বেচ্‌বানি ?'

ফজল কৌতুক বোধ করে। মজা করবার জন্য উত্তর দেয় সে, 'হ বেচুম। কত দিবা ?'

'তুমি কত চাও ?'

'এক টাকা।'

'এক টা—কা! মাছখানের লগে নাওখান দিবা তো ?'

'উহুঁ, বৈডাখান দিমু।'

'বোঝলাম, বেচনের মত নাই তোমার। বেচতে চাও তো উচিত দাম কইয়্যা দ্যাও।'

'তুমিই কও।'

'আটআনা দিমু।'

'আট আনা!'

পয়সার অঙ্কটা মধুর লাগে ফজলের কানে। লোভ হয় তার। পয়সার অভাবে তিনদিন ধরে একটা বিড়ির মুখ দেখেনি সে।

সে এদিক ওদিক তাকায়। না, ধারে কাছে কেউ নেই। নিকারি-নৌকাটা ভাটিয়ে গিয়েছিল কিছুদূর। ফজল ডাক দেয়, 'ও ভাই, আইও লইয়া যাও।'

নিকারি নৌকায় মাছটা তুলে দিয়ে আট আনা গুনে নেয় ফজল। তার মাছ বেচার বউনি হয় এভাবে।

সেদিন কয়েকটা ছোট ছোট শিলন, ট্যাংরা মাছও পেয়েছিল ফজল। সেগুলো নিয়ে যখন সে বাড়ি আসে তখন মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'মাছ খাইলেই দিন যাইব অ্যাঁ ? এতদিন বীজ-ধান ভাইন্যা খাওয়াইছি। দেহি আইজ খাওয়ন আহে কইতন।'

মাছগুলোকে ধপাত্ করে মাটিতে ফেলে ফজল ডিঙিতে উঠেছিল আবার ডিঙি ছুটিয়ে হাশাইলের বাজার থেকে মাছ-বেচা পয়সায় কিনে এনেছিল ছয় সের চাল।

তারপর থেকে মাছ বেচা পয়সায় সংসারের আংশিক খরচ চলছে। ফজলের বাবা-মা প্রথম দিকে আপত্তির ঝড় তুলেছিল। অভাবের তাড়নায় সে ঝড় এখন শান্ত হয়ে গেছে।

মাছের গোনা-বাছা শেষ করে ফজল। মাছের গায়ের লালায় তার হাত দুটো চট্‌চট্ করে। হাত ধুয়ে সে গামছায় মোছে। তারপর গলুইয়ে গিয়ে মাথির চরাট সরিয়ে বের করে বিড়ি আর ম্যাচবাতি।

'অত কিনার চাপাইয়া ধরছস ক্যান্ নূরু ? সামনে ফিরা আওড়। আরো মাঝ দিয়া যা।'

নূরুকে সাবধান করে দেয় ফজল। কিনার ঘেঁষে কিছুদূর গেলেই আবর্ত। সেখানে স্রোত বইছে উল্টোদিকে। ওখানে গিয়ে পড়লে নৌকা সামলানো সম্ভব হবে না ছোট ছেলেটির পক্ষে। এক ঝটকায় তাদের নৌকা বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যাবে অনেক দূর।

নূরু নৌকা সরিয়ে নিয়ে যায় কিনারা থেকে দূরে। মাঝের দিকে স্রোতের টান বেশি খরতর করে এগিয়ে যায় নৌকা।

ফজল এবার বিড়ি ধরিয়ে মাথিতে চেপে বসে। সে বিড়িতে লম্বা টান দেয় আর মুখ ভরে ধোঁয়া ছাড়ে।

দূরে নদীর মাঝে সাদা সাদা দেখা যায়, কি ওগুলো ?

BanglaBook.org

ফজল চেয়ে থাকে। তার চোখে পলক পড়ে না। ঐখানেই বা ওর আশেপাশে কোথাও ছিল তাদের খুনের চর।

নূরুকে সরিয়ে বৈঠা হাতে নেয় ফজল। জোর টানে সে নৌকা ছোটায় পুব-উত্তর কোণের দিকে।

কিছুদূর গেলেই সাদা বস্তুগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

কি আশ্চর্য! নদীর মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো বক।

ফজল বৈঠা হাতে দাঁড়িয়ে যায়। কিছু দেখবার জন্য সে উত্তর দিকে তাকায়। হ্যাঁ ঐ-তো, ঐ-তো বানরির জোড়া তালগাছ!

উল্লসিত হয়ে ওঠে ফজল। বলে, 'চর জাগছেরে নূরু, চর জাগছে!'

'কই, কই ?'

'ঐ দ্যাখ, ঐ যে ঐ।' বকগুলো আঙুল দিয়ে দেখায় ফজল।

আনন্দে লাফিয়ে ওঠে নূরু। সে দেখতে পায় হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে বকগুলো। মাছ ধরণার জন্য গলা বাড়িয়ে আছে। লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারছে মাঝে মাঝে।

'এইডা কি আমাগ চর, দুদু ?'

'হরে হ। আমাগ খুনের চর। ঐ দ্যাখ, ঐযে দ্যাখা যায় বানরির জোড়া তালগাছ। ছোডকালে আমরা যখন ঐ চরে যাইতাম তখন সোজা উত্তরমুখি চাইলে দ্যাখা যাইত আসুলির ঐ উঁচা তালগাছ দুইডা।'

ফজল বকগুলোর দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, 'নূরু, তুই বৈঠা আতে ল। টান দে জোরে, বকগুলোরে দেখাইয়া দেই।'

'ক্যান্ দুদু ?'

'এখনো কেও টের পায় নাই। বক দেখলেই মাইনষে টের পাইয়া যাইব, চর জাগছে।'

চাচা-ভাইপো বৈঠা টেনে এগিয়ে যায়। কিছুদূর গেলেই বৈঠা ঠেকে মাটির সাথে।

'আর আউগান যাইবনারে নূরু, চড়ায় ঠেকা যাইব নাও। মাডিতে নাও কামড় দিয়া ধরলে মুশকিল আছে। তখন দুইজনের জোরে ঠেইল্যা নামান যাইব না।'

বৈঠাটানা বন্ধ করে দুজনেই। বকগুলো এখনো বেশ দূরে। ফজল পানির ওপর বৈঠার বাড়ি মারে ঠপাস-ঠপাস। কিন্তু বকগুলো একটুও নড়ে না। ওরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, এত দূরের শত্রুকে ভয় করবার কিছু নেই।

ফজল আরো কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যায় নৌকা। কিন্তু কিভাবে তাড়াবে বক ? মারবার মতো একটা কিছু পেলে কাজ হত।

হঠাৎ ফজলের নজর পড়ে বেলে মাছগুলোর ওপর। সে ডওরা থেকে একটা বেলে মাছ নিয়ে জোরে বকগুলোর দিকে ছুড়ে মারে। বকগুলো এবার উড়াল দেয়। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার নেমে পড়ে চরে।

'বকগুলোতো বড় বজ্জাতরে। এইখানে মাছ খাইয়া জুত পাইয়া গেছে। অত সহজে যাইব না।'

'দুদু, পানিতো এট্টুখানিক, আমি নাইম্যা গিয়ে দেখাইয়া দিয়া আহি ?'

'নারে, তুই পারবি না। কাফালের মইদ্যে পইড়্যা যাবি।'

ফুঁত্-ফুঁত্।

BanglaBook.org

স্টিমারের ফুঁ শুনে ফজল ও নূরু তাকায়। চাটগাঁ মেল আসছে। সামনে নৌকা পড়েছে বোধ হয়। তাই ফুঁত্-ফুঁত্ শব্দ করল দু'বার।

ফজল বলে, 'খাডো চুঙ্গার জাহাজ। শুয়োরের মতোন 'গ' দিয়া আইতে আছেরে! শিগ্‌গির টান দে নূরু। নাওডা সরাইয়া লইয়া যাই। চড়ার উপর ঢেউয়ে আছাড় মারব।'

নৌকা নিয়ে সরে যায় তারা। তাদের অনেক দূর দিয়ে নতুন চরেরও উত্তর পাশ দিয়ে স্টিমার চলে যায়। তার চলার পথের আন্দোলিত পানি ঢেউ হয়ে ছুটে আসছে। ফজল ঢেউ বরাবর লম্বিয়ে দেয় নৌকা, শক্ত হাতে হাল ধরে। নূরুকে বলে, 'তুই বৈডা থুইয়া দে নূরু। শক্ত কইর‍্যা পাডাতন ধইর‍্যা থাক। উজান জাহাজে ঢেউ উঠব খুব।'

ডলে-মুচড়ে উঁচু হয়ে ঢেউ আসছে। বিপদ বুঝে বকগুলো এবার উড়াল দেয়।

'দ্যাখ্ দ্যাখ্ নূরু। ঐ দ্যাখ, বকগুলো উড়াল দিছে।'

বকগুলোর অবস্থা দেখে নূরুর হাসি পায়। সে বলে, 'এইবার। এইবার যাও ক্যান্? ঢেউয়ের মইদ্যে ডুবাইয়া ডুবাইয়া মাছ খাও এইবার।'

বকগুলো ওপরে উঠে দু-একবার এলোমেলো চক্কর দেয়। নিচে ঢেউয়ের তাণ্ডব দেখে নামবার আশা ছেড়ে দেয় ওরা। তারপর ঝাঁক বেঁধে পশ্চিম দিকে উড়ে চলে যায়।

ঢেউয়ের বাড়িতে ওঠানামা করছে নৌকার দুই মাথি। এক মাথিতে ফজল, অন্য মাথির ঠিক নিচেই পাটাতন ধরে বসে আছে নূরু। ফজল বলে, 'নূরু, 'সী-সঅ, সী-সঅ', কিরে ডর লাগছে নি? সী-সঅ, সী-সঅ।'

ঢেউ থামলে নূরু বলে, 'সী-সঅ কি দুদু?'

'সী-সঅ একটা খেইল। বাচ্চারা খেলে। নারাণপুর চৌধুরী বাড়ি খাজনা দিতে গেছিলাম। সেইখানে দেইখ্যা আইছি।'

একটু থেমে সে আবার বলে, 'আইজ আর নিকারিরে টেঁকে যাইমু নারে।'

'ক্যান্?'

'ক্যান্ আবার! বাড়িতে খবর দিতে অইব না? মাছ বেচতে গেলে দেরি অইয়া যাইব অনেক। তুই বৈডা নে শিগগির। টান দে।'

দু'জনের বৈঠার টান, তার ওপর অনুকূল স্রোত। নৌকা ছুটছে তীরের মতো।

ফজল নলতার খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় নৌকা। নতুন চর দখলের এলোমেলা ভাবনায় আচ্ছন্ন তার মন।

খাঁড়ির পুবপাড়ে ঢোনের মধ্যে বাঁধা একটা নৌকা। ওটার ওপর চোখ পড়তেই ফজলের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। নৌকাটা তার চেনা।

নূরু সামনের দিকে চেয়ে বৈঠা টেনে যাচ্ছে। ফজল একবার দেখে নেয় তাকে। তারপর সে চরাটের ওপর নিঃশব্দে দাঁড়ায়, তাকায় পুবদিকে।

কিছুদূরে কলাগাছে ঘেরা একটা বাড়ি। কলাগাছের ফাঁক দিয়ে বাড়ির উঠানের একাংশ দেখা যায়। আর দেখা যায় একখানা লাল শাড়ি হাওয়ায় দুলছে।

ফজলের বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। সে বসে পড়ে। নূরুকে বলে, 'মোল্লাবাড়ি চিন্যা যাইতে পারবি নূরু?'

'হ্যাঁ', নূরু ঘাড় কাত করে।

'কোনমুখি ক দেখি?'

নূরু দাঁড়ায়। পুবদিকে তাকিয়ে বলে, 'ও-ই তো দ্যাখা যায়।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। কয়েকটা মাছ দিয়া আয় গিয়া। এতগুলো মাছ আমরা খাইয়া ছাড়াইতে পারমু না।'

ফজল পুবপাড়ে নৌকা ভিড়ায়। ডওরায় রাখা মাছগুলো হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে সে জিজ্ঞেস করে, 'কোনডা দিমুরে নূরু ? ইচা, না পাঙাশ ?'

'বড় পাঙাশটা দ্যাও।'

'আইচ্ছা, পাঙাশ মাছটাই লইয়া যা। আর তোর নানাজানরে আমাগ বাড়ি জলদি কইর‍্যা আইতে কইস। জরুরি কাম আছে। আমার কথা কইলে কিন্তু আইব না। তোর দাদাজানের কথা কইস।'

'আইচ্ছা।'

নূরু চরাটের নিচে দলা-মুচড়ি করে রাখা জামাটা পরে নেয়।

ফজল একখণ্ড রশি মাছটার কানকোর ভেতর ঢোকায়। মুখ দিয়ে সেটা বের করে এনে দু'মাথায় গিঁঠ দিয়ে ঝুলনা বাঁধে।

মাছটা হাতে ঝুলিয়ে পাড়ে নেমে যায় নূরু। ফজল নৌকা ছেড়ে দেয়। বৈঠায় টান দিতে দিতে সে ডেকে বলে, 'শোন্ নূরু, চর জাগছে—এই কথা কইস্ না কারোরে, খবদ্দার! তোর নানার লগে আইয়া পড়িস। ইস্কুলে যাইতে অইব কিন্তু।'

'আইচ্ছা।'

বড় মাছ। হাতে বুঝিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে নূরুর। সে হাতটা উঁচু করে নিয়েছে। তবুও মাছের লেজের দিকটা মাটির ওপর দিয়ে ঘষড়াতে ঘষড়াতে যাচ্ছে।

বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়ায় ফজল। শব্দ পেয়ে ছোট বোন আমিনা ছুটে আসে।

'নূরু কই, মিয়াভাই ?'

'ও মোল্লাবাড়ি গেছে। তুই মাছগুলোরে ডুলার মইদ্যে ভইর‍্যা লইয়া আয়।'

ফজল লাফ দিয়ে নৌকা থেকে নামে। থালা-বাসন নিয়ে বরুবিবি ঘাটের দিকে আসছিল। ফজল জিজ্ঞেস করে, 'বা'জান কই, মা ?'

'ঘরে হুইয়া রইছে। শরীলডা ভালো না।'

ঘরের দরজায় পা দিয়ে ফজল ডাকে, 'বা'জান।'

'কিরে ?' শুয়ে শুয়ে সাড়া দেয় এরফান মাতব্বর।

'চর জাগছে।'

'চর জাগছে!'

'হ, আমাগ খুনের চর।'

'খুনের চর!' এরফান মাতব্বর বিছানা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। 'কার কাছে হুনলি ?'

'হুনি নাই। দেইখ্যা আইছি। এক ঝাঁক বক বইছিল চরে।'

'খুনের চর ক্যামনে বুঝলি ?'

'উত্তরমুখি চাইয়া দ্যাখলাম, বানরির জোড়া তালগাছ।'

এরফান মাতব্বর চৌকি থেকে নেমে বেরিয়ে আসে। কিছুদিন থেকেই ভালো যাচ্ছিল না তার শরীর। মাঝে মাঝে জ্বর হয়। আজও ভোর বেলায় শীত-শীত করছিল। কাঁপুনি শুরু হয়েছিল শরীরে। জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তাই সে বিছানায় বসে বসে কোনো রকমে ফজলের নামাজ পড়েই আবার শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ মুহূর্তে খবর শুনে শীত আর কাঁপুনি কোথায়

BanglaBook.org

পালিয়ে গেছে! বার্ধক্যে নুয়ে পড়া শরীরটা সোজা হয়ে উঠেছে। পাকা ভ্রুর নিচে বড় বড় হয়ে উঠেছে ঘোলাটে চোখদুটো। মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে শিথিল হাত।

'ফজু, শিগগির মানুষজনরে খবর দে। দ্যাখ, জমিরদ্দি, লালুর বাপ, রুস্তম, আহাদালী, মেহের মুনশি কে কুনখানে আছে। মান্দ্রায় আর শিলপারনে কারুরে পাডাইয়া দে। কদম শিকারি, ধলাই সরদার, জাবেদ লশকর আর রমিজ মিরধারে খবর দে। নাশতা খাইছস ?'

'না, পরে খাইমু।'

'আইচ্ছা, পরেই খাইস। তুই বাইর অইয়া পড়। ঢোলে বাড়ি দিসনা কিন্তু। চর জাগনের কথা কানে কানে কইয়া আহিস। দুফরের মইদ্যে বেবাক মানুষ আজির অওয়ন চাই। যার যার আতিয়ার যেন্ লগে লইয়া আহে।'

ফজল রওনা হয়।

'ফজু, হোন। ভাওর ঘরের বাঁশ-খুঁড়া নাও ভইর‍্যা লইয়া আইতে কইস যার যার।'

একটু দম নিয়ে হাঁক দেয় মাতব্বর, 'নূরু....নুরু কইরে ? তামুক ভইর‍্যা আন।'

'নূরুরে মোল্লাবাড়ি পাডাইছি। মোল্লার পো-রে আইতে খবর কইয়া আইব।' ফজল বলে।

'আইচ্ছা যা তুই, আর দেরি করিস না।'

মাতব্বর মনে মনে বলে, 'মোল্লা কি আর আইব ? মাইয়া আট্‌কাইছে। চোরামদ্দি এহন কোন মোখ লইয়া আইব আমার বাড়ি।'

ফজল চলে গেলে বিড়বিড় করে বলতে থাকে মাতব্বর, 'আইব না ক্যান্ ? আইব—আইব। চর জাগনের কথা হুনলে শোঁশাইয়া আইব, হুঁহ—হুঁ। না আইয়া যাইব কই ? কলকাডি বেবাক এই বান্দার আতে। দেহি, এইবার আমার পুতের বউ ক্যামনে আটকাইয়া রাহে।'

মাতব্বর ঘরে যায়। আফার থেকে ঢাল-কাতরা, লাঠি-শড়কি নামিয়ে উঠানে নিয়ে আসে।

থালা-বাসন মেজে ঘাট থেকে ফিরে আসে বরুবিবি। স্বামীকে হাতিয়ার নাড়াচাড়া করতে দেখে সে অবাক হয়। কিছুক্ষণ আগেই যে মানুষটিকে সে শুয়ে শুয়ে কাঁপতে দেখে গেছে, সে মানুষটিই কিনা এখন বাইরে বসে ঢাল-কাতরা-শড়কি নাড়াচাড়া করছে। সে বলে, 'এই দেইখ্যা গেলাম ওনারে বিছানে। কোনসুম আবার এগুলা লইয়া বইছে ? ওনারে কি পাগলে পাইল নি ?'

'হ, পাগলেই পাইছে। তুমি হোন নাই, ফজু কয় নাই কিছু ?'

'কই, না তো!'

'আরে, আমাগ চর জাগছে।'

'চর জাগছে! কোন চর ?'

'খুনের চর!'

'খুনের চর ?'

বরুবিবির বুকের ভেতর কে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে শুরু করেছে। তার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। কোনো রকমে রান্নাঘরে গিয়ে সে বসে পড়ে। তার মনের আবেগ, তার বুকের ঝড় বিলাপ হয়ে বেরোয়, 'ও আমার রশুরে, বা'জান। ক-ত বচ্ছর না যে পার অইয়া গে-ল, রশু-রে-আ-মা-া-র। তোরে না-যে ভোলতে না-যে পা-রি, মানিকরে-আ-মা-া-র।'

BanglaBook.org

দশ বছরের পুরাতন শোক। সংসারের পলিমাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সে মাটি এখন কাঁপতে শুরু করেছে। মাতব্বরের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তার দুচোখের কোলে পানি জমে। ঝাপসা দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে থাকে হাতিয়ারগুলোর দিকে।

॥ দুই ॥

খুনের চর।

দশ বছর আগে একবার জেগেছিল এ চর। তখন নাম ছিল লটাবনিয়া। এ চরের দখল নিয়ে মারামারি হয়েছিল দুই দলে। দুই দলের দুই প্রধান ছিল এরফান মাতব্বর আর চেরাগ আলী সরদার। দুই দলের পাঁচজন খুন হয়েছিল। এরফান মাতব্বরের দলের দু'জন আর চেরাগ আলীর দলের তিনজন। এরপর থেকেই লোকের মুখে মুখে লটাবনিয়ার নাম হয়ে যায় খুনের চর।

এরফান মাতব্বরের বড় ছেলে রশিদ চরের এ মারামারিতে খুন হয়েছিল।

বাইশ বছরের জোয়ান রশিদ। গায়ে-পায়ে বেড়ে উঠেছিল খোদাই ষাঁড়ের মতো। মাত্র বিশজন লোক নিয়ে সে চেরাগ সরদারের শ'খানেক লোকের মোকাবেলা করেছিল।

সেদিন ছিল হাটবার। চরের পাহারায় যারা ছিল তাদের অনেকেই সেদিন দিঘিরপাড় গিয়েছিল হাট-সওদা করতে। সত্তরটা ভাওর ঘরের অর্ধেকের বেশি ছিল সেদিন ঝাঁপবন্ধ। একটানা দুমাস ধরে পাহারা দিতে দিতে তাদের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব এসে গিয়েছিল। তাদের কাছে ফুরিয়ে এসেছিল পাহারা দেয়ার প্রয়োজন। বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই ভেবে কেউ কেউ আবার ভাওর ঘরে বউ ছেলে-মেয়ে এনে ঘর-সংসারও পেতে বসেছিল। চেরাগ সরদার যে এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তারা।

দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে। ভাওর ঘরের ছায়ায় বসে ইলশা জাল বুনছিল রশিদ। আর পাশে বসে গল্প করছিল তার দোস্ত রফি। হঠাৎ তাদের নজর পড়ে নদীর দিকে।

ষোলটা নৌকা বোঝাই লোক এ চরের দিকে আসছে।

তারা দুজনেই লাফ দিয়ে দাঁড়ায়, রশিদ গলার সবটুকু জোর দিয়ে হাঁক দেয়, 'আইছে রে-ে-ে, আইছে, শিগগির বাইর-অ-আউগ্ গা...আউগ্ গা-া-া-া'

রফিও গলা ফাটিয়ে হাঁক দেয়, 'তোরা কইরে-ে-ে- ? আউগ্ গা—শিগ্গির আউগ্গা।'

এদিকে-ওদিকে যারা ছিল তারা যার যার ভাওর ঘর থেকে বেরোয়। চারদিকে চিৎকার আর শোরগোল।

রশিদ আর রফি গুলেল বাঁশ আর লুঙ্গির টোপর ভরে মাটির গুলি নিয়ে নদীর দিকে দৌড় দেয়। তাদের পেছনে আসে বাকি আর সবাই। কারো হাতে ঢাল-কাতরা, কারো হাতে শুধু শড়কি, কারো হাতে লম্বা লাঠি।

রশিদ আর রফি গুলির পর গুলি মারে নৌকার লোকদের ওপর। কিন্তু তারা বেতের ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে দেয় সে গুলি। দুই বন্ধু বুঝতে পারে, এভাবে ওদের ঠেকানো যাবে না। তারা দৌড়ে গিয়ে ভাওর ঘর থেকে নিজেদের ঢাল-শড়কি নিয়ে আসে।

নৌকাগুলোর দশটা কিনারায় এসে ঠেকে। বাকি ছয়টা বড় নৌকা। ভাটা-পানিতে এগোতে না পেরে সেগুলো মাথা ঘোরায় পাশের চলপানির দিকে।

আধ-হাঁটু পানিতে নামে চেরাগ সরদারের লোকজন। ঢাল-কাতরা, লাঠি-শড়কি নিয়ে তারা মার-মার করতে করতে এগিয়ে আসে।

BanglaBook.org

চরের 'কাইজ্যায়' একদল চায় অন্য দলকে হটিয়ে তাড়িয়ে দিতে। বেকায়দায় না পড়লে খুন-খারাবির মধ্যে কেউ যেতে চায় না। খুন-জখম হলেই থানা-পুলিসের হাঙ্গামা আছে, মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলা আছে, জেল-হাজতের ভয় আছে।

চেরাগ সরদারও তাই খুনাখুনি এড়াবার জন্য হাটের দিনটি বেছে নিয়েছিল। সে ভেবেছিল, তাদের এত লোকজন ও মারমার হামাহামি শুনে এরফান মাতব্বরের গুটিকয়েক লোক চর ছেড়ে ভেগে যাবে। তখন সহজেই দখল করা যাবে চর।

কিন্তু অত সহজে চারটা দখল করা যায়নি।

রশিদ তার লোকজন নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। চেরাগ সরদারের দল ডাঙায় উঠতে না উঠতেই শুরু হয়ে যায় মারামারি।

দলের একজনকে খুন হতে দেখেই রশিদ খেপে যায়। মারমার ডাক দিয়ে এগিয়ে যায় সে। তার শড়কির ঘায়ে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে তিরতিরে পানির মধ্যে।

প্রথম দশটা নৌকা থেকে দলটি নেমেছিল, রশিদ ও তার দল তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আরো একটা লাশ ফেলে তাদের অনেকেই পিছু হটে নৌকার দিকে। কিন্তু আরো ছ'খানা নৌকায় করে যারা এসেছিল তারা অন্য দিক দিয়ে নেমে এসে রশিদ ও তার লোকদের ঘিরে ফেলে। আর সকলের মতো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে রশিদও বাঁচতে পারত। সাঁতার দিয়ে নাগরারচরে গিয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়ায়। আরো একজনের জান নিয়ে নিজের জান দেয় সে।

তারপর থানা-পুলিস, তদন্ত-তল্লাশ, ধর-পাকড়, হাজত। আদালতে দুই দলের বিরুদ্ধেই মামলা ওঠে খুন আর হাঙ্গামার। এক মামলায় আসামি চেরাগ সরদার ও তার দলের বিশজন; অন্য মামলায় এরফান মাতব্বরের দলের তেরো জন।

আসামিরা সবাই দিশেহারা। তারা বুঝতে পারে, ফাঁসির দড়ি না হোক, ঘানির জোয়াল ঝুলে আছে সবারই ঘাড়ের ওপর।

এখন কি করা যায়?

চেরাগ সরদার নিজেই এক মামলার আসামি। তাই প্রথমে সে-ই আপোসের প্রস্তাব পাঠায় এরফান মাতব্বরের কাছে।

আপোসের কথা শুনেই রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে মাতব্বরের। তার জানের টুকরো ছেলেকে যারা খুন করেছে, তাদের সাথে আপোস!

প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এলাকার দফাদার সামেদ আলী। মাতব্বরের দলেরও জনকয়েক এসেছিল তার পিছু পিছু।

ক্রোধে মাতব্বরের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বেরোয় না। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তেজিত স্বরে সে বলে, 'না, কিছুতেই না। ওর সাথে কোনো আপোস নাই। ওরে জেলের ভাত না খাওয়াইয়া ছাড়মু না—ছাড়মু না, কইয়া দিলাম। তুমি যাও, কও গিয়া তারে।'

মাতব্বরের দলের আহাদালী বলে, 'হে অইলে জেলের ভাত তো আমাগ কপালেও লেখা আছে, মাতব্বরের পো।'

তার কথায় সায় দিয়ে জমিরদ্দি বলে, 'মিটমাট কইর‍্যা ফালানডাই ভালো। কেবুল ওগই জেলের ভাত খাইয়াতে পারতাম তয় এক কথা আছিল। ওগ সাথ্ সাথ্ যে আমাগও জেলে যাইতে অইব।'

BanglaBook.org

মাতব্বর এ কথা ভাবেনি তা নয়। কিন্তু আপোসের কথা ভাবলেই তার প্রতিশোধকামী মনে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ক্রোধে ফুলে ওঠে সারা শরীর। তার কাছে আপোস মানেই পরাজয়, মৃত ছেলের স্মৃতির অবমাননা।

শেষ পর্যন্ত দলের লোকজনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না এরফান মাতব্বর। চেরাগ সরদার আর চরের দাবি করবে না, এই শর্তে আপোস করতে রাজি হয় সে। এ সিদ্ধান্ত নিতে দশ দিন লেগেছিল তার।

কিন্তু আপোস করলেই তো আর চুকে গেল না সব। মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় ? খুনের মামলা। এ তো ছেলেখেলা নয় যে, চায় মন খেললাম, না চায় মন চললাম।

দফাদার সে বুদ্ধিও দেয়, 'তাঁর লেইগ্যা চিন্তা নাই। আদালতে উল্ডা-পাল্ডা, আবোল-তাবোল সাক্ষী দিলেই মামলা টিশমিশ অইয়া যাইব। কোন সওয়ালের পিডে কি জওয়াব দিতে অইব তা উকিলরাই ঠিক কইর‍্যা দিব।'

শেষে সে রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল। দুই বিবাদী পক্ষের দুই উকিল মিলে সাক্ষীদের ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে দেন। সরকার পক্ষের উকিলের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষীরা সেই শেখানো বুলি ছেড়ে দেয়। একজনের জবানবন্দির সাথে আর একজনেরটার মিল হয় না। ঘটনা চোখে দেখেছে এমন সাক্ষীরাও বিনা দ্বিধায়, কোনো রকম লজ্জা-শরমের ধার না ধেরে বলে যায়, তারা নিজের চোখে দেখেনি, অমুকের কাছে শুনেছে। সাক্ষীদের কয়েকজনকে বিরুদ্ধাচারী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কোনো ভাবেই সরকারবাদি মামলা টেকে না। যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে দুটো খুনের মামলার আসামিরাই খালাস পেয়ে যায়।

খুনাখুনির পরই চারটাকে ক্রোক করে সাময়িকভাবে সরকারি দখলে রাখার হুকুম দিয়েছিল আদালত। ভবিষ্যতে যাতে আবার শান্তিভঙ্গ না হয় সে জন্যই থানার পুলিস এ ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেছিল। পরে যে পক্ষ মামলায় জিতবে, সে-ই হবে চরের মালিক।

আপোসের শর্ত অনুসারে চেরাগ সরদার আর চরের দাবি করেনি। তাই আদালতের রায়ে এরফান মাতব্বরই চরটা ফিরে পায় আবার।

খবর পেয়ে আটিগাঁর পাঞ্জু বয়াতি বখশিশের লোভে এরফান মাতব্বরের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। দোতারা বাজিয়ে সে নিজের বাঁধা পুরাতন একটা গান জুড়ে দেয়—

লাঠির জোরে মাটিরে ভাই
লাঠির জোরে মাটি,
লাঠালাঠি কাটাকাটি,
আদালতে হাঁটাহাঁটি,
এই না হলে চরের মাটি
হয় কবে খাঁটি...রে।

পাঞ্জু বয়াতির এ গান এখন চরবাসীদের কাছে আপ্ত বাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। তাদের মুখে মুখে ফেরে এ গান। তাদের অভিজ্ঞতার থেকেও তারা বুঝতে পেরেছে, নতুন চর জাগলে এসব ঘটনা ঘটবেই। লটাবনিয়ার বেলায়ও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। লাঠালাঠি হলো, কাটাকাটি হলো। আদালতে হাঁটাহাঁটিও হলো প্রায় দু'বছর। তারপর ফিরে এল শান্তি। খাঁটি হলো চরের মাটি।

এরফান মাতব্বর তার বর্গাদার ও কোলশরিকদের মধ্যে চরের জমি ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়। চরের বুকে গড়ে ওঠে নতুন বসতি। শুরু হয় নতুন জীবন।

কিন্তু এত কাণ্ডের পর খাঁটি হলো যে মাটি, তা আর মাত্র তিনটি বছর পার হতে না হতেই ফাঁকি হয়ে গেল। পদ্মার জঠরে বিলীন হয়ে গেল খুনের চর।

সেই খুনের চর আবার জেগেছে।

এরফান মাতব্বর গামছায় চোখ মোছে। বরুবিবির বিলাপ থেমেছে কিন্তু হায়-মাতম থামেনি। থেকে থেকে তার বক্ষপঞ্জর ভেদ করে হাহাকার উঠছে—আহ্ বাজান, আহ্ সোনা-মানিক!

এরফান মাতব্বর উঠে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে নিজে নিজেই বলে, 'আর কাইন্দা কি করমু! কান্দলেই যদি পুত্ পাইতাম তয় চউখের পানি দিয়া দুইন্যাই ভাসাইয়া দিতাম।'

তারপর রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে সে বলে, 'অ্যাদে ফজুর মা, আর কাইন্দ না। আল্লার বেসাত আল্লায় লইয়া গেছে। কাইন্দা আর কি রকমু। ওডো এইবার। মানুষজন আইয়া পড়ল বুইল্যা। তুমি চাউলে-ডাইলে বড় ডেগটার এক ডেগ চড়াইয়া দ্যাও শিগ্‌গির।

বরু বিবি কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কাইজ্যা করতে ওনরাই যেন্ যায়। আমার ফজুরে চরের ধারেকাছেও যাইতে দিমু না।'

'আইচ্ছা না দ্যাও, না দিবা। অখন যা কইলাম তার আয়োজন কর। আমি মাডি খুইদ্যা চুলা বানাইয়া দিতে আছি উডানে।'

বরুবিবির বুকের ঝড় থামতে অনেক সময় লাগে। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সে মসলা বাটে, চুলো ধরায়। তারপর চাল-ডাল ধুয়ে এনে খিচুড়ি বসিয়ে দেয় এক ডেগ। চুলোর মধ্যে শুকনো লটা গুঁজতে গুঁজতে তার কেবলই দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

॥ তিন ॥

মান্দ্রা আর শিলপারনে 'খবরিয়া' পাঠিয়ে আশপাশের লোকজনকে খবর দিয়ে ফজল বাড়ি ফিরে আসে। এসেই সে নূরুর খোঁজ করে।

তার মনটা চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে। নূরু ফিরে এলে শোনা যাবে মোল্লাবাড়ির খবরাখবর। ওকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কথার জাল পাতলে রূপজানের কথাও কিছু বের করা যাবে।

স্কুলের বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তার ফেরবার নাম নেই। সে আন্দাজ করে, নূরু ঠিক রূপজানের পাল্লায় পড়েছে। আদর দিয়ে দিয়ে সে ছেলেটার মাথা খেয়ে ফেলবে।

এজন্য রূপজানের ওপর কিন্তু রাগ হয় না ফজলের। বরং প্রসন্নই হয় তার মন। বাপ-মার স্নেহ বঞ্চিত ছেলেটাকে সে নিজেও বড় কম আদর করে না। পড়াশুনার জন্য মাঝে মাঝে সে একটু তয়-তম্বি করে। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। ওর দাদা-দাদির জন্য ওর গায়ে একটা ফুলের টোকা দেয়ার যো নেই।

নূরুর বয়স যখন পাঁচমাস তখন তার বাবা রশিদ চরের কাইজ্যায় খুন হয়। কোলের শিশু নিয়ে বিধবা হাজেরা তিন বছর ছিল মাতব্বর বাড়ি। দু'মাস-তিন মাস পরে সে বাপের বাড়ি মুলফতগঞ্জে বেড়াতে যেত। দশ-বারো দিন পার হতে না হতেই এরফান মাতব্বর নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসত আবার। বলত, 'নাতিডা চউখের কাছে না থাকলে ভালো ঠেকে না। পরানডা ছনিবনি করে।'

BanglaBook.org

এমনি একবার বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল হাজেরা। তার বাবা শরাফত দেওয়ান জোর করে আবার তার নিকে দিয়ে দেয়। মেয়ের কোনো রকম আপত্তিই সে শোনেনি। নূরুর কি হবে ভেবে সে অনেক কেঁদেছিল। কাঁদতে কাঁদতে ফুলিয়ে ফেলেছিল চোখ-মুখ। স্বামীর বাড়ি গিয়েও তার চোখের পানি শুকোয়নি। অবস্থা দেখে পরের দিনই তার স্বামী জালাল মিরধা দেওয়ানবাড়ি থেকে নূরুকে নিয়ে যায়। তাকে 'হাতুয়া পোলা' হিসেবে রাখতে রাজি হয় সে।

এ নিকেতে এরফান মাতব্বরকে দাওয়াত দেয়া দূরে থাক, একটু যোগ-জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেনি শরাফত দেওয়ান। সম্বন্ধের যোগাড়-যন্ত্র সবই খুব গোপনে সেরেছিলো সে। তার ভয় ছিল, খবরটা কোনো রকমে মাতব্বরের কানে গেলে সে হয়তো গোলমাল বাঁধাবে।

তিন দিন পর এরফান মাতব্বরের কাছে খবর পৌঁছে। শুনেই সে রাগে ফেটে পড়ে।

অনেক আরজু নিয়ে দেশ-কুলের এ মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে নিয়েছিল মাতব্বর। আসুলির *'ভাল্ মাইনষের'* সাথে একটা প্যাঁচ দেয়ার জন্য সে পানির মতো টাকা খরচ করেছিল। মেয়ের বাপকে রাজি করাবার জন্য তিনশ একটাকা শাচক দিতে হয়েছিল। মেয়েকে সোনা দিতে হয়েছিল পাঁচ ভরি।

হাজেরার নিকে দিয়েছে, মাতব্বরের রাগ সেজন্য নয়। ছেলের মৃত্যুর পরই সে বুঝতে পেরেছিল, এ মেয়ের ওপর তার আর কোনো দাবি নেই। কাঁচা বয়সের এ মেয়েকে বেশি দিন ঘরে রাখা যাবে না, আর রাখা উচিতও নয়। তবু তিন-তিনটে বছর শ্বশুরবাড়ির মাটি কামড়ে পড়েছিল হাজেরা। দুধের শিশুকে সাড়ে তিন বছরেরটি করেছে। তার কাছে এর বেশি আর কি আশা করা যায়?

কিন্তু রাগ হয়েছিল তার অন্য কারণে। শরাফত দেওয়ান তার মেয়ের নিকে দিয়েছে দিক, তাকে যোগ-জিজ্ঞাসা করেনি, না করুক। কিন্তু তার নাতিকে তার হাতে সোপর্দ করে দিয়ে যায়নি কেন সে? সে কি মনে করেছে মাতব্বরকে?

রাগের চোটে তার মনের স্থৈর্য লোপ পায়। বিড়বিড় করে সে বলে, 'আসুলির হুগ্না ভাল্ মানুষ। হালার লাগুর পাইলে দুইডা কানডলা দিয়া জিগাইতাম, কোন আক্কেলে ও আমার নাতিরে আউত্যা বানাইয়া মাইনষের বাড়ি পাঠাইছে।'

একবার সে ভাবে, যাবে নাকি লাঠিয়াল-লশকর নিয়ে মিরধা বাড়ি? পয়লা মুখের কথা, কাজ না হলে লাঠির গুতা। তার বিশ্বাস, লাঠির গুতা না পড়লে নাতিকে বের করে আনা যাবে না। কিন্তু ফৌজদারির ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিরস্ত হয়।

ফজলের বয়স তখন সতেরো বছর। সে এক বাড়িতে জায়গীর থেকে নড়িয়া হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ত। মাতব্বর তাকে গোপনে খবর পাঠায়, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, চুরি করে বা যেভাবেই হোক নূরুকে যেন সে বাড়ি নিয়ে আসে।

মুলফতগঞ্জ ও নড়িয়া পাশাপাশি গ্রাম। ফজল সুযোগ খুঁজতে থাকে। হাজেরা বাপের বাড়ি নাইয়র এলে সে একদিন দেওয়ানবাড়ি বেড়াতে যায়। নূরুকে জামা কিনে দেয়ার নাম করে মুলফতগঞ্জের হাটে নিয়ে যায় সে। সেখান থেকে নৌকা করে দে পাড়ি! নূরুকে বুকের সাথে জাপটে ধরে সে বাড়ি গিয়ে হাজির হয়।

সেদিন থেকেই সে দাদার আবদার, দাদির আহলাদ আর চাচার আদর পেয়ে বড় হয়ে উঠছে। বাপ-মার অভাব কোনোদিন বুঝতে পারেনি। সে এতখানি বড় হয়েছে, এখন পর্যন্ত দাদির আঁচল ধরে না শুলে তার ঘুম হয় না। দাদার পাতে না খেলে পেট ভরে না। আর চাচার সাথে হুড়োকুস্তি না করলে হজম হয় না পেটের ভাত।

BanglaBook.org

ফজল ঘরের ছাঁচতলা গিয়ে পুবদিকে তাকায়। না, নূরুর টিকিটিও দেখা যায় না।

সে তামাক মাখতে বসে যায়। এত লোকের কল্কে সাজাতে অল্প-স্বল্প তামাকে হবে না। সে দেশী তামাকের মোচ্ড়া মুগুরের ওপর রেখে কুচিকুচি করে কাটে। তলক হওয়ার জন্য কিছু মতিহারি তামাক মিশিয়ে নেয় তার সাথে। শেষে মিঠাম করার জন্য রাব মিশিয়ে হাতের দাবনা দিয়ে ডলাই-মলাই করে।

লোকজন মাতব্বর বাড়ি এসে জমায়েত হতে হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। প্রত্যেকেই ভাওর ঘরের জন্য বাঁশ-খোঁটা, দড়াদড়ি যে যা পেরেছে নৌকা ভরে নিয়ে এসেছে। নিজ নিজ হাতিয়ারও নিয়ে এসেছে সবাই।

ধারে-কাছের কিছু লোক আগেই এসেছিল। এরফান মাতব্বর তাদের বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। দুজন গেছে চুলার ধারে তাদের চাচিকে সাহায্য করতে। তিন-চারজন জং ধরা শড়কি আর কাতরা ঘষতে লেগে গেছে পাথরের ওপর। একজন বালিগচার ওপর কোপা দা আর কাটারিতে ধার দিচ্ছে।

কয়েকজন গেছে কাশ আর চুইন্যা ঘাস কাটতে। ভাওর ঘর তুলতে দরকার হবে এসব ঘাস-পাতার। এগুলোর গোড়ার দিকটা দিয়ে হবে বেড়া আর আগার দিকটা দিয়ে ছাউনি। খুঁটির বাঁশে টান পড়বে। তাই কয়েকজন চলে গেছে নদীর উত্তর পাড়। বানরি ও হাশাইল গ্রাম থেকে বাঁশ কিনে তারা সোজা গিয়ে চরে উঠবে।

লোক এসেছে একশরও বেশি। এত লোকের জন্য থালা-বাসন যোগাড় করা সোজা কথা নয়। ফজল কলাপাতা কাটতে লেগে যায়। কঞ্চির মাথায় কাস্তে বেঁধে সে কলাগাছের আগা থেকে ডাউগ্গা কাটে। তারপর এক একটাকে খণ্ড করে চার-পাঁচটা।

খেতের আল ধরে নূরু আসছে। ধানগাছের মাথার ওপর দিয়ে ওর মাথা দেখা যায়।

ওকে দেখেই ফজলের পাতা কাটা বন্ধ হয়ে যায়। তার বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে।

'ইস, আবার টেরি কাটছে মিয়াসাব।' নূরুর দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলে ফজল।

কাছে এলে সে আবার লক্ষ্য করে, শুধু পরিপাটি করে চুলই আঁচড়ায়নি নূরু, তেলে চকচক করছে চুল। চোখে সুরমাও লাগিয়েছে আবার। গায়ের জামা আর লুঙ্গিটাও তো বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে। তার বুঝতে বাকি থাকে না, এসব কাজে কার হাত লেগেছে।

বাড়ির কাছে আসতেই ফজল ডাক দেয়, 'এই নূরু, এই দিগে আয়।'

কাছে এলে সে কপট রাগ দেখায়, 'কিরে তোরে না বারহায় বারহায় কইয়া দিছিলাম জল্দি কইর‍্যা আইয়া পড়িস। ইস্কুলে যাইতে অইব।'

'চাচি আইতে দিল না যে।'

ফজলের অনুমান ঠিকই হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'আইতে দিল না ক্যান্?'

'চাচি কয়, এদ্দিন পরে আইছস, না খাইয়া যাবি কই?'

'ও তুমি প্যাট তাজা কইর‍্যা আইছ?'

'না খাইয়া আইতে দিল না যে! আবার কইছিল, আইজ থাইক্যা কাইল যাইস।'

'ইস্ আদরের আর সীমা নাই। কি খাওয়াইলরে?'

'বেহানে গিয়া খাইছি কাউনের জাউ আর আন্তেশা পিডা। দুফরে পাঙাশ মাছ ভাজা, পাঙাশ মাছের সালুন, ডাইল। হেষে দুধ আর ক্যালা।'

'ক্যালা কস ক্যান্‌রে? ইস্কুলে পড়স, কলা কইতে পারস না?' মুচ্কি হেসে আবার বলে সে, 'কলা কইতে পারে না, জাদু আমার ট্যাড়া সিঁথি কাটছে, হুঁহ!'

BanglaBook.org

নূরু লজ্জা পেয়ে হাতের এক ঝটকায় চুলগুলো এলোথেলো করে দিয়ে বলে, 'আমি বুঝি কাটছি, চাচি আঁচড়াইয়া দিছে।'

ফজল নূরুকে হাত ধরে পরম স্নেহে কাছে টেনে নেয়। আঙুলের মাথা দিয়ে বিস্রস্ত চুল দু'দিকে সরিয়ে সিঁথিটা ঠিক করতে করতে বলে, 'তোর চোখে সুরমা লাগাইয়া দিছে কে রে?'

'চাচি।'

লুঙ্গি আর জামাডাও বুঝি তোর চাচি ধুইয়া দিছে?'

'হ।'

তোর চাচি কিছু জিগায় নাই?'

'হ জিগাইছে, তোর দাদা কেমুন আছে? তোর দাদি কেমুন আছে?'

'আর কারো কথা জিগায় নাই?'

'হ জিগাইছে, তোর চাচা কেমুন আছে?'

'তুই কি কইছস?'

'কইছি বেবাক ভালো আছে।'

'আর কি কইছে?'

'আর কইছে তোগ লাল গাইডা বিয়াইছে নি?'

'আর ?'

নূরু তার পকেট থেকে একটা ছোট মোড়ক বের করে। কাগজের মোড়কটা ফজলের হাতে দিয়ে সে বলে, 'চাচি কইছে, এইডার মইদ্যে একখান তাবিজ আছে। পীরসাবের তাবিজ।'

'হ তোমারে এইডা মাজায় বাইন্দা রাখতে কইছে।'

'ক্যান্?'

'চাচি কইছে, বালা-মসিবত আইতে পারব না। আর অজু না কইর‍্যা এইডা খুলতে মানা করছে চাচি।'

'ক্যান্, খুললে কি অইব?'

'খুললে বোলে চউখ কানা অইয়া যাইব।'

ফজল মনে মনে হাসে। রূপজানের চাল ধরে ফেলে সে। নূরু যাতে খুলে না দেখে, সে-জন্যই সে চোখ কানা হওয়ার ভয় দেখিয়েছে।

ফজল মোড়কটা পকেটে পুরে বলে, 'আইচ্ছা যা তুই।'

নূরু কিছুদূর যেতেই ফজল ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিরে তোর নানাজান আইল না?'

'হে বাড়িতে নাই, গরু কিনতে মুনশিরহাট গেছে।'

নূরু চোখের আড়াল হতেই ফজল কলাগাছের ঝাড়ের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। পকেট থেকে বের করে মোড়কটা। সুতা দিয়ে ওটাকে আচ্ছামতো পেঁচিয়ে দিয়েছে রূপজান। সুতার প্যাঁচ খুলে সে মোড়কটার ভেতরে পায় একটা সাদা রুমাল আর ভাঁজ করা একটা কাগজ। রুমালটার এক কোণে এমব্রয়ডারি করা ফুল ও পাতা। তার নিচে সুচের ফোর দিয়ে লেখা, 'ভুলনা আমায়।'

ফজল রুমালটা গালের সাথে চেপে ধরে। তারপর ওটাকে পকেটে রেখে সে ভাঁজ করা কাগজটা খুলে পড়ে।

BanglaBook.org

প্রাণাধিক,

হাজার হাজার বহুত বহুত সেলাম পর সমাচার এই যে আমার শত কোটি ভালবাসা নিও। অনেক দিন গুজারিয়া গেল তোমারে দেখি না। তোমারে একটু চউখের দেখা দেখনের লেইগ্যা পরানটা খালি ছট্‌ফট্‌ করে। তুমি এত নিষ্ঠুর। একবার আসিয়া আমার খবরও নিলা না। বা'জান তোমার উপরে রাগ হয় নাই। সে রাগ হইছে মিয়াজির উপরে। সে আমার গয়না বেচিয়া খাইছে। সেই জন্যই বা'জান রাগ হইছে। কিন্তু আমি গয়না চাই না। তুমিই আমার গয়না, তুমিই আমার গলার হার। তুমিই আমার পরানের পরান। যদি তোমার পরানের মধ্যে আমারে জায়গা দিয়া থাক তবে একবার আসিয়া চউখের দেখা দিয়া যাইও। তোমার লেইগ্যা পথের দিগে চাহিয়া থাকিব।

নূরুর কাছে শোনলাম, খুনের চর জাগছে। তোমার আল্লার কিরা, চরের কাইজ্যায় যাইও না। ইতি।

অভিগানী

রূপজান

ফজল কাগজটা উল্টে দেখে, সেখানে একটা পাখি আঁকা। তার নিচে লেখা রয়েছে, *'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।'*

তারও নিচে লেখা আছে একটা পরিচিত গানের কয়েকটা লাইন—

যদি আমার পাখারে থাকত,
কে আমারে ধরিয়া রাখত,
উইড়া যাইতাম পরান বন্ধুর দ্যাশেরে।

ফজল চিঠিটা আবার প্রথম থেকে পড়তে শুরু করে।

'ফজু কই রে ? অ ফজু....'

'জ্বী আইতে আছি।' পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফজল তাড়াতাড়ি চিঠিটা পকেটে পোরে। সে আরো কিছু কলাপাতা কেটে বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলছে এরফান মাতব্বর।

খিচুড়ি রান্না শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

মাতব্বর বলে, 'এই হানে খাওনের হেঙ্গামা করলে দেরি অইয়া যাইব। এক কাম করো, খিচুড়ির ডেগটা নায় উডাইয়া লও। নাও চলতে চলতে যার যার নায়ের মইদ্যে বইয়া খাইয়া লইও।'

রমিজ মিরধা বলে, 'হ এইডাই ভালো। খাইতে খাইতে যদি দিন কাবার অইয়া যায় তয় কোনো কাম অইব না।'

লোকজন খিচুড়ির ডেগটা ধরাধরি করে মাতব্বরের ছই-বিহীন ঘাসি নৌকায় তোলে। কলাপাতাগুলো লোক অনুসারে প্রত্যেক নৌকায় ভাগ করে দেয় ফজল। বাঁশ-খোঁটা, লাঠি-শড়কি, ঢাল-কাতরা আগেই নৌকায় উঠে গেছে। এবার লোকজনও যার যার নৌকায় উঠে যায়।

নূরু এসে ফজলকে ডাকে, 'ও দুদু, দাদি তোমারে বোলায়।'

ফজল উঠানে গিয়ে দেখে, তার বাবা আর মা ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে।

মাতব্বর বলে, 'জুয়ান পোলা দশজনের লগে যাইব না, এইডা কেমুন কথা! মাইনষে হুনলে কইব কি ? বাঘের ঘরে মেকুর পয়দা অইছে।'

BanglaBook.org

'কইলে কউক। আমার পোলা আমি যাইতে দিমু না।'

'যাইতে দিবা না, তয় কি মুরগির মতন খাঁচায় বাইন্দা রাখতে চাও?'

'মাইনষের কি আকাল পড়ছে নি? দুইডা না, তিনডা না, একটা পোলা আমার। ও না গেলে কি অইব?'

'কি অইব, তুমি বোঝবা না। আমার দিন তো ফুরাইয়া আইল, আমি চউখ বুজলে ও-ই অইব মাতব্বর। আপদে-বিপদে মাইনষের আগে আগে চলতে না হিগলে মাতবরি-সরদারি করব কেমন কইর‍্যা?'

'থাউক, আমার পোলার মাতবরি-হরদারি করণ লাগব না।'

ফজল এগিয়ে গিয়ে মা-কে বাধা দেয়, 'তুমি চুপ অওতো মা। কি শুরু করছ?'

তারপর সে তার পিতার দিকে চেয়ে বলে, 'বা'জান, বেবাক জিনিস নায়ে উইট্যা গেছে। আপনে ওঠলেই এখন রওনা দিতে পারি।'

বরুবিবি এবার ফজলকে বলে, 'অ ফজু, বা'জানরে তুই যাইস না।'

'ক্যান্ যাইমু না?'

'ক্যান্ যাইমু না, হায় হায়রে আবার উল্ডা জিগায় ক্যান্ যাইমু না। তয় যা-যা তোরা বাপে পুতে দুইজনে মিল্যা আমার কল্ডাডা কাইট্যা থুইয়া হেষে যা।'

মাতব্বর কাছে এসে ধীরভাবে বলে, 'ও ফজুর মা, হোন। আমরা তো কাইজ্যা করতে যাইতে আছি না। এইবার আর কাইজ্যা অইব না। চেরাগ আলী ঐ বচ্ছর মেই চুবানি খাইছে, এই বচ্ছর আর চরের ধারে কাছে আইতে সাহস করব না।'

'তয় ফজুরে নেওনের কাম কি?'

'ও না গেলে মানুষ-জনেরে খাওয়াইব কে? আর হোন, কাইজ্যা লাগলে ওরে কাইজ্যার কাছে যাইতে দিমু না। তুমি আর ভাবনা কইর‍্যা না। চলসে ফজু, আর দেরি করণ যায় না।'

বাপের পেছনে পেছনে ছেলে রওনা হয়। বরু বরুবিবির কাছেই দাঁড়ানো ছিল। 'তাম্‌শা' দেখবার জন্য সে-ও নৌকাঘাটার দিকে রওনা হয়। বরুবিবি খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলে। তারপর তাকে কোলের মধ্যে নিয়ে সে বিলাপ করতে শুরু করে দেয়, 'ও আমার রশুরে, বাজান তোরে না যে ভোলতে না যে-পা-া-া-রি, সোনার চান ঘরে থুইয়া কেমনে চইল্যা গে-ে-ে-লি, বাজানরে-ে-ে-ে, আ-মা-া-র।'

এরফান মাতব্বর নৌকায় উঠেই তাড়া দেয়, 'আর দেরি কইর‍্য না। এইবার আল্লার নাম লইয়া রওনা দ্যাও।'

লোকজন যার যার নৌকা খুলে রওনা হয়। মেহের মুনশি হাঁক দেয়, 'আল্লা-রসুল বলো ভাইরে ম-মী-ী-ী-ন'

'আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুনশির কথার শেষ ধরে বাকি সবাই 'জাক্কইর' দেয়।

মাতব্বরের ঘাসি নৌকার আগে-পিছে তেইশখানা নৌকা চলছে। কোনোটায় চারজন, কোনোটায় বা পাঁচজন করে লোক। কিছুদূর গিয়েই ফজল খিচুড়ি পরিবেশন করতে লেগে যায়। সে ইযারি হাতে ডেগের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। চলতে চলতে এক একটা ডিঙি এসে নৌকার সাথে ভিড়ে। ফজল লম্বা হাতলওয়ালা কাঠের ইযারি দিয়ে ডেগ থেকে খিচুড়ি তুলে কলাপাতার ওপর ঢেলে দেয়।

এরফান মাতব্বর লোকজনদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, 'যার যার প্যাট ভইর‍্যা খাইও মিয়ারা। রাইতে কিন্তু খাওয়ার যোগাড় করণ যাইব না।'

BanglaBook.org

এরফান মাতব্বর সকলের ওপর দিয়ে গাছ-মাতব্বর। তার সাথে ঘাসি নৌকায় বসে আলাপ-আলোচনা করছে পুলকি-মাতব্বর রমিজ মিরধা, জাবেদ লশকর, মেহের মুনশি আর কদম শিকারি। পুলকি অর্থাৎ সদ্য উদ্‌গত গাছের শাখার মতোই তারা কচি মাতব্বর। তাদের চারপাশে বসেছে সাত-আটজন কোলশরিক।

তারা পরামর্শ করে ঠিক করে, চরের উত্তর দিকটা পাহারা দেয়ার জন্য জাবেদ লশকর ও তার লোকজন ভাওর ঘর তুলবে। এভাবে দক্ষিণদিকে কদম শিকারি, পশ্চিমদিকে রমিজ মিরধা আর পুবদিকে মেহের মুনশি তাদের লোকজন নিয়ে পাহারা দেবে। যদি কেউ চর দখল করতে আসে তবে পুবদিক দিয়ে আসার সম্ভাবনাই বেশি। তাই এরফান মাতব্বর ও তার আত্মীয়-স্বজন পুবদিকটায় ভাওর ঘর তুলবার মনস্থ করে।

সবগুলো ডিঙির লোকজন খাওয়া শেষ করেছে। এবার মাতব্বর ঘাসি নৌকার সবার সাথে খেতে বসে। খেতে খেতে সবাই তারিফ করে খিচুড়ির। রমিজ মিরধা বলে, 'চাচির আতের খিচুড়ি যে খাইছে, হে আর ভোলতে পারব না কোনোদিন।'

রান্নার প্রশংসা শুনে মাতব্বর খুশি হয়। কিন্তু সবার অজান্তে সে একটা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়ে। আর মনে মনে ভাবে, এ তারিফ যার প্রাপ্য সে আর মাতব্বর বাড়ি নেই এখন।

আসুলির ভাল মাইনষের ঘরের মেয়ে ক'টা বছরের জন্য এসে মাতব্বর বাড়ির রান্নার ধরনটাই বদলে দিয়ে গেছে। হাজেরা এই বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর বরুবিবি তার হাতেই রসুইঘরের ভার ছেড়ে দিয়েছিল। হাজেরা বাপের বাড়ি নাইয়র গেলে মুশকিল বেঁধে যেত। স্ত্রীর হাতের রান্না খেয়ে মাতব্বর মুখ বিকৃত করে বলত, 'নাগে, ভাল্ মাইনষের মাইয়ার রান্দা খাইতে খাইতে জিব্বাডাও ভাল্ মানুষ অইয়া গেছে। তোমার আতের ফ্যাজাগোজা আর ভাল্ লাগে না।'

নিরুপায় হয়ে বরুবিবিকে শেষে পুতের বউর কাছে রান্না শিখতে হয়েছিল।

এরফান মাতব্বর তার লোকজন নিয়ে যখন নতুন চরে পৌঁছে, তখন রোদের তেজ কমে গেছে।

মাতব্বর সবাইকে নির্দেশ দেয়, 'যার যার জাগায় ডিঙ্গা লইয়া চইল্যা যাও। আমরা *'আল্লাহু আকবর'* কইলে তোমরা ঐলগে আওয়াজ দিও। এই রহম তিনবার আওয়াজ দেওনের পর *'বিছমিল্লা'* বুইল্যা বাঁশগাড়ি করবা।'

একটু থেমে সে আবার বলে, 'তোমরা হুঁশিয়ার অইয়া থাইক্য। রাইতে পালা কইর‍্যা পাহারা দিও এক একজন।'

লোকজন নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে ডিঙি নিয়ে চলে যায়।

আছরের নামাজ পড়ে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মাতব্বর। তারপর লোকজন নিয়ে নৌকা থেকে নামে। বাঁশের খোঁটা হাতে এক একজন হাঁটু পানি ভেঙে মাতব্বরের নির্দেশ মতো দূরে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

ফজলকে ডেকে মাতব্বর বলে, 'অ ফজু, এইবার *'আল্লাহু আকবর'* আওয়াজ দে।'

ফজল গলার সবটুকু জোর দিয়ে হাঁক দেয়, *'আল্লাহু আকবর।'*

চরের চারদিক থেকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ ওঠে, *'আল্লাহু আকবর।'*

তিনবার তকবির ধ্বনির পর একসাথে অনেকগুলো বাঁশ গেড়ে বসে চরের চারদিকে। দখলের নিশান হয়ে সেগুলো দাঁড়িয়ে থাকে পলিমাটির বুকে।

BanglaBook.org

॥ চার ॥

উত্তরে মূলভাওড়, দক্ষিণে হোগলাচর, পুবে মিত্রের চর আর পশ্চিমে ডাইনগাঁও—এই চৌহদ্দির মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলো চর। চারদিকে জলবেষ্টিত পলিদ্বীপ। এগুলোর উত্তর আর দক্ষিণদিক দিয়ে দ্বীপবতী পদ্মার দুটি প্রধান স্রোত পুব দিকে বয়ে চলেছে। উত্তর দিকের স্রোত থেকে অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে চরগুলোকে ছোট বড় গোল দিঘল নানা আকারে কেটে-ছেঁটে মিশেছে গিয়ে দক্ষিণদিকের স্রোতের সঙ্গে।

চরগুলোর বয়স দুবছরও হয়নি। এগুলো জেগেছে আর জঙ্গুরুল্লার কপাল ফিরেছে। প্রায় সবগুলো চরই দখল করে নিয়েছে সে। আর এ চরের দৌলতে নানাদিক দিয়ে তার কাছে টাকা আসতে শুরু করেছে। কোলশরিকদের কাছ থেকে বাৎসরিক খাজনার টাকা আসে। বর্গা জমির ধান-বেচা টাকা আসে। আসে ঘাস-বেচা টাকা।

কোলশরিক আর কৃষাণ-কামলারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'ট্যাহারা মানুষ চিনে। ওরা বোঝে, কোন মাইনষের ঘরে গেলে চিৎ অইয়া অনেকদিন জিরাইতে পারব।'

'হ, ঠিক কথাই কইছ। আমরা তো আর ট্যাহা-পয়সারে এক মুহূর্তুক জিরানের ফরসত দেই না। আইতে না আইতেই খেদাইয়া দেই।'

টাকারা জঙ্গুরুল্লাকে চিনেছে মাত্র অল্প কয়েক বছর আগে। ভালো করে চিনেছে ধরতে গেলে চরগুলো দখলে আসার পর। আজকাল টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করার সময় বিগত জীবনের কথা প্রায়ই মনে পড়ে তার। জঙ্গুরুল্লার বয়স পয়তাল্লিশ পার হয়েছে। গত পাঁচটা বছর বাদ দিয়ে বাকি চল্লিশটা বছর কি দুঃখ কষ্টই না গেছে তার। জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টাই কেটেছে অভাব-অনটনের মধ্যে। পেটের ভেতর জ্বলেছে খিদের আগুন। অথচ তার শরীরের ঘামও কখনো শুকোয়নি।

সাত বছর বয়সের সময় তার মা মারা যায়। বাপ গরিবুল্লা আবার শাদি করে। জঙ্গুর সৎমা ছিল আর সব সৎমাদের মতোই। বাপও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। অতটুকু বয়সেই সে বুঝতে পেরেছিল—গাঁয়ের লোক শুধু শুধুই বলে না, 'মা মরলে বাপ অয় তালুই।'

ঘোপচরে গরিবুল্লার সামান্য কিছু জমি ছিল। সেই জমি চাষ করে আর কামলা খেটে কোনো রকমে সে সংসার চালাত। জঙ্গুর বয়স দশ বছর হতে না হতেই সে তাকে হোগলাচরের এক চাষী গেরস্তের বাড়ি কাজে লাগিয়ে দেয়। সেখানে পাঁচ-ছবছর পেটে-ভাতে রাখালি করে সে। তারপর দুটাকা মাইনেয় ঐ চরেরই আর এক বড় গেরস্তের বাড়ি হাল-চাষের কাজ জুটে যায়।

বছর চারেক পরে তার বাপ মারা যায়। সৎমা তার ছবছরের মেয়েকে নিয়ে নিকে বসে অন্য জায়গায়। জঙ্গু ঘোপচরে ফিরে আসে। গাঁয়ের দশজনের চেষ্টায় তার বিয়েটাও হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যেই। গরিব চাষীর মেয়ে আসমানি। গোবরের ঘুঁটে দেয়া থেকে শুরু করে ধান ভানা, চাল ঝাড়া, মুড়ি ভাজা, ঘর লেপা, কাঁথা সেলাই, দুধ দোয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজে তার হাত চলে। আর অভাব-অনটনের সময় দু-এক বেলা উপোস দিতেও কাতর হয় না সে। কোনো রকমে জোড়া-তালি দিয়ে গুছিয়ে নেয় সে গরিবের সংসার।

জঙ্গুরুল্লা বাপের লাঙ্গল-গরু নিয়ে চাষ-বাস শুরু করে। মাঝে মাঝে কামলা খাটে অন্যের জমিতে। সারাদিন সে কি খাটুনি! পুরো পাঁচটা দিন কামলা খেটে পাওয়া যেত একটিমাত্র টাকা। টাকাটা নিয়ে সে মুলফতগঞ্জের হাটে যেত। দশ আনায় কিনত সাত সের চাল আর বাকি ছ'আনার ডাল-তেল-নুন-মরিচ ও আরো অনেক কিছু।

BanglaBook.org

এ সময়ের একটা ঘটনার কথা মনে পড়লেই তার কপাল কুঁচকে ওঠে। চোখদুটো ক্রূর দৃষ্টি মেলে তাকায় নিজের পা দুখানার দিকে। দুপাটি দাঁত চেপে ধরে নিচের ঠোঁট।

ঘোপচরের মাতব্বর ছিল সোহরাব মোড়ল। তার ছেলের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে জঙ্গুরুল্লা দক্ষিণপাড়ের কলুকাঠি গিয়েছিল। আসুলির ভাল্ মানুষ। মেহমানদের জন্য সাদা ধবধবে ফরাস বিছিয়েছিল বৈঠকখানায়। সেই ফরাসের ওপর জঙ্গুরুল্লা তার থেবড়া পায়ের কয়েক জোড়া ছাপ ফেলেছিল। তা দেখে চোখ টেপাটিপি করে হেসেছিল কনেপক্ষের লোকেরা। তাদের অবজ্ঞার হাসি বরপক্ষের লোকদের চোখ এড়ায়নি। রাগে সোহরাব মোড়লের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। কোনো রকমে সে সামলে নেয় নিজেকে।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পথেই সে পাকড়াও করে জঙ্গুরুল্লাকে জুতা খুলে মারতে যায়। আর সবাই না ঠেকালে হয়তো জুতার বাড়ি দু-একটা পড়ত জঙ্গুরুল্লার পিঠে।

সোহরাব মোড়ল রাগে গজগজ করে, 'শয়তান, ওর কি এট্টু আক্কেল-পছন্দ নাই ? ও আধোয়া পায়ে ক্যামনে গিয়া ওঠল অমন ফরাসে। দেশ-কুলের তারা আমাগ কি খামাখা নিন্দে ? খামাখা কয় চরুয়া ভূত ?'

দুলার ফুফা হাতেম খালাসি বলে, 'এমুন গিধড় লইয়া ভর্দ লোকের বাড়িতে গেলে কইব না কি ছাইড়্যা দিব ? আমাগ উচিত আছিল বাছা বাছা মানুষ যাওনের।'

'ঠিক কথাই কইছ, এইবারতন তাই করতে অইব।'

'আইচ্ছা, ওর ঘাড়ের উপরে দুইট্টা চটকানা দিয়া জিগাও দেহি, ওর চরণ দুইখান পানিতে চুবাইলে কি ক্ষয় অইয়া যাইত ?'

বরযাত্রীদের একজন বলে, 'কারবারডা অইছে কি, হোনেন মোড়লের পো। জুতাতো বাপ্-বয়সে পায়ে দেয় নাই কোনো দিন। নতুন রফটের জুতা পায়ে দিয়া ফোস্কা পড়ছে। নায়েরতন নাইম্যা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কিছুদূর আইছিল। হেরপর খুইল্যা আতে লয়। বিয়াবাড়ির কাছে গিয়া ঘাসের মইদ্যে পাও দুইখান ঘইষ্যা ত্বরাত্বরি জুতার মইদ্যে ঢুকাইছিল।'

'ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! জাইতনাশা কুত্তা! ওর লেইগ্যা পানির কি আকাল পড়ছিল ? কই গেল পা-না-ধোয়া শয়তানডা ?'

একটা হাসির হল্লা বরযাত্রীদের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সবাই খোঁজ করে জঙ্গুরুল্লার, 'কইরে পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা ? কই ? কই গেল পা-না-ধোয়া গিধড় ?'

জঙ্গুরুল্লাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি সেখানে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে পেছন থেকে সরে পড়েছিল।

কিন্তু সরে পড়লে কি হবে ? দশজনের মুখে উচ্চারিত সেদিনকার সেই পা-না-ধোয়া বিশেষণটা তার নামের আগে এঁটে বসে গেছে। নামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিরাজ করছে সেদিন থেকে। নামের সঙ্গে এ বিশেষণটা যোগ না করলে তাকে চেনাই যায় না আর।

পা-না-ধোয়া বললে প্রথম দিকে খেপে যেত জঙ্গুরুল্লা। মারমুখী হয়ে উঠত। কিন্তু তার ফল হতো উল্টো। সে যত বেশি চট্‌ত তত বেশি করে চটাত পাড়া-প্রতিবেশীরা। শেষে নিরুপায় হয়ে নিজের কর্মফল হিসেবেই এটাকে মেনে নিতে সে বাধ্য হয়।

চার বছর পর ঘোপচর নদীতে ভেঙে যায়। জঙ্গুরুল্লা চণ্ডীপুর মামুর বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ কাজে সে কাজে সাতঘাটের পানি খেয়ে সে যখন জীবিকার আর কোনো পথ পায় না তখন ঘড়িশার কাছারির নায়েবের কথা মনে পড়ে তার।

BanglaBook.org

চণ্ডীপুর আসার মাস কয়েক পরের কথা। ঘড়িশার কাছারির নায়েব শশীভূষণ দাস স্টিমার ধরবার জন্য নৌকা করে সুরেশ্বর স্টেশনে গিয়েছিলেন। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে তিনি প্রাতঃকৃত্যের জন্য নদীর পাড়ে কাশঝোপের আড়ালে গিয়ে বসেছিলেন। ঐ সময়ে জঙ্গুরুল্লা ঝাঁকিজাল নিয়ে ওখানে মাছ ধরছিল। জালটা গোছগাছ করে সে কনুইর ওপর চড়িয়েছে এমন সময় শুনতে পায় চিৎকার। জালটা ঐ অবস্থায় নিয়েই সে পেছনে ফিরে দেখে একটা পাতিশিয়াল খ্যাঁকখ্যাঁক করে একটা লোককে কামড়াবার চেষ্টা করছে। লোকটা চিৎকার করছে, পিছু হটছে আর লোটা দিয়ে ওটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে। জঙ্গুরুল্লা দৌড়ে গিয়ে জাল দিয়ে খেপ মারে পাতিশিয়ালের ওপর। পাতিশিয়াল জালে জড়িয়ে যায়। লোকটার হাত থেকে লোটা নিয়ে সে ওটার মাথার ওপর মারে দমাদম। ব্যস, ওতেই ওর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

ডাক-চিৎকার শুনে বহু লোক জমা হয়েছিল সেখানে। তাদের কাছে জানা যায়—আগের দিন ঐ এলাকার পাঁচ জনকে পাগলা শিয়ালে কামড়িয়েছে। সবাই বুঝতে পারে—ওটাই সেই পাগলা শিয়াল।

জঙ্গুরুল্লার বুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা করে সকলেই। নায়েব তাকে দশ টাকা বখশিশ দিয়ে বলেন, 'যদি কখনো দরকার পড়ে, আমার ঘড়িশার কাছারিতে যেও।'

দুঃসময়ে নায়েবের কথা মনে পড়তেই সে চলে গিয়েছিল ঘড়িশার কাছারিতে। নায়েব তাকে পেয়াদার চাকরিতে বহাল করে নেন। মাসিক বেতন তিন টাকা। বেতন যাই হোক, এ চাকরির উপরিটাই আসল। আবার উপরির ওপরে আছে ক্ষমতা যাকে জঙ্গুরুল্লা বলে *'পাওর'*। এ কাজে ঢুকেই জঙ্গুরুল্লা প্রথম প্রভুত্বের স্বাদ পায়। সঙ্গে তিন হাত বাঁশের লাঠি হাতে সে যখন মহালে যেত তখন তার দাপটে থরথরিয়ে কাঁপত প্রজারা। নায়েবের হুকুমে সে বকেয়া খাজনার জন্য প্রজাদের ডেকে নিয়ে যেত কাছারিতে। দরকার হলে ধরেও নিত। কখনো তাদের হাত-পা বেঁধে চিৎ করে রোদে শুইয়ে রাখত, কখনো কানমলা বাঁশডলা দিয়ে ছেড়ে দিত।

একবার এক প্রজাকে ধরতে গিয়েছিল জঙ্গুরুল্লা। লোকটা অনেক কাকুতি-মিনতি করে শেষ সম্বল আট আনা এনে দেয় তার হাতে। কিন্তু কিছুতেই জঙ্গুরুল্লার মন গলে না। শেষে লোকটা তার পা জড়িয়ে ধরে।

চমকে ওঠে জঙ্গুরুল্লা। অনেকক্ষণ থম ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। শেষে বলে, 'যা তোরে ছাইড়্যা দিলাম। পাট বেইচ্যা খাজনার টাকা দিয়া আহিস কাছারিতে।'

তারপরেও এ রকম ঘটনা ঘটেছে কয়েকবার। প্রত্যেকবারই মাপ করে দেয়ার সময় তার অন্তরে আকুল কামনা জেগেছে, 'সোহরাব মোড়লরে একবার পায়ে ধরাইতে পারতাম এই রহম!'

শুধু কামনা করেই ক্ষান্ত হয়নি জঙ্গুরুল্লা। সোহরাব মোড়লকে বাগে পাওয়ার চেষ্টাও অনেক করেছে সে। তার চেষ্টা হয়তো একদিন সফল হতো, পূর্ণ হতো অন্তরের অভিলাষ। কিন্তু পাঁচটা বছর—যার বছর দুয়েক গেছে ওত-ঘাত শিখতে—পার হতে না হতেই তার পেয়াদাগিরি চলে যায়। প্রজাদের ওপর তার জুলুমবাজির খবর জমিদারের কানে পৌঁছে। তিনি জঙ্গরুল্লাকে বরখাস্ত করার জন্য পরোয়ানা পাঠান নায়েবের কাছে। জমিদারের পরোয়ানা। না মেনে উপায় কি ? নায়েব জঙ্গুরুল্লাকে বরখাস্ত করেন বটে, তবে কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে নতুনচর বালিগাঁয়ে তাকে কিছু জমি দেন।

BanglaBook.org

জঙ্গুরুল্লা বালিগাঁয়ে গিয়ে ঘর বাঁধে। লাঙ্গল-গরু কিনে আবার শুরু করে চাষ বাস। আগের মতো হাবা-গোবা সে নয় আর। একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে সে। আগে ধমক খেলে যার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হতো, সে এখন পানির ছিটে খেলে লগির গুঁতো দিতে পারে।

জমিদারের কাছারিতে কাজ করে নানা দিক দিয়ে তার পরিবর্তন ঘটেছে। সে দশজনের সাথে চলতে ফিরতে কথাবার্তা বলতে শিখেছে। জমা-জমি সংক্রান্ত ফন্দি-ফিকির, প্যাঁচগোছও শিখেছে অনেক। তাছাড়া বেড়েছে তার কূটবুদ্ধি ও মনের জোর। যদিও প্রথম দিকে গাঁয়ের বিচার-আচারে তাকে কেউ পুছত না, তবুও সে যেত এবং সুবিধে মতো দু-চার কথা বলতো। এভাবে গাঁয়ের সাদাসিধে লোকদের ভেতর সে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সে গাঁয়ের অন্যতম মাতব্বর বলে গণ্য হয়।

তারপর আসে ১৩৪৬ সাল—জঙ্গুরুল্লার ভাগ্যোদয়ের বছর। বর্ষার শেষে আশ্বিন মাসে মাঝ-নদীতে একটার পর একটা চর পিঠ ভাসাতে শুরু করে। পদ্মার প্রধান স্রোত দু'ভাগ হয়ে সরে যায় উত্তরে আর দক্ষিণে। জঙ্গুরুল্লা বালিগাঁয়ের লোকজন নিয়ে কয়েকটা চরই দখল করে নেয়। তারপর কুণ্ডু আর মিত্র জমিদারদের কাছারি থেকে বন্দোবস্ত এনে বসিয়ে দেয় কোলশরিক। তাদের কাছ থেকে মোটা হারে সেলামি নিয়ে সে তার অবস্থা ফিরিয়ে ফেলে।

চরগুলো দখল করার পর জঙ্গুরুল্লা চরপাঙাশিয়ায় নতুন বাড়ি করে। উত্তর, পুব আর পশ্চিম ভিটিতে চৌচালা ঘর ওঠে। দক্ষিণ ভিটিতে ওঠে আটচালা কাছারি ঘর। নতুন ঢেউটিনের চালা আর পাতটিনের বেড়া নিয়ে ঘরগুলো দিনের রোদে চোখ ঝলসায়। রাত্রে চাঁদের আলোয় বা চলন্ত স্টিমারের সার্চলাইটের আলোয় ঝলমল করে।

ঘরগুলো তুলতে অনেক টাকা খরচ হয়েছিল জঙ্গুরুল্লার। সে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে প্রায়ই বলে, 'গাঙ অইল পাগলা রাক্‌কস। কখন কোন চরের উপ্‌রে থাবা মারে, কে কইতে পারে? এইডা যদি চর না অইত, তয় আল্লার নাম লইয়া দালানই উডাইতাম।'

যত বড় পয়সাওয়ালাই হোক, পদ্মার চরে দালান-কোঠা তৈরি করতে কেউ সাহস করে না। দালান মানেই পোড়া মাটির ঘর। মাটির ওপর যতক্ষণ খাড়া থাকে ততক্ষণই এ মাটির ঘরের দাম। ভেঙে ফেললে মাটির আর কী দাম? তাই চরের লোক টিনের ঘরই পছন্দ করে। চর-ভাঙা শুরু হলে টিনের চালা, টিনের বেড়া খুলে, খাম-খুঁটি তুলে নিয়ে অন্য চরে গিয়ে ঠাঁই নেয়া যায়।

বিভিন্ন চরে জঙ্গুরুল্লার অনেক জমি আছে। কোলশরিকদের মধ্যে জমির বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের জন্য বাছাবাছা জমিগুলো রেখেছে সে। নিজে বা তার ছেলেরা আর হাল-চাষ করে না এখন। বর্গাদার দিয়ে চাষ করিয়ে আধাভাগে অনেক ধান পাওয়া যায়। সে ধানে বছরের খোরাক হয়েও বাড়তি যা বাঁচে তা বিক্রি করে কম সে-কম হাজার দুয়েক টাকা ঘরে আসে। নিজেরা হাল-চাষ না করলেও জমা-জমি দেখা-শোনা করা দরকার, বর্গাদারদের থেকে ভাগের ভাগ ঠিকমতো আদায় করা দরকার। এ চর থেকে দূরের চরগুলোর দেখাশোনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সে কিছুদিন আগে কুমিরডাঙ্গা আর বগাদিয়ায় আরো দুখানা বাড়ি করেছে। কুমিরডাঙ্গায় গেছে প্রথমা স্ত্রী আসমানি বিবি তার সেজো ছেলে জহিরকে নিয়ে। ঘরজামাই গফুর আর মেয়ে খায়রুনও গেছে তাদের সাথে। বড় ছেলে জাফর বগাদিয়ায় গিয়ে সংসার পেতেছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শরিফন আর মেজো ছেলে ও ছেলে-

BanglaBook.org

বউ রয়েছে বড় বাড়িতে। জঙ্গুরুল্লা বেশির ভাগ সময় ও বাড়িতেই থাকে। মাঝে মাঝে নিজের পানসি নিয়ে চলে যায় কুমিরডাঙ্গা, না হয় বগাদিয়া।

টাকার জোর, মাটির জোর আর লাঠির জোর—এ তিনটার জোরে জোরোয়ার জঙ্গুরুল্লা। এখন 'সর্মানের' জোর হলেই তার দিলের আরজু মেটে। সম্মানের নাগাল পেতে হলে বিদ্যার জোরও দরকার—সে বুঝতে পারে। বড় তিন ছেলেতো তারই মতো চোখ থাকতে অন্ধ। তারা 'ক' লিখতে কলম ভাঙে। তাই সে ছোট ছেলে দুটিকে স্কুলে পাঠিয়েছে। তারা হোস্টেলে থেকে মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ে।

মান-সম্মান বাড়াবার জন্য জঙ্গুরুল্লা টাকা খরচ করতেও কম করছে না। গত বছর সে মৌলানা তানবীর হাসান ফুলপুরীকে বাড়িতে এনে মস্ত বড় এক জেয়াফতের আয়োজন করেছিল। সে জেয়াফতে গরুই জবাই হয়েছিল আঠারোটা। দাওয়াতি-বে-দাওয়াতি মিলে অন্তত তিন হাজার লোক হয়েছিল। সে জনসমাবেশে মৌলানা সাহেব তাকে চৌধুরী পদবিতে অভিষিক্ত করে যান। সেদিন থেকেই সে চৌধুরী হয়েছে। নতুন দলিলপত্রে এই নামই চালু হচ্ছে আজকাল। চরপাঙাশিয়ার নামও বদলে হয়েছে চৌধুরীর চর। কিন্তু এত কিছু করেও তার নামের আগের সে পা-না-ধোয়া খেতাবটা ঘুচল না। তার তাঁবে আছে যে সমস্ত কোলশরিক আর বর্গাদার, তারাই শুধু ভয়ে ভয়ে তার চৌধুরী পদবির স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তা-ও সামনা-সামনি কথা বলার সময়। তার অগোচরে আশপাশের লোকের মতো এখানে তারা পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লাই বলে।

কিছুদিন আগে তার সেজো ছেলে জহিরের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য সে ঘটক পাঠিয়েছিল উত্তরপাড়ের ভাটপাড়া গ্রামের কাজিবাড়ি। শামসের কাজি প্রস্তাব শুনে *'ধ্যুত ধ্যুত'* করে হাঁকিয়ে দেন ঘটককে। বলেন, 'চদরি নাম ফুডাইলে কি অইব! সাত পুরুষেও ওর বংশের পায়ের ময়লা যাইব না।'

এ সবই জঙ্গুরুল্লার কানে যায়। রাগের চোটে সে দাঁতে দাঁত ঘষে। নিন্দিত পা দুটোকে মেঝের ওপর ঠুকতে থাকে বারবার। তার ইচ্ছে হয়, পা দুটো দিয়ে সে লণ্ডভণ্ড করে দেয় সবকিছু, পদানত করে চারদিকের সব মাটি আর মানুষ। এমনি করেই এক রকমের দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় তার মনে। তাই আজকাল আশেপাশে কোনো নতুন চর জাগলেই লাঠির জোরে সে তা দখল করে নেয়। জমির সত্যিকার মালিকেরা উপায়ান্তর না দেখে হাতজোড় করে এসে তার কাছে দাঁড়ায়। দয়া হলে কিছু জমি দিয়ে সে তাদের কোলশরিক করে রাখে।

চরদিঘলির উত্তরে বড় একটা চর জেগেছে—খবর পায় জঙ্গুরুল্লা। চরটা তার এলাকা থেকে অনেক দূরে, আর কারা নাকি ওটা দখলও করে বসেছে। এসব অসুবিধের কথা ভেবেও দমে না সে। নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতর পরপর অনেকগুলো চর দখল করে তার হিম্মত বেড়ে গেছে। তাই কোনো রকম অসুবিধাই সে আর অসুবিধা বলে মনে করে না। চর আর চরের দখলকারদের বিস্তারিত খবর আনবার জন্য সে তার মেজো ছেলে হরমুজকে দু'জন কোলশরিকের সাথে নতুন চরের দিকে পাঠিয়েছিল। তারা ফিরে এসে খবর দেয়—চরটার নাম খুনের চর, দখল করেছে এরফান মাতব্বর, ভাঙর ঘর উঠেছে উনষাটটা।

সেদিনই জঙ্গুরুল্লা তার বিশ্বস্ত লোকজন ডাকে যুক্তি-পরামর্শের জন্য। তার কথার শুরুতেই শোনা যায় অনুযোগের সুর, 'কি মিয়ারা, এত বড় একটা চর জাগল, তার খবরডা আগে যোগাড় করতে পার নাই ?'

BanglaBook.org

কোলশরিক মজিদ খালাসি বলে, 'ঐ দিগেত আমাগ চলাচল নাই হুজুর।'

'ক্যান্ ?'

'আমরা হাট-বাজার করতে যাই দিঘিরপাড় আর হাশাইল। হাশাইলের পশ্চিমে আমাগ যাওয়া পড়ে না।'

'যাওয়া পড়ে না তো বোঝলাম। কিন্তুক এদিকে যে গিট্টু লাইগ্যা গেছে।'

'গিট্টু! কিয়ের গিট্টু ?' দবির গোরাপি বলে।

'হোনলাম, এরফান মাতব্বর চরডা দখল কইর‍্যা ফালাইছে।'

'হ, আগের বার আট-দশ বচ্ছর আগে যহন্ ঐ চর পয়স্তি অইছিল তহন এরফান মাতব্বরই ওইডা দখল করছিল।'

'হ, তার বড় পোলা ঐ বারের কাইজ্যায় খুন অইছিল।' মজিদ খালাসি বলে।

প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী, সেটাই ভাবনার কথা। জঙ্গুরুল্লার কথা-বার্তায় কিন্তু ভাবনার বিশেষ কোনো আভাস পাওয়া যায় না।

সে স্বাভাবিক ভাবেই বলে, 'খবরডা আগে পাইলে বিনা হ্যাঙ্গামে কাম ফতে অইয়া যাইত। যাক গিয়া, তার লেইগ্যা তোমরা চিন্তা কইর‍্য না। চর জাগনের কথাডা যখন কানে আইছে তখন একটা উল্লাগুল্লা না দিয়া ছাইড়্যা দিমু!'

'কিন্তু হুজুর, রেকট-পরচায় ঐ চরতো এরফান মাতব্বরের নামে আছে।' মজিদ খালাসি বলে।

'আরে রাইখ্যা দ্যাও তোমার রেকট-পরচা। চরের মালিকানা আবার রেকট-পরচা দিয়া সাব্যস্ত অয় কবে ? এইখানে অইল, লাডি যার মাডি তার।'

'তবুও কিছু একটা....'

'সবুর করো, তারও ব্যবস্থা করতে আছি। ঐ তৌজিমহালের এগারো পয়সার মালিক বিশুগাঁয়ের জমিদার রায়চৌধুরীরা। আমি কাইলই বিশুগাঁও যাইমু। রায়চৌধুরীগ নায়েবরে কিছু টাকা দিলেই সে আমাগ বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করব।'

'নালিশ করব!'

'হ, কয়েক বচ্ছরের বকেয়া খাজনার লেইগ্যা নালিশ করব। আমরাও তখন খাজনা দিয়া চেক নিমু। তারপর এরফান মাতব্বরও যেমুন রাইয়ত, আমরাও তেমুন।'

'কি কইলেন হুজুর, বোঝতে পারলাম না।' মজিদ খালাসি বলে।

'থাউক আর বেশি বুঝাবুঝির দরকার নাই। যদি জমিন পাইতে চাও, তবে যার যার দলের মানুষ ঠিক রাইখ্য। ডাক দিলেই যেন পাওয়া যায়। কারো কাছে কিন্তু ভাইঙ্গা কইও না, কোন চর দখল করতে যাইতে লাগব। এরফান মাতব্বরের দল খবর পাইলে কিন্তু হুঁশিয়ার অইয়া যাইব।'

'কবে নাগাদ যাইতে চান হুজুর ?' দবির গোরাপি জিজ্ঞেস করে।

'তা এত ত্বরাত্বরির কি দরকার ? আগে নালিশ অউক, খাজনার চেক-পত্র নেই, আর ওরাও ধান-পান লাগাইয়া ঠিকঠাক করুক। এমুন বন্দোবস্ত করতে আছি, দ্যাখবা মিয়ারা, তোমরা ঐ চরে গিয়া তৈয়ার ফসল ঘরে উডাইতে পারবা।'

লোকজন খুশি মনে যার যার বাড়ি চলে যায়।

BanglaBook.org

॥ পাঁচ ॥

আশ্বিন মাসের শেষ পক্ষ। চরটার কোনো কোনো অংশ ভাটার সময় জেগে ওঠে। জোয়ারের সময় সবটাই ডুবে যায় আবার। এ পানির মধ্যে বাঁশের খুঁটি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ঝুপড়ি। টুঙ্গির মতো অস্থায়ী ঐ ঝুপড়িগুলোরই নাম ভাওর ঘর। মাতব্বরের জন্য উঠেছে তিনখানা ভাওর ঘর। চরের চারপাশ ঘিরে ভাওর ঘরগুলো পাহারা দিচ্ছে, চোখ রাখছে চারদিকে।

জোয়ারের সময় ঝুপড়ির মধ্যে এক বিঘত, আধা বিঘত পানি হয়। পানির সমতলের হাতখানেক ওপরে বাঁশের মাচান বেঁধে নেয়া হয়েছে। যারা মাচান বাঁধতে পারেনি, তারা অন্য চর থেকে নৌকা বোঝাই করে নিয়ে এসেছে লটাঘাস। পানির মধ্যে সে ঘাসের স্তূপ সাজিয়ে উঁচু করে নিয়েছে। এরই ওপর হয়েছে শোয়া-থাকার ব্যবস্থা। শরীরের ভারে পিষ্ট হয়ে ঘাস যখন দেবে যায় তখন পানি উঁকি দেয়। তাই কয়েকদিন পর পরেই আরো ঘাস বিছিয়ে উঁচু করে নিতে হয়।

প্রথম কয়েকদিন এরফান মাতব্বরের বাড়ি থেকে সবার জন্য খিচুড়ি এসেছিল। এক গেরস্তের পক্ষে এত লোকের খাবার যোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই শরিকরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছে। যাদের বাড়ি ধারেকাছে, তাদের খাবার আসে বাড়ি থেকে। বাকি সবাই ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে ভাওর ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা করেছে। আলগা চুলোয় একবেলা রেঁধে তারা দুবেলা খায়। নিতান্ত সাদাসিধে খাওয়া। কোনো দিন জাউ আর পোড়া মরিচ, কোনো দিন ভাত আর জালে বা বড়শিতে ধরা মাছভাজা। আর বেশির ভাগ সময়েই ডালে-চালে খিচুড়ি।

চরের বাগ-বাটোয়ারা এখনো হয়নি। হবে পুরোটা চর জেগে উঠলে। কারণ তখনই জানা যাবে কোন দিকের জমি সরেস আর কোন দিকেরটা নিরেস। তবে এর মধ্যেই এরফান মাতব্বর চরটার মোটামুটি মাপ নিয়ে রেখেছে। পুব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য দুহাজার ষাট হাত। আর উত্তর-দক্ষিণে প্রস্ত আটশ চল্লিশ হাত। উত্তর-পুব কোণের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে একটা ঘোঁজা। সেখানে আঁঠাই পানি। মাতব্বর মনে মনে ঠিক করে রেখেছে—কিভাবে ভাগ করা হবে জমি। চরটাকে মাঝ বরাবর লম্বালম্বি দুভাগ করতে হবে। তারপর টুকরো করতে হবে আটহাতি নল দিয়ে মেপে। এভাবে উত্তর অংশে ঘোঁজা বাদ দিয়ে দুই শত পয়তাল্লিশ আর দক্ষিণ অংশে দুই শ সাতান্ন—মোট পাঁচ শ দুই নল জমি পাওয়া যাবে। এক নল প্রস্থ এক ফালি জমির দৈর্ঘ্য চরের মাঝখান থেকে নদীর পানি পর্যন্ত চার শ বিশ হাতের কাছাকাছি। মোট শরিকের সংখ্যা ছাপ্পান্ন। প্রত্যেককে আট নল করে দিয়ে বেঁচে যাবে চুয়ান্ন নল। নিজের জন্য তিরিশ নল রেখে বাকিটা ভাগ করে দিতে হবে পুলকি-মাতব্বরদের মধ্যে।

ভাগ-বাটোয়ারা না হলেও কোলশরিকরা যার যার ভাওর ঘরের লগ্তে সুবিধামতো বোরো ধানের রোয়া লাগাতে শুরু করেছে।

চর দখল হয়েছে। এবার খাজনা-পাতি দিয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার। দুবছরের খাজনা বাকি, নদী-শিকস্তি জমির খাজনা কম। কিন্তু জমিদার-কাছারির নায়েব ওসবের ধার ধারে না। সে পুরো খাজনাই আদায় করে। কখনো দয়া হলে মাপ করে দেয় কিছু টাকা। কিন্তু চেক কাটে সব সময় শিকস্তি জমির। বাড়তি টাকাটা যায় নায়েবের পকেটে। এজন্য মাতব্বর কিছু

BanglaBook.org

মনেও করে না। সে ভাবে—নায়েব খুশি থাকুক। সে খুশি থাকলে কোনো ঝড়-ঝাপটা আসতে পারবে না।

এখন জমি পয়স্তি হয়েছে। চেক কাটাতে হবে পয়স্তি জমির। তাই এক পয়সাও মাপ পাওয়া যাবে না। তাছাড়া নায়েবকে খুশি করার জন্য সেলামিও দিতে হবে মোটা টাকা।

এরফান মাতব্বর তার পুলকি-মাতব্বরদের ডেকে আলোচনায় বসে। বৈঠকে ঠিক হয়—এখন নলপিছু দশটাকা করে খাজনা বাবদ আদায় করা হবে কোলশরিকদের কাছ থেকে। পরে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেলে নলপ্রতি তিরিশ টাকা সেলামি দিতে হবে এরফান মাতব্বরকে। জমির আসল মালিক সে-ই।

প্রায় সকলের কাছ থেকে টাকা আদায় হয়। বারো জন টাকা দিতে পারে না। তারা এত গরিব যে একবেলা দুমুঠো ভাত জোটানো মুশকিল হয় তাদের।

মাতব্বর কয়েকদিন তাগাদা দিয়ে বিরক্ত হয়ে যায়। শেষে একদিন তাদের ডেকে সাফ কথা বলে দেয়, 'যদি জমি খাইতে চাও, টাকা যোগাড় করো। আরো দুইদিন সময় দিলাম। না দিলে আমি অন্য মানুষ বোলাইয়া জমি দিয়া দিমু। জমির লেইগ্যা কত মানুষ ফ্যা-ফ্যা কইর‍্যা আমার পিছে পিছে ঘোরতে আছে।'

নিরুপায় হয়ে আহাদালী, জমিরদ্দি ও আরো কয়েকজন ফজলকে গিয়ে ধরে।

জমিরুদ্দি বলে, 'কোনো রহমেই আমরা ট্যাহা যোগাড় করতে পারলাম না। কেউ কর্জও দিতে চায় না। আপনে যদি মাতব্বরের পো-রে কইয়্যা দ্যান।'

'উঁহু, আমার কথা শোনব না বা'জান। জানো তো, কত বচ্ছর ধইর‍্যা খাজনা চালাইতে আছি আমরা?'

আহাদালী বলে, 'তিনডা মাসের সময় চাই, খালি তিনডা মাস।'

'তিন মাস পরেই বা দিবা কইতন?'

'তা যোগাড় কইর‍্যা দিমু, যেইভাবে পারি। ধান লাগাইছি, দেহি—'

'ধানতো প্যাটেই দিতে অইব। ওতে কি আর টাকা আইব?'

'আইব। প্যাডেরে না দিয়া বেইচ্যা ট্যাহা যোগাড় করমু।'

ফজলের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের হাসি! সে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। কি যেন চিন্তা করে।

টাকাপয়সার টানাটানি চলছে এরফান মাতব্বরের সংসারেও। এ চরে আসার পরই ফজল পয়সা আমদানির একটা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছে। এতদিন কথাটা সে কাউকে বলেনি আজ এদের দুর্দশা দেখে সে আর থাকতে পারে না। বলে, 'একটা কাজ যদি করতে পারো তবে টাকার যোগাড় অয়। পারবা করতে?'

'পারমু না ক্যান্, পারমু। কি কাম?' জমিরুদ্দি বলে।

'জোয়ারের সময় চরের উপরে মাছ কেমন ডাফলা-ডাফলি করে, দ্যাখছ?'

'হ দেখছি।' একজন কোলশরিক বলে।

'যদি বানা বানাইতে পার তবে এই মাছ বেড় দিয়া ধরা যায়।'

'বেড়ওয়ালা মালোগ মতন?' আহাদালী জিজ্ঞেস করে।

'হ।'

'মাছ ধইর‍্যা হেষে—?'

'শেষে আবার কি?'

BanglaBook.org

ফজল এমন করে হাসে যার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না কারো।

জমিরদ্দি বলে, 'ও, আপনে মাছ বেচনের কথা কইতে আছেন!'

'তাতে দোষ কি ?'

'দোষ না! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোবা তোবা তোবা! মাইনষে হোনলে কইব কি ?'

'কি কইব ?'

'জাউল্যা কইব। ছাই দিব মোখে।'

কোলশরিকদের একজন বলে, 'মাছ বেচলে পোলা-মাইয়ার বিয়া দেওয়ন কষ্ট আছে।'

'আরে ধ্যাত! হালাল রুজি খাইবা, চুরি-ডাকাতি তো করবা না।'

'কিন্তু জাইত গেলে যে আর জাইত পাওয়া যাইব না।'

'প্যাটে ভাত জোটে না, তার আবার জাত। যাও জাত ধুইয়া পানি খাও গিয়া। আমার কাছে আইছ ক্যান্ ? আমি তোমাগ জন্যই কইলাম। নইলে আমার ঠ্যাকাডা পড়ছে কি ?' ফজল রেগে ওঠে।

আহাদালী বলে, 'রাগ করেন ক্যান ? মাইনষে তো আর দ্যাখব না প্যাডে ভাত আছে, না নাই। তাগ টিটকারির চোডে—'

'যে টিটকারি দিব তার গলায় গামছা লাগাইয়া কইও, চাউল দে খাইয়া বাঁচি। টাকা দে জমিদারের খাজনা দেই।'

একটু থেমে আবার বলে ফজল, 'কামলা খাইলে যদি জাত না যায়, ধান-পাট বেচলে যদি জাত না যায়, তবে মাছ বেচলে জাত যাইব ক্যান্, অ্যাঁ ?'

জমিরদ্দি বলে, 'আপনেত কইতে আছেন। আপনে পারবেন মাছ বেচতে ?'

ফজল মনে মনে হাসে। মুখে বলে, 'হ পারুম। তোমরা মনে করছ, তোমাগ কুয়ার মধ্যে নামাইয়া দিয়া, আমি উপরে বইস্যা আতে তালি দিমু। উঁহু, আমিও আছি তোমাগ লগে।'

জমিরদ্দি 'আপনেও আছেন!'

আহাদালী 'অ্যাঁ, আপনেও থাকবেন আমাগ লগে!'

ফজল : 'হ-হ-হ, আমিও থাকমু।'

আহাদালী 'মাতবরের পো জানে এই কথা ?'

ফজল : 'এখনো জানে না। তারে জানান লাগব।'

আহাদালী 'উনি কি রাজি অইব ?'

ফজল : 'তারে রাজি করানের ভার আমার উপর।'

জমিরদ্দি 'উনি যদি রাজি অয়, আর আপনে যদি আমাগ লগে থাকেন, তয় আর ডরাই কারে! কি কও তোমরা ?'

সকলে 'হ, তাইলে আর ডর কি ?'

ফজল 'আমি এখনি বাড়ি যাইতেছি। জমিরদ্দি আর আহাদালী চলো আমার সাথে।

এরফান মাতব্বর বিষম ভাবনায় পড়ে যায়। আর সবার মতো তারও সেই একই ভয়। ফজল মাছ বিক্রি করে লুকিয়ে-চুরিয়ে। কাজটা একা করে বলে কেউ জানবার সুযোগ পায় না। কিন্তু যেখানে দশজন নিয়ে কারবার, সেখানে ব্যাপারটা গোপন রাখা কোনো রকমেই সম্ভব নয়।

মাতব্বর বলে, 'নারে, পরের দিনই মুল্লুকের মানুষ জাইন্যা ফালাইব।'

BanglaBook.org

'জানুক, তাতে কী আসে যায়।' ফজল বলে।

'কী আসে যায়! তখন মাইনষেরে মোখ দেখান যাইব ?' মাতব্বরের কণ্ঠে রাগ ও বিরক্তি।

'একজন তো না যে মুখ দ্যাখাইতে শরম লাগব। বইতে পড়ছি—দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। যখন এতজনে একসাথে কাজটা করতে চাই তখন আর লজ্জা-শরম কিসের ? এত মাইনষের বদনাম করতে মুখ বেদনা অইয়া যাইব না মাইনষের!'

অনেক ভেবে-চিন্তে মাতব্বর শেষে নিমরাজি হয়। ফজল আশ্বাস দেয়—রোজ ভোর রাত্রে মাছ নিয়ে তারা চলে যাবে তারপাশা। সেখানে কেউ তাদের চিনবে না। কেউ জানতে পারবে না মাছ বেচার কথা।

দশজন যোগ দিয়েছে ফজলের সাথে। দুজন কেটে পড়েছে। তারা বলে দিয়েছে—না খেয়ে শুকিয়ে মরবে তবু তারা ইজ্জতনাশা কাজ করতে পারবে না।

নৌকা নিয়ে পরের দিনই ফজল হাটে যায়। সাথে যায় দলের কয়েকজন। তারা মাকলা আর তল্লা বাঁশ কেনে গোটা চল্লিশেক। আর কেনে সাত সের নারকেলের কাতা।

কাতা আর বাঁশগুলো ভাগ করে নেয় সবাই। প্রত্যেককে চারহাত খাড়াই আর পাঁচহাত লম্বাই ছ'খানা করে বানা তৈরি করতে হবে।

মাত্র দু'দিন সময় দিয়েছিল ফজল। কিন্তু কাজ অনেক। বাঁশগুলোকে খণ্ড করা, খণ্ডগুলোকে ফেড়ে চটা বের করা, চটাগুলো চেঁচেছুলে এক মাথা চোকা করা, শেষে একটার পর একটা কাতা দিয়ে বোনা। এত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার তৈরি হয় বানা আর তার জন্য লেগে যায় পুরো চারটে দিন।

বানা তৈরি করতেই যা ঝঞ্ঝাট। ও দিয়ে মাছ ধরা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। ভরা জোয়ারের পর ভাটার টান লাগার কিছুক্ষণ আগে বানা পুঁতে বেড় দিতে হয়। ধনুকের আকারে সে বানা ঘিরে থাকে অনেক জায়গা। ভাটার সময় পানি নেমে যায় আর মাছ আটকা পড়ে বেড়ের ভেতর। আড়, বোয়াল, বেলে, বাচা, ট্যাংরা, টাটকিনি, পাবদা, চিংড়ি ইত্যাদি ছোট-বড় নানা রকমের মাছ। রাত্রের বেড়ে দু-চারটে রুই-কাতলা-মৃগেল-বাউসও পাওয়া যায়। পানির মাছ ডাঙায় পড়ে লাফালাফি ছট্‌কাছট্‌কি করে।

ফজল আর তার সঙ্গীরা হৈ-হুল্লোড় করে হাত দিয়ে ধরে সে মাছ। অনেক সময় পানি নেমে যাওয়ার অপেক্ষাও করে না তারা। অল্প পানির মধ্যে গোত্‌লাগুত্‌লি করে, আছাড়-পাছাড় খেয়ে মাছ ধরায় আনন্দ বেশি, উত্তেজনা, বেশি। এজন্য অবশ্য মাঝে মাঝে বাতাশি, বজুরি আর ট্যাংরা মাছের কাঁটার জ্বলুনি সইতে হয়, চিংড়ি আর কাঁকড়ার চেঙ্গি খেয়ে ঝরাতে হয় দু-চার ফোঁটা রক্ত।

একবার দিনের বেলা প্রকাণ্ড এক রুই মাছ আটকা পড়েছিল বেড়ে। এত বড় মাছ দিনের বেলা তো দূরের কথা, রাত্রেও কদাচিৎ আসে অগভীর পানিতে। বোধহয় শুশুকের তাড়া খেয়ে কিনারায় এসেছিল মাছটা। ভাটার সময় বেড়ে বাধা পেয়েই ওপর দিয়ে লাফ মেরেছিল। লাফটা কায়দা মতো দিতে পারলে বানা ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। আরেকবার লাফ দেয়ার আগেই ফজল সবাইকে নিয়ে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর সে যে কি পাছড়া-পাছড়ি! পানির জীবকে পানির ভেতর কাবু করা কি এতই সোজা! ধস্তা-ধস্তির সময় মাছের গুঁতো খেয়ে কয়েকজনের শরীরে জায়গায় জায়গায় কালশিরা পড়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

পঁচিশ সের ওজন ছিল মাছটার। বেচার সময় মাপা হয়েছিল। দাম পাওয়া গিয়েছিল আট টাকা।

রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টায় জোয়ার-ভাটা খেলে দু'বার। এ দু'বারই শুধু বানা পুঁতে বেড় দিয়ে মাছ ধরা যায়। দিনের জোয়ারে খুব বেশি সুবিধে হয় না। সুবিধে হয় রাত্রের জোয়ারে।

দিনে বেড় দিয়ে যে মাছ পাওয়া যায় তার কিছুটা খাবার জন্য ফজল ও তার সাথীরা ভাগ করে নেয়। মাঝে মাঝে চরের আর শরিকদেরও দেয়া হয় কিছু কিছু। বাকিটা বড় বড় চাঁই-এর মধ্যে ভরে পানির ভেতর জিইয়ে রাখে। রাত্রে ধরা মাছের সাথে সেগুলো নিয়ে তারা ভোর রাত্রে চলে যায় তারপাশা।

চিংড়ি আর বড় মাছ কেনে মাছের চালানদাররা। তারা কাঠের বাক্সে ভরে বরফ দিয়ে সে মাছ চালান দেয় কলকাতায়। এদের কাছ থেকে ভালো দাম পাওয়া যায়। ছোট মাছগুলো সস্তায় বেচে দিতে হয় নিকারি-কৈবর্তের কাছে।

মাছ বিক্রি করে তারা ভোর আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরে আসে। জমিরদ্দিন সরু ডিঙি সাত বৈঠার টানে ছুটে চলে বাইচের নৌকার মতো। উজান ঠেলে মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তারা পৌঁছে যায় তারপাশা। সেখান থেকে ভাটি পানিতে ফিরে আসতে আধঘণ্টাও লাগে না। রোজ পনেরো-বিশ টাকা আসে মাছ বেচে। এভাবে আরো পনেরোটা দিন চালাতে পারলে যোগাড় হয়ে যাবে দশ জনের খাজনার টাকা।

টাকার গন্ধে অনেকেরই লোভ জাগে, ভিড়তে চায় দলে। কিন্তু ফজল তাদের পাত্তা দেয় না। যে দুজন মান-ইজ্জত নিয়ে সরে-পড়েছিল, তারা এসে যোগ দিতে চায়।

ফজল রেগে ওঠে। তাদের মুখের ওপর বলে দেয়, 'ওঃ, এখন জুইতের নাও বাইতে আইছ তোমরা। উহুঁ, তোমরা তোমাগ জাত-মান লইয়া থাক গিয়া। আমাগ দলে জায়গা নাই।'

কিন্তু ফজলের রাগ মাটি হয়ে যায় দুদিনেই। সে তাদের ডেকে বলে, 'যদি আসতে চাও তবে আর সবাইর মতন বানা তৈরি করো।'

॥ ছয় ॥

দিঘিরপাড় কাছারির নায়েব সীতানাথ ভৌমিককে দেখে ভদ্র বলেই মনে হয়েছিল ফজলের। কিন্তু তার কথা-বার্তার ধরন দেখে সে বুঝতে পারে, লোকটা ভদ্র শুধু কাপড়-চোপড়ে। সে তার পিতার সাথে 'তুমি-তুমি' করে কথা বলছে, যদিও বয়সে সে তার চেয়ে কম করে হলেও পনেরো বছরের ছোট।

ফজলের রাগ ধরে যায়। রাগটাকে কোনো রকমে বাগ মানিয়ে সে ধীরভাবে বলে 'নায়েব মশাই, আপনাদের বয়স ষাট পার হইয়া গেছে না?'

নায়েবের ভ্রু কুঞ্চিত হয়। প্রশ্নকারীকে দেখে নিয়ে সে এরফান মাতব্বরকে বলে, 'ছেলেটা তোমার না মাতবর?'

'হ বাবু।'

'বলিহারি ছোঁড়ার আন্দাজ।' ফজলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তারপর বলে, 'আমার বয়স দিয়ে তোর দরকার কিরে অ্যাঁ।'

'না, এমনিই জিজ্ঞাস করলাম। বা'জানের বয়স পঞ্চান্ন। তার সাথে যখন 'তুমি তুমি' কইর‍্যা কথা কইতে আছেন, তখন আন্দাজ করলাম আপনের বয়স ষাট পার হইয়া গেছে।'

এরফান মাতব্বর ধমকে ওঠে, 'অ্যাই ফজু, শতয়তা-ন, চো-প।'

BanglaBook.org

ধমক তো নয়, যেন একটা বাঘ গর্জে উঠেছে। নায়েবের কলজে পর্যন্ত কেঁপে ওঠে সে ধমক শুনে। মাতব্বরের গম্ভীর মুখ আর ক্রোধরক্তিম চোখের দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করে সে।

মুখ-চোখের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনে মাতব্বর অনুনয়ের সুরে বলে, 'নায়েব বাবু, রাগ কইরেন না। পোলাডার বুদ্ধি-বিবেচনা এহনো পাকে নাই। কার লগে ক্যামনে কথা কইতে অয়, এহনো হিগে নাই। আপনে ওরে মাপ কইর‍্যা দ্যান। অ্যাই ফজু ? বাবুর কাছে মাপ চা।' মাতব্বর পেছন দিকে মুখ ঘোরায়।

ফজল নেই।

মাতব্বর উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখে ফজল অনেক দূর চলে গেছে, হেঁটে যাচ্ছে হনহন করে।

ফিরে এসে সে বলে, 'বাড়িতে গিয়া লই। ওরে আচ্ছা মতন মালামত করমু। আপনে রাগ অইয়েন না।'

'ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখান হয়েছে বোধহয় ?' নায়েব বলে। আগের মতো 'তুমি' উচ্চারণ করতে আর উৎসাহ পায়না তার মুখ।

'হ, এই কেলাস নাইন পর্যন্ত পড়ছে। সংসারের কাজ-কামের লেইগ্যা আর পড়াইতে পারলাম না।'

'যতটুকু পড়েছে তার জন্য অনেক ভোগান্তি আছে। শেখের ছেলে একটু লেখাপড়া শিখলেই জাত-গোত্রের কথা ভুলে যায়। মনে করে নওয়াব সিরাজদ্দৌলা হয়ে গেছে। ছেলেটা কাজ-কর্ম কিছু করে, না খালি আলফেট কেটে ঘুরে বেড়ায় ?'

'না কাম-কাজ করে। আমি তো বুড়া অইয়া গেছি সংসারের বেবাক কাম এহন ও-ই করে।'

'করলেই ভালো। দেখি, পুরান চেক-দাখিলা কি আছে।'

এরফান মাতব্বরের হাত থেকে খাজনার পুরানো চেক নিয়ে সে কাছারির খাতাপত্র দেখে। দু'বছরের খাজনা বাকি।

নায়েব বলে, 'জমিতো ভগবানের ইচ্ছায়, মা গঙ্গার কৃপায় পয়স্তি হয়েছে। সেলামি দিতে হবে এবার।'

'তা দিমু।'

'দিমু তো বুঝলাম, কিন্তু কবে ?'

'আইজই দিমু। আপনে খাজনার চেক কাডেন। একসাথে দিতে আছি।'

'উঁহু আগে সেলামির টাকা, তারপর খাজনা।'

এরফান মাতব্বর এক হাজার টাকা নায়েবের হাতে তুলে দেয়।

'কত ?'

'পুরা হাজার টাকাই দিলাম।'

'উঁহু। আরো এক হাজার লাগবে।'

এরফান মাতব্বর হাতজোড় করে বলে, 'আর দাবি কইর‍্যেন না, বাবু। চরডা লায়েক অউক। তখন আপনেরে খুশি করমু।'

'কিন্তু খুশি করার সময়ই তো এখন। কই, আর কি আছে দেখি ?'

'আর দুই সনের খাজনার টাকা আনছি।'

'কই দেখি।'

BanglaBook.org

নায়েব হাত পেতে আরো চারশ' টাকা নিয়ে মাতব্বরের কাছ থেকে। বাংলা ১৩৪৭ সালের চেক কেটে মাতব্বরের হাতে দেয়।

'এক সনের চেক দিলেন নি বাবু ?'

'হ্যাঁ, গত সনের চেক দিলাম। এই সনের খাজনা পরে দিলেই চলবে।'

মাতব্বর কাছারি থেকে বেরোয়। তার মনে আফসোস—এক থোকে অনেকগুলো টাকা নেমে গেল। জমিদারের সেলামি দিতেই গেল বারো শ টাকা। মাতব্বর জানে—জমিদারের না, নায়েবের কাম। সেলামির টাকা সবটাই উঠবে নায়েবের সিন্দুকে। সে মনে মনে বলে, 'যত কাড়ি সুতা, সব নেয় বামনের পৈতা।'

মাতব্বর নৌকাঘাটে আসে। নৌকায় কেউ নেই। হাঁক দেয়, 'কই গেলিরে তোরা ?'

মেরামতের জন্য ডাঙার ওপর কাত করে রাখা দুশা নৌকার আবডালে ছায়ায় বসে ষোলঘুটি খেলছিল *'বাইছা'* দু'জন। ডাক শুনে তারা গামছা ঝাড়তে ঝাড়তে ছুটে আসে। দু'জনই কোলশরিক। নৌকা বাইতে তাদের নিয়ে এসেছে মাতব্বর।

'ফজল কইরে ? সে নায় আহে নাই ?'

'আইছিল। সে আমাগ লগে যাইব না। পরে যাইব।'

'পরে যাইব! ক্যান্ ?'

'হে কইছে, আইজ দিঘিরপাড় খেলা আছে। তারিখের খেলা। হেই খেলা দেইখ্যা যাইব।'

'কিয়ের খেলা ?'

'কপাটি খেলা।'

'তারিখ দিছে কারা ?'

'তারিখ দিছে। মাঝেরচরের আক্কেল হালদার আসুলিগ লগে। গেল হাটবার চর আর আসুলিগ মইদ্যে জিদাজিদি অইছে।'

'তারিখ তো দিছে। পারব আসুলিগ লগে ?'

'পারব না ক্যান্। আক্কেল হালদার দক্ষিণপাড় গেছে। পালং আর ভোজেশ্বর তন বড় বড় খেলোয়াড় লইয়া আইব।'

'তোরা আল্লার নাম লইয়া নাও ছাড়। ফজু থাউক পইড়্যা। খেলা দ্যাখলেই প্যাড ভরব। জোরে বৈডা চালা। বাড়িতে গিয়া যেন্ আছরের নামাজ পড়তে পারি।'

উজান পানি। স্রোত ভেঙে ছলচ্ছল আওয়াজ তুলে নৌকা চলছে দুলতে দুলতে।

নৌকায় ছই নেই। মাতব্বর ছাতা মাথায় দিয়ে বসে। তার মনে নানা ভাবনা-চিন্তার জটলা লেগেই থাকে সব সময়। আজ আবার সেখানে যোগ দিয়েছে আর এক ভাবনা।

ভাবনা হয়েছে ফজলের আজকের ব্যবহারে। নায়েব না হয় বেতমিজের মতো 'তুমি-তুমি' করে কথা বলছিল। সে জন্য ওভাবে ঠেস দিয়ে কথা বলার কী দরকার ছিল ওর ? সে হলো নায়েব। জমির মালিক যে জমিদার, তার নায়েব। এদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তোয়াজ-তাজিমের সাথে। কটু কথা বললেও গায়ে মাখতে হয় না তা। এদের সাথে আড়ি দিয়ে, মেজাজ দেখিয়ে কি চরে বসত করা যায় ? একটু নারাজ হলেই এরা এদের মেহেরবানির ঝাঁপি তুলে দেবে অন্যের হাতে। দিনকে বানিয়ে ফেলবে রাত। তার বয়স-উমরেই সে কত দেখেছে—আসল হকদারকে ভোজবাজি দেখিয়ে কেমন করে এরা নতুন

BanglaBook.org

চরের আলমদারি দেয় অন্য লোককে। তারপর আর কি! চরের দখল নিয়ে বেঁধে যায় মারামারি খুনাখুনি। মামলা-মোকদ্দমার অতল গহ্বরে নেমে যায় বেশুমার টাকা। এভাবে সে নিজেও বড় কম ভোগেনি।

মাতব্বর বুঝতে পারে, এরকম মেজাজ নিয়ে ফজল কোনো দিনই চরে বসত করতে পারবে না। তাই তাকে নসিহত করার কথা চিন্তা করে সে। কিন্তু ছেলেকে নসিহত করার মতো মনের জোর নেই তার।

অভাবের সময়ে সে পুতের বউর গয়না বন্ধক দিয়েছে। সে ছুতোয় ছেলের শ্বশুর আরশেদ মোল্লা তার মেয়ে আটকে রেখেছে। বউ আনবার জন্য দুবার লোক পাঠিয়েছিল মাতব্বর। মোল্লা বলে পাঠিয়েছে, 'মাইয়ার শরীলের গয়না পুরা না লইয়া যেন আর মাইয়া নেওনের কথা মোখ দিয়া কয় না।'

তারপর সাত মাস পার হয়ে গেছে, ছেলে আর বউর দেখাসাক্ষাৎ একদম বন্ধ। যদিও এর জন্য বেয়াইকেই দায়ী করে, তবুও নিজের দোষটাও মাতব্বর অস্বীকার করে না। তার মনেও ঢুকেছে কেমন একটা সঙ্কোচ যার ফলে সে ছেলেকে আগের মতো কড়া কথায় ভর্ৎসনা করতে পারে না আজকাল।

মনের পর্দায় আরশেদ মোল্লার ছায়া পড়তেই তার রাগ ফণা বিস্তার করে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে মনে মনে বলে, 'সোনাদানা আমি দিছিলাম। আমিই বন্দক দিছি। আল্লায় দিন দিলে আবার আমিই ছাড়াইয়া আনমু। তুই ত আধা পয়সার গয়নাও দেস নাই। তুই ক্যান্ মাইয়া আটকাবি ? মাইয়া আকটাইয়া করবি কি তুই ?'

তার মনের অনুচ্চারিত প্রশ্ন থামে। যেন উত্তর চায় প্রতিপক্ষের। তারপর আবার তার ক্ষুব্ধ মন চেঁচিয়ে ওঠে, 'মাইয়া আটকাইয়া ঘরে খাম্বা দিবি ? দে খাম্বা। দেহি কদ্দিন ঘরে রাখতে পারস মাইয়াডা। আমি আবার আমার পোলারে বিয়া করাইমু।'

বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়ে। মাতব্বরের মনের ঝগড়াও থামে তখনকার মতো।

রাত্রে খেতে বসে সে স্ত্রী-কে বলে, 'হোন ফজুর মা, আরশেদ মোল্লারে এমুন একটা ঠাসা দিমু—'

'ক্যান্ ?'

'ক্যান্ আবার! মাইয়া আটকানের মজাডা দেহাইয়া দিমু। ওর মাইয়া আননেরও দরকার নাই, ছাড়নেরও দরকার নাই। ওর মাইয়া ওর বাড়িতেই পচুক, বুড়ি অউক। ফজুরে আবার আমি বিয়া করাইমু।'

'যা করে যেন্ চিন্তা-ভাবনা কইর‍্যা করে।'

'এর মইধ্যে চিন্তা-ভাবনার কি আছে ?'

'চিন্তা-ভাবনার কিছু নাই ? অইবার সারদা আইনের বচ্ছর 'ওঠ্ ছ্যামড়া তোর বিয়া' কইয়া ফজুরে বিয়া করাইল। কয়ডা বচ্ছর পরেই আবার ভাইঙ্গা দিল বিয়া। এতে আল্লা বেজার অয় না ?'

অতীতের ভুলের কথা তুলতেই চুপ হয়ে যায় মাতব্বর।

অনেকক্ষণ পর সে বলে, 'আমার দোষ দিলে কি অইব। আসলে তোমার পোলাডারই বউর ভাগ্য নাই।'

BanglaBook.org

॥ সাত ॥

হা-ডু-ডু খেলার প্রতিযোগিতা। খেলার ভেতর দিয়ে চর আসুলির শক্তি পরীক্ষা হবে আজ।

সামান্য কথার খোঁচা থেকে এ আড়াআড়ির সৃষ্টি হয়েছে। দিঘিরপাড়ের গুড়ের আড়তদার হাতেম শিকদার তার পাশের ধানের আড়তদার আক্কেল হালদারকে সেদিন কথায় কথায় বলেছিল, 'আরে দ্যাখা আছে। তোমাগ চরে আবার খেলোয়াড় আছেনি! আছে সব—'

'কি কইলা! খেলোয়াড় নাই!'

'নাই-ইতো। তোমরা পার ঢাল-কাতরা লইয়া খুনাখুনি করতে।'

'আমরা খুনাখুনি করতেও পারি, খেলতেও পারি।'

'পার আমার ইয়ে। আমাগ মাকুহাটির ফরমানের খেলা দ্যাখছ ? ও একবার 'কপাইট' কইয়া 'ডু' দিলে তোমাগ খেলোয়াড়রা ছ্যাব্‌ড়া খাইয়া ভাইগ্যা যাইব।'

'আর ছাড়ান দ্যাও। ওই রহম খেলোয়াড় গণ্ডা গণ্ডা আছে আমাগ চরে।'

'আছে! তবে খেইল্যা দ্যাহাও না একদিন।'

'হ দ্যাহাইমু।'

'কবে ? তারিখ দ্যাও।'

'তুমি দ্যাও তারিখ।'

'পরশু মঙ্গলবার।'

'না, তার পরের দিন বুধবার।'

আজ সেই খেলার তারিখ বুধবার।

খেলার মাঠ লোকে লোকারণ্য। জেদাজেদির খেলা। দর্শকের ভিড় তো হবেই। দুই অঞ্চলের উগ্র সমর্থকদের মনে উত্তেজনার বারুদ। শান্তিরক্ষার জন্য সশস্ত্র পুলিস এসে হাজির হয়েছে।

বড় ময়দানের মাঝখানে দাগকাটা খেলার কোট। ষোল হাত দীর্ঘ আর দশ হাত প্রস্থ কোটটিকে মাঝখানে দাগ কেটে সমান দু'ভাগ করা হয়েছে দুই দলের জন্য। কোটের চারপাশে বাঁশের খোঁটা পুঁতে তার সাথে মোটা রশির ঘের বাঁধা হয়েছে। সে ঘেরের বাইরে সারি সারি লোক বসে গেছে। তাদের পেছনে গায়ে গায়ে মেশামিশি হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশির ভাগ দর্শক।

বিকেল চারটায় খেলা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু চরের দল এখনো আসেনি। আসুলির খেলোয়াড়রা অনেক আগেই এসে গেছে। বিক্রমপুরের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় সব। বজ্রযোগিনীর বাদল, মাকুআটির ওসমান আর ফরমান দুই ভাই, কামারখাড়ার ভজহরি, কলমার আক্‌লাস, সোনারং-এর কালীপদ আর পাঁচগাঁর শাসমু এসেছে। হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরে তারা কোটের এক অংশে তৈরি হয়ে বসে আছে।

দর্শকরা অধৈর্য হয়ে ওঠে। অধৈর্য হয়ে ওঠেন স্বয়ং রেফারিও। তার মুখের বাঁশির আওয়াজে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিছুক্ষণ পরে পরেই তিনি তাঁর হাতঘড়ি দেখছেন আর জোড়া ফুঁ দিচ্ছেন বাঁশিতে।

অতি উৎসাহী ছেলে-ছোকরার দল নৌকাঘাটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চরের দিক থেকে লোক বোঝাই কোনো নৌকা দেখলেই তারা হৈ-হৈ করে ওঠে, 'ঐ যে—ঐ ঐ আইতে আছে!' তারপর ছড়া আবৃত্তি করতে থাকে সমস্বরে—

'হেঁই কপাটি তুলা ধোন,
মশা করে ভোন্ ভোন্।
মাছির কপালে ফোঁটা,
মইষ মারি গোটা গোটা।'

BanglaBook.org

কোলাহল শুনে দর্শকরা একটু আশান্বিত হয়। কিন্তু নৌকা কাছে এলে দেখা যায়— খেলোয়াড়দের কেউ আসেনি। এসেছে তাদের নৈরাশ্যের কয়েকজন ভাগীদার শুধু।

আসুলির লোকেরা ভুড্ড দিতে শুরু করে। তারা বলে, 'চরুয়ারা আইব না। ওরা ডরাইয়া গেছে।'

চরাঞ্চল থেকেও বহু লোক খেলা দেখতে এসেছে। আসুলির লোকদের ঠেস-টিটকারি শুনে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়। কচ্ছপের মতো সুবিধে থাকলে হয়তো তারা তাদের মাথা লুকিয়ে ফেলত লজ্জায়।

এক পক্ষ যখন আসেনি তখন অন্য পক্ষ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করবে। সেই জয় ঘোষণা করতে হবে রেফারিকে। তিনি বাঁশি বাজান, হাত নেড়ে প্রতিপক্ষের খালি কোর্টে 'ডু' দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন আসুলির দলকে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে খালি মাঠে নামে একজন লোক। লোকটিকে সবাই চেনে। সাতকচরের সোলেমান। সে এক কালের নামকরা খেলোয়াড়। এখন বয়স হয়েছে। মাথার কাঁচা-পাকা চুল দেখেই বোঝা যায়, বয়স তার চল্লিশ পার হয়ে গেছে। সাত-আট বছরের মধ্যে তাকে কোথাও খেলায় নামতে দেখা যায়নি।

রেফারির দিকে এগিয়ে সোলেমান বলে, 'নগেন বাবু, চরের খেলোয়াড়রা আহে নাই। কিন্তুক আমরা আছি চরের মানুষ। আমরা খেলুম বিনা খেলায় আসুলিগ জিত্যা যাইতে দিমু না।

রেফারি বলেন, 'কিন্তু তোমাদের আক্কেল হালদার কোথায়? খেলার তারিখ দিয়ে এমন—'

'হুনছি, সে খেলোয়াড় আনতে গেছে দক্ষিণপাড়। মানুষটা এহনো আইল না ক্যান্ কে জানে?'

দর্শকদের ভেতর থেকে একজন বলে, 'আইব কি, ডরের চোডে পথ ভুইল্যা গেছে।'

রেফারি সোলেমানকে বলেন, 'তবে নেমে পড়। কোথায় তোমার খেলোয়াড়রা?'

'এই আনতে আছি। দশটা মিনিট সময় দ্যান।'

সোলেমান চারদিকের দর্শকদের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে হাঁক দেয়, 'কে আছস রে তোরা? চরের ইজ্জত না যাইতে শিগ্‌গির আয়।'

ভিড়ের মাঝ থেকে ফজল ও আরো তিনজন এসে যোগ দেয় সোলেমানের সাথে।

খেলা হবে না ভেবে দর্শকরা মনমরা হয়ে গিয়েছিল। এবার তারা আনন্দে কোলাহল করে ওঠে, হাততালি দিয়ে স্বাগত জানায়, উৎসাহ দেয় চরের খেলোয়াড়দের।

এখনো দু'জন খেলোয়াড়ের অভাব। সোলেমান ও ফজল দর্শকদের মধ্যে পরিচিত লোক খুঁজে বেড়ায়।

ফজলের সাথে চোখাচোখি হয়ে যায় একটি ছেলের। রূপজানের মুখের আভাস আনন্দ জাগায় তার মনে।

দশ বছরের ছেলেটি তার শ্যালক। সে রশির বেড়া ঘেঁষে বসে আছে। দুলাভাই মাঠে নামার পর থেকেই সে তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বারবার হাত নাড়ছিল।

হাসি বিনিময় করে ফজল তার কাছে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'এই দেলু কার সাথে আসছ?'

'কাদিরভাইর সাথে। আরো কত মানুষ আইছে!'

ফজল গায়ের জামা খুলে দেলোয়ারের হাতে দিয়ে তার কানে কানে বলে, 'এইডার মধ্যে টাকা আছে সাবধানে রাইখ্য।'

'আচ্ছা। জানেন দুলাভাই, কাদিরভাই কিন্তু খুব ভালো খেলে।'

BanglaBook.org

'তাই নাকি ?'

'হ, খুব লেংড়ি দিতে পারে।'

'তাই নাকি! কই সে ?'

দেলোয়ার পেছন দিকে তাকায়। কাদিরকে খুঁজে পেয়ে সে বলে, ওই যে দুলাভাই।'

ফজলের চোখে চোখ পড়তেই তার চাচাতো শ্যালক কাদির হেসে ওঠে।

ফজল তাকে ডাকে, 'তাড়াতাড়ি নামো। সময় নাই।'

কাদির হাত নেড়ে খেলতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু দর্শকরা তাকে ঠেলে মাঠে নামিয়ে দেয়। অন্য দিক থেকে সোলেমানও একজনকে জোর করে মাঠে নামায়।

খেলার পোশাক নেই কারো। এভাবে খেলায় নামতে হবে কে জানত ? খুঁজে-পেতে একটা প্যান্টও যোগাড় করতে পারে না কেউ। কি আর করা! খেলোয়াড়রা সবাই লুঙ্গিতে কাছা মেরে নেয়।

সোলেমান তার খেলোয়াড়দের কোটের এক কোণে জড় করে নিচু গলায় পরামর্শ দেয়, 'দ্যাখো, তোমরা ওগ বড় বড় খেলোয়াড় দেইখ্যা ঘাবড়াইয়া যাইও না। খালি ঠ্যাকা দিয়া যাইবা। কোনো উপায়ে 'ড্র' রাখতে পারলেই আইজ ইজ্জত বাঁচে। তোমরা ধীরে-সুস্থিরে খেলবা। ওরা চেতলেও চেতবা না। আবার সুযোগ পাইলেও ছাড়বা না। ঐ যে বাদল ফরমান। দাঁতাল শুয়রের মতন শক্তি ওগ গায়। ওরা কিন্তু গোতলাইয়া লইবা। কায়দা মতন না পাইলে ওগ ধরবা না। আর ঐ যে কালীপদ—ব্যাডা কুলুপের ওস্তাদ। ডু দেওয়ার সময় হুঁশিয়ার। ভজার পায়ে কিন্তু সাংঘাতিক জোর। ও পাও আউগ্‌গাইয়া দিব, লেংড়িও দিব। কিন্তু কেও ধরবা না। ধরলেই কিন্তু ঘোড়ার মতন ছিটা লাথি মাইর‍্যা যাইব গা। শামসু ঢুশ দিয়া ধরে। আর ঐ যে আক্‌লাস—ওরে বেড় দিলেই লাফ্‌ফা মাইর‍্যা চইল্যা যাইব।'

রেফারি বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে তৈরি হওয়ার জন্য তাড়া দেন।

সোলেমান রেফারিকে দুটো আঙুল দেখায়। আরো দুমিনিট সময়ের প্রার্থনা।

সে আবার শুরু করে, 'তোমাগ মইদ্যে কুলুপ জানে কে ?'

'আমি জানি।' ফজল বলে।

'ঠিক আছে, তুমি ডান কিনারে থাকবা। আর আমি থাকমু বাঁ কিনারে।'

'আচ্ছা, তবে আমার পাশে থাকব লখাই। ও কুলুপ দেওনের ভান করব, তা অইলে যে ডু দিতে আইব, তার নজর থাকব লখাইর উপরে। তখন পাশের তন কুলুপ দিমু আমি ?'

'হ দিও। কিন্তু যখন তখন কুলুপ দিও না। তুমিতো ডু দিতেও পারবা ?'

'হ পারমু।'

'আর কার কি গুণ আছে কও দেহি শিগ্‌গির।'

নিজের মুখে নিজের গুণ জাহির করতে লজ্জা পায় সবাই।

ফজল বলে, 'এই যে কাদির, ও পারে লেংড়ি দিতে।'

'বেশ বেশ! সাবধানে ডু দিবা। কালীপদর দিগে কিন্তু ঠ্যাং বাড়াইও না।'

'আর ঐ যে কোরবান। ও পারে হাতে কুলুপ দিতে।'

'উঁহু। ওরা যেমুন জুয়ান, হাতে কুলুপ দিয়া জুত করতে পারবা না। ঠিক আছে, তুমি হাতে কুলুপ দেওনের ভান করবা আর আমি তখন সুবিধা পাইলে কুলুপ দিমু বাঁইয়া পায়ে।'

মধু আর তালেবের তেমন কোনো বিশেষ গুণ নেই। তারা মাঝে মাঝে 'ডু' দেবে আর বিপক্ষের খেলোয়াড় ধরার সময় সাহায্য করবে।

BanglaBook.org

সোলেমান আরো বলে, 'যে পয়লা ধরবা, হে যদি বোঝ ধরা ঠিক অইছে, তয় 'ধর' কইয়া আওয়াজ দিবা। তখন আর সবাই ঝাঁপাইয়া পড়ব। যাও আর সময় নাই। যার যার জায়গা লও গিয়া।'

খেলা শুরু হয়।

রেফারির বাঁশির নির্দেশ পেয়ে আসুলির দলের বাদল প্রথমে 'ডু' দেয়, 'ডিগিড্ডিগিড্ডি গিড্ডিগি—

তার উত্তরে সোলেমান 'ডু' দেয়, 'কপাইচ—কপাইচ—কপাইচ—'

আলকাস 'ট্যাগাট্ট্যাগাট্ট্যাগা—'

ফজল 'ড্যাগাড্ড্যাগাড্ড্যাগাড্ড্যাগা—'

ফরমান : 'কপাইট—কপাইট—কপাইট—'

উত্তেজনাহীন 'ডু'-এর মহড়া চলে কিছুক্ষণ। তারপরই আসুলির দল মেতে ওঠে। বাদল, ফরমান আর আক্‌লাসের 'ডু'-এর দাপটে বিব্রত বোধ করে চরের দল।

ছোট্ট সীমিত কোটের মধ্যে সাতজন খেলোয়াড়ের দাঁড়াবার জায়গা। এর মধ্যে থেকেই বিপক্ষের আক্রমণের মোকাবেলা করতে হবে। চরের দল তাড়া খেয়ে শেষ সীমারেখার কাছে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

ফরমান 'ডু' দিয়ে এগিয়ে যায়, মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে থাবা মারে। কোরবান লোভ সামলাতে পারে না। সে ফরমানের হাতে কুলুপ দিয়ে বসে। কিন্তু তার হাতের ঝটকা টানে কোরবান উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয়।

দলের একজন কমে গেল। সোলেমান 'ডু' দেয়। সময় কাটাবার জন্য মধ্য রেখার কাছ দিয়েই ঘুরে ঘুরে সে 'কপাইচ—কপাইচ' করে। সময় বেশি নিচ্ছে দেখে রেফারির সন্দেহ হয়, দম চুরি করছে বোধ হয় সোলেমান। তাইতো! তিনি বাঁশিতে ফুঁ দেন। কিন্তু কেউ ছুঁয়ে মারবার আগেই সোলেমান লাফিয়ে ভেগে আসে।

ভজহরি 'ডু' দিতে এগিয়ে আসে। ফজলের দিকে ডান পা এগিয়ে দেয় সে। চোখে তার অবজ্ঞার হাসি। ভাবটা এই—সাহস থাকলে ধরো না দেখি, কত মুরোদ। ফজল লখাইকে কনুইর গুঁতো মেরে ইশারা করতেই সে কুলুপ দেয়ার ভান করে। ভজহরি লেংড়ি দেয় লখাইকে। অমনি ফজল ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাজার ওপর। জাপটে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ধর।'

সাথে সাথে আর তিনজনে ধরে রেখে দেয় ভজহরিকে।

সোলেমান ফজলকে বাহবা দেয় আবার চুপিচুপি সাবধানও করে, 'ওইভাবে ঝাপাইয়া পইড়্য না। বুকে চোট লাগতে পারে।'

ভজহরি মরে যাওয়ায় কোরবান তাজা হয়েছে। ফজল 'ডু' দেয়। সোলেমানের মতো সে-ও সময় ধ্বংস করে।

'ট্যাগাট্ট্যাগা' করতে করতে আসে আক্‌লাস। সে বাঁ দিকের খেলোয়াড়দের সোজা তাড়িয়ে নিয়ে চলে। সোলেমান আর কোরবানের 'জল্লা' যাওয়ার মতো অবস্থা। ফজল দৌড়ে যায় আক্‌লাসকে ধরতে। কিন্তু সে সোলেমানকে ছুঁয়ে, লাফ মেরে ফজলকে ডিঙিয়ে পালিয়ে যায়।

আসুলির সমর্থকরা আনন্দে হাততালি দেয়।

দলের দুই প্রধান খেলোয়াড় মারা গেছে। এবার আর উপায় নেই।

কাদির 'ডু' দেয়ার জন্য মধ্যরেখার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সতেরো বছরের নব যুবক। সুপারি গাছের মতো ওর দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নেই। হাত-পা কাঠিকাঠি, যেন তালপাতার

BanglaBook.org

সেপাই। ওকে দেখে আসুলির খেলোয়াড়রা অবহেলার হাসি হাসে, হাতে তুড়ি মেরে ঠাট্টা করে। তাদের ঠাট্টার জবাবে সে 'ডু' দেয়—

'হেঁই কপাটি কয় বাত্তি ?'

সাবু খাইছ কয় বাত্তি ?'

রেফারি বাঁশিতে ফুঁ দেন। হাত নেড়ে বলেন, 'এরকম ছড়া কেটে 'ডু' দেয়া চলবে না। আবার 'ডু' দাও।'

কাদির 'ডিগডিগ্' করতে করতে এগিয়ে যায়।

কালিপদ আর ওসমান মাটির ওপর থাবড়া মেরে ওকে ভয় দেখায়। কিন্তু ও ঘাবড়ায় না। ওর 'ডু' চলতে থাকে।

হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে কালীপদর পায়ে লেংড়ি মেরে সে চলে আসে।

চারদিক থেকে হাততালি পড়ে। কেউ কেউ বলে, 'পচা শামুকেও পা কাটে।'

সোলেমান আনন্দের আতিশয্যে কাদিরকে কাঁধের ওপর নিয়ে নাচতে থাকে। কালীপদ মারা পড়ায় বেঁচে ওঠে সোলেমান ও ফজল। আবার পুরো হয় চরের দল।

কিন্তু একটু পরেই ফরমানের আক্রমণে মারা যায় কাদির আর মধু। তারও কিছুক্ষণ পরে তালেব 'ডু' দিতে গিয়ে ধরা পড়ে।

বিরতির বাঁশি বাজে। খেলার অর্ধেক সময় শেষ হলো। আসুলির দলের সবাই তাজা। চরের দলে বেঁচে আছে চারজন।

দশ মিনিট বিশ্রামের পর আবার খেলা শুরু হয়।

সোলেমান 'ডু' দিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যায়। একটু এগিয়ে ওসমানের ওপর থাবা মারতেই শামসু ঢুস দিয়ে ধরবার জন্য ছুটে আসে। সোলেমান চক্কর মেরে শামসুকে ঘূর্ণা খাইয়ে চলে আসে।

আক্‌লাস 'ডু' দিয়ে সোলেমান ও তার পাশের খেলোয়াড়দের দাবড়ে নিয়ে যায়। লাফ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই তার উদ্দেশ্য। ফজল তাকে বেড় দেয়। আক্‌লাস লাফ দিতেই সে সটান খাড়া হয়ে যায়, দু'হাত বাড়িয়ে আক্‌লাসের ডান হাঁটুর কাছে জাপটে ধরে। আক্‌লাস ফজলের কাঁধের ওপর ঝুলতে থাকে। তার মাথা নিচের দিকে। পড়ে যাওয়ার ভয়ে হাতদুটো তার মাটি ধরবার জন্য আকুলি-বিকুল করছে।

'ডু'-এর আদান-প্রদান চলে কিছুক্ষণ। চরের খেলোয়াড়রা সব ধীর-স্থির। তারা 'ডু' দিয়েও বেশি দূর এগোয় না, ধরবার জন্যও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে না। শামসু আর আক্‌লাস তাজা না হওয়া পর্যন্ত আসুলির দলও বেশি মাতে না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর মধু ও লখাইকে মেরে তারা দল পুরো করে। কিন্তু সময় আর বেশি নেই। এ পর্যন্ত তারা এক পাট্টিও বানাতে পারেনি। কয়েকটা অখ্যাত অজ্ঞাত পুচকে খেলোয়াড় তাদের এভাবে ঠেকিয়ে রাখবে, এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে ?

তারা বাদল আর ফরমানকে গোয়ার্তুমি করার জন্য ছেড়ে দেয়। মাতামাতি করে 'ডু' দিয়ে চেষ্টা করতে দোষ কি ? ধরা পড়লে পড়ুক। আর বেঁচে আসতে পারলে তো কথাই নেই।

বাদল আর ফরমান খ্যাপার মতো 'ডু' দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে চরের দলকে।

সোলেমান সাবধান করে দেয় সবাইকে, 'অ্যাকদিগে দাবড় লাগাইলে অন্য দিগ থিকা আউগ্‌গাইয়া আসবা। কিন্তু ধরবা না, খবদ্দার। করুক না ওরা গোত্‌লাগুত্‌লি যত পারে!'

BanglaBook.org

সোলেমানের উদ্দেশ্য সময় নষ্ট করা। সময় কাবার করে কোনো রকমে 'ড্র' রাখতে পারলেই চরের ইজ্জত বজায় থাকে। কিন্তু বাদল আর ফরমান 'ডু' দিয়ে শেষ সীমারেখার কাছে দাবড়িয়ে নিয়ে যায় তাদের। সীমারেখার বাইরে গেলেই জল্লা যেতে হবে। এ অবস্থায় সোলেমানের হুঁশিয়ারি ভেস্তে যায়। ঠিক থাকতে পারে না সোলেমান নিজেও। না-মরদের মতো জল্লা গিয়ে মরার চেয়ে ধরে মরা অনেক ভালো।

কিন্তু ধরতে গিয়েই শুরু হয় মড়ক। কোরবান আর তালেব ধরেছিল বাদলকে। কিন্তু সে দু'জনকেই ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। তারপর ফরমানকে ধরতে গিয়ে মারা যায় সোলেমান। আর বাদলের দাবড় খেয়ে কাদির জল্লা যায়। টিকে থাকে শুধু ফজল।

উত্তেজনা টগবগ করছে দর্শকদের ভেতর। এবার আসুলির ভাগ্যে নিশ্চিত জয়লাভ।

মিনিট দুয়েক সময় আছে আর। ফজল 'ডু' দেয়। কিন্তু তাকে ধরবার আগ্রহ দেখায় না কেউ। সে দম শেষ করে ফিরে আসে।

বাদল 'ডু' দেয়, এগিয়ে যায় লম্বা হাত বাড়িয়ে। ফজল সরতে থাকে কোণের দিকে, ধরবার ভান করে। কিন্তু বাদল ওসব গ্রাহ্যের মধ্যেই নেয় না। আর নেবেই বা কেন? দিঘে-পাশে কোনোটায়ই ফজল তার সমকক্ষ নয়। ফজল মাথা নুইয়ে কুলুপ দেয়ার ভান করে। আর সেই সময় তার মাথায় থাবা মারবার জন্য বাদল একটু বেশিই এগিয়ে যায়। অমনি ফজল তড়িৎগতিতে এগিয়ে গিয়ে বাদলের মাজায় ধরে ফেলে। বাদল কোতাকুতি করে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু ততক্ষণে ফজল তাকে শূন্যে তুলে ফেলেছে।

চারদিকে হৈচৈ কলরোল। হাততালির চোটে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।

লখাই তাজা হয়ে 'ডু' দিতে যায়। তার 'ডু' শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রেফারি খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চরের জনতা বেড়া গলিয়ে ছুটে আসে মাঠে। হৈ-হুল্লোড় করে তারা তাদের খেলোয়াড়দের ঘিরে ধরে। এক একজন খেলোয়াড়কে চার-পাঁচজনে মিলে মাথার ওপর তুলে নেয়।

আক্কেল হালদারের ছোট ভাই তোয়াক্কেল হালদার এতক্ষণ দর্শকদের ভিড়ের মাঝে চুপটি মেরে ছিল। সে এসে বলে, 'খেলোয়াড়গ নিয়া চলো বাজারে। আইজ তারা আমাগ ইজ্জত বাঁচাইছে। তাগ এট্টু মিষ্টিমুখ করাইয়া দেই।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খেলোয়াড়দের নিয়ে জলধর ময়রার দোকানে ঢোকে তোয়াক্কেল। ফজল আর কাদিরের জামা বগলে নিয়ে দেলোয়ার জনতার পেছনে পেছনে আসছিল। সে-ও ঢুকে পড়ে দোকানে। ফজল তাকে আদর করে পাশে বসায়। বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা করে বিশ-পঁচিশ জন হুজুগমত্ত ছেলে-ছোকরা।

ময়রাকে তোয়াক্কেল বলে, 'তোমার দোকানডা আইজ কিন্যা ফালাইমু আলইকর।'

'তা কিন্যা ফলাওনা। আমারে শুদ্ধা কিন্যা ফালাও।'

'হ কিনমু। এহন কও দেহি, কত ট্যাহার মিষ্টি আছে তোমার দোকানে।'

ময়রা হেসে বলে, 'কত আর অইব! দ্যাও তিরিশ ট্যাহা।'

তোয়াক্কেল তিনটা দশ টাকার নোট ময়রার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'নেও তিরিশ ট্যাহাই দিলাম। তুমি দিতে শুরু কর। আমাগ প্যাড ভরাইয়া বাইরের তাগও দিবা। দিয়া ফুরাইয়া ফালাইবা বেবাক।'

মিষ্টি খাওয়া শেষ করে রওনা হয় সবাই।

BanglaBook.org

কাদির আগে আগে চলছে। তার পেছনে চলছে ফজল দেলোয়ারের হাত ধরে।

দেলোয়ার নিচু গলায় বলে, 'দুলাভাই আপনেরে বহুত দিন বিচ্‌রাইছি।'

'ক্যান্ ?'

'বু আপনেরে যাইতে কইছে। হাশাইলের হাটে, দিঘিরপাড় হাটে কত বিচরাইছি আপনেরে!'

'হাটে আসি নাই বহুদিন। নতুন চর লইয়া বড় ঝামেলার মইদ্যে আছি। চল, আজই যাইমু তোমাগ বাড়ি।'

'যাইবেন! ঠিক!' দেলোয়ার খুশি হয়ে ওঠে।

'হ যাইমু। তোমাগ নায় জায়গা অইব তো ?'

'হ্যাঁ।'

ফজল একটু চিন্তা করে কাদিরকে ডাকে, 'ও কাদির।'

'জ্বি।'

'এত তাড়াতাড়ি যাইতে আছ ক্যান্ ? তোমাগ বাড়ি যাইমু দেইখ্যা বুঝি পলাইতে আছ ?'

'না-না, কি যে কন!' লজ্জা পেয়ে বলে কাদির। 'চলেন না যাই। আপনে তো আমাগ বাড়ির পথ ভুইল্যাই গেছেন।'

'তবে চলো দেখি, কাপুড়িয়া দোকানে।'

'কাপড় কিনবেন নি ?'

'হ।'

নিতাই কাপুড়ের দোকানে গিয়ে ফজল শ্যালকদের পছন্দমতো এক জোড়া নকশিপাড় শাড়ি কেনে। তার পরিধানের লুঙ্গিটা মাটিকাদা মেখে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। এটা পরে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তাই নিজের জন্যও সে কেনে একটা মাদ্রাজি লুঙ্গি। তারপর গগন ময়রার দোকান থেকে এক পাতিল মিষ্টি কিনে তারা নৌকায় উঠে রওনা হয়।

BanglaBook.org

॥ আট ॥

মোল্লাবাড়ির একমাত্র জামাই ফজল। শ্বশুরবাড়ির আদর-আপ্যায়নের মাত্রাটা তাই একটু বেশিই জুটত তার ভাগ্যে। তার আগমনে উৎসব শুরু হয়ে যেত মোল্লাবাড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠত—মুরগি জবাই করোরে, গুঁড়ি কোটরে, পিঠা বানাওরে! সে যে কত পদের পিঠা। কখনো বানাত পাটিসাপটা, বুলবুলি, ভাপা, কখনো বানাত ধুপি, চন্দ্রপুলি, চিতই, কখনো বা পাকোয়ান, শিরবিরন, বিবিখানা। চালের গুঁড়ি কুটে পিঠা বানাতে বানাতে রাতদুপুর হয়ে যেত। সে পিঠা তৈরির আসর আনন্দমুখর হয়ে উঠত গীত-গানে, কেচ্ছা-শোলকে।

সাত-আট মাস আগেও একবার শ্বশুরবাড়ি এসেছিল ফজল। সেবারও উৎসব লেগে গিয়েছিল মোল্লাবাড়ি। জামাইয়ের আদর-যত্নের কোনো রকম ত্রুটিই হতে দেয়নি শ্বশুর-শাশুড়ি। ফজল দু'দিন ছিল সেখানে। শালা-শালীরা তাকে ঘিরে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ছিল দুদিন। ঠাট্টা-মশকরা, হাসি-হুল্লোড়ে তারা ভরে দিয়েছিল তার মন-প্রাণ।

আজও এ বাড়িতে পা দেয়ার পর শালা-শালীরা ছুটে এসেছিল। এসেছিল কলরব করতে করতে, 'দুলাভাই আইছে, দুলাভাই আইছে!'

শালা-শালীরা হৈ-চৈ করতে করতে তাকে ভেতরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। বেঁকি বেড়ার কাছে পৌঁছতেই শোনা যায় শ্বশুরের গলা, 'অ্যাই দেলা, অতিথরে কাছারি ঘরে নিয়া বইতে দে।'

অন্দর থেকে ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্য করে ধমক ছাড়ে সে আবার, 'অ্যাই পোলাপান, কিয়ের এত চিল্লাচিল্লি ? বান্দরের খেইল আইছে, অ্যাঁ ? যা, ঘরে যা শিগ্‌গির।'

ধমক খেয়ে সুড়সুড় করে চলে গিয়েছিল সবাই। তারপর আর একজনও আসেনি তার কাছে। যে দেলোয়ার এত আগ্রহভরে তাকে নিয়ে এল, তার মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়। ফজল বুঝতে পারে, তার এ বাড়িতে আসায় খুশি হয়নি শ্বশুর। কিন্তু কেন ? তার বাবা রূপজানের গয়না বন্ধক দিয়েছে সে জন্য ? রূপজান তো চিঠিতে লিখেছিল, শ্বশুরের রাগ তার ওপরে নয়। কেন সে লিখেছিল এমন কথা ? আর তাকে আসতেই বা লিখেছিল কেন এত মিনতি করে ? কেন দেলোয়ারকে পাঠিয়েছিল হাটে-বাজারে তাকে খুঁজতে ?

রূপজানকে দেখার জন্য ব্যাকুল বাসনা রয়েছে তারও মনে। রূপজানের আকুল আহ্বান না পেলে তার সে বাসনা পথ খুঁজে পেত না। আসত না সে এ বাড়ি। দেলোয়ার হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে যায় কাছারি ঘরে। রূপজান কোন ঘরে কি করছে জানতে ইচ্ছে হয়েছিল ফজলের। কিন্তু জিজ্ঞেস করা আর হয়ে ওঠে না। সে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

মোরগের ক্ব-ক্ব চিৎকার শোনা যায়। খোপ থেকে মোরগ টেনে বার করছে কেউ।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতো আনন্দ খেলে যায় ফজলের মনে। সে ভাবে, মোরগ জবাই করার আয়োজন হচ্ছে যখন তখন তার অনাদর হবে না নিশ্চয়।

অন্দরে শ্বশুরের গলা শোনা যায় আবার, 'মোরগ ধরছে ক্যাডারে ?'

কেউ উত্তর দিল কিনা শোনা গেল না।

শ্বশুর আবার বলে, 'রাইতের বেলা ঘুমের মোরগ লইয়া টানাটানি শুরু করছে ক্যাঁ ? আল্লা রাইত দিছে ঘুমানের লেইগ্যা। ঘুমের পশু-পক্ষীরে কষ্ট দিলে আল্লার গজব পড়ে।'

মোরগের ক্ব-ক্ব আর শোনা যায় না। খোপের মোরগ খোপেই চলে গেছে, বুঝতে পারে ফজল।

আবার মেঘ জমে তার মনে। বাড়ি চলে যাওয়ার কথা ভাবে সে। কিন্তু এত রাত্রে নৌকা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে অবাঞ্ছিত মুসাফিরের মতো একা বসে থাকে কাছারি ঘরে।

এর আগে যতবার সে এ বাড়িতে এসেছে প্রত্যেক বারই শ্বশুর-শাশুড়ি হাসিমুখে এগিয়ে এসেছে। সেও তাজিমের সাথে তাদের কদমবুসি করেছে। তাকে ভেতরবাড়ি নিয়ে গিয়ে তারা জিজ্ঞেস করেছে সকলের কুশল-বার্তা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে জমাজমি আর ফসলাদির খবরাখবর। আজ তাদের আলাঝিলাও দেখতে পায়নি সে। তাই কদমবুসি করার সুযোগও হয়নি। দেলোয়ার হারিকেন দিয়ে সেই যে গেছে আর একবারও আসেনি তার কাছে। সে এলে তাকে সাথে করে সে অন্দরে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির কদমবুসি করে আসতে পারত।

ঢুকুর-ঢুক্ আওয়াজ আসছে ঢেঁকির। ধান ভানার শব্দ। দ্রুততালের মৃদু শব্দ হলে বোঝা যেত পিঠের জন্য চালের গুঁড়ি কোটা হচ্ছে। ঢেঁকিটা যে রকম বিলম্বিত তালে ওঠা-নামা করছে তা থেকে সহজেই বুঝতে পারে ফজল, ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে শুধু একজন। রূপজান নয় তো!

ফজল উঠে অন্দরমুখী দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটো খুঁজে বেড়ায় একটি মুখ। কিন্তু কোনো ঘরের খিড়কি-জানালা দিয়েই সে মুখ দেখা যায় না। ঢেঁকিঘরে কোনো খিড়কি

BanglaBook.org

নেই। সেখানে আছে কিনা কে জানে ? পশ্চিমভিটি ঘরের বারান্দায় শুধু দেলোয়ারকে দেখা যায়। সে স্কুলের পড়া তৈরি করছে বোধ হয়।

নিঃশব্দ পায়ে ফজল সেদিকে এগিয়ে যায়। জানালার পাশে গিয়ে নিচু গলায় ডাকে, 'দেলু।'

'জ্বী।'

'তোমার বু' আছে এই ঘরে ?

'না।'

'ঢেঁকিঘরে আছে ?'

'উঁহু, সে পাকের ঘরে, মা-র লগে রানতে লাগছে।'

'মিয়াজি কোন ঘরে ?'

'উত্তরের ঘরে।'

'আমারে নিয়া চলো দেখি, মিয়াজিরে সেলাম কইর‍্যা আসি।'

দেলোয়ারের পেছনে পেছনে উত্তরভিটি ঘরে ঢোকে ফজল।

আরশেদ মোল্লা বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। শব্দ পেয়ে সে মাথা তুলে তাকায়।

'আস্‌লামু আলাইকুম।' ফজলের সশ্রদ্ধ সালাম।

আরশেদ মোল্লা সালামের জবাব দেয় না।

কদমবুসি করার জন্য ফজল তার পায়ের দিকে এগিয়ে যেতেই সে পা গুটিয়ে বসে পড়ে। হাত নেড়ে বলে, 'উঁহু উঁহু—দরকার নাই। এই পাও ধরলে লাভ অইব না। যাও নিকারি-কৈবর্তের পায়ে ধর গিয়া। দুইডা পয়সা উৎপন্ন অইব।'

ধক করে ওঠে ফজলের বুক। তার মুখ কালো হয়ে যায়। সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না সেখানে। কাছারি ঘরে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ে চৌকির ওপর।

এতক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে কুয়াশা। তার মাছ ধরার কথা জেনে ফেলেছে শ্বশুর। আর এ জন্যই এ বাড়িতে উল্টো হাওয়া বইছে আজ।

আর একদণ্ড এ বাড়িতে থাকা চলে না। ফজল বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে। নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে হয় তো ধরতে পারবে কোনো নৌকা।

কাছারি ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই সে থমকে দাঁড়ায়। তার কুঁকড়ে-যাওয়া মন হঠাৎ চিড়বিড়িয়ে ওঠে—এভাবে চুপিচুপি চোরের মতো কেন যাবে সে ? এটা তো মরদের কাজ নয়। সে কি চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করেছে, না ডাকাতি বাটপাড়ি করেছে ? সে করছে হালাল রুজি। এতে শ্বশুরের রাগ হওয়ার কি আছে ? তার রাগের মাথা তামুক কে খেতে চায় ? শুধু একজন রাগ না হলেই হয়। সে যদি বাধ্য থাকে তবে কারো তোয়াক্কা সে করে না। আজই—এই রাতেই রূপজানের সাথে বোঝাপড়া করবে সে।

সে কাছারি ঘরে ফিরে এসে দেখে দেলোয়ার খাবার আনতে শুরু করেছে।

আগে ভেতর বাড়িতেই তার খাবার দেয়া হতো। সামনে বসে পরিবেশন করত শাশুড়ি, নয় তো রূপজান। আজকের অবস্থা বিবেচনা করে এ ব্যবস্থায় আশ্চর্য হয় না সে।

তার খিদে নেই তেমন। বেশি মিষ্টি খেয়ে তার মুখটা কেমন বাইতা-বাইতা করে। পেটের ভেতরেও কেমন বেতাল ভাব। ঝাল তরকারি দিয়ে দুটো ভাত খেলে হয়তো সে ভাবটা কেটে যেত। কিন্তু এ বাড়ির তেতো আবহাওয়ায় তার খাবার ইচ্ছে একেবারেই মরে

BanglaBook.org

গেছে। তবুও সে খেতে বসে। কিছু না খেলে আবহাওয়াটা হয়তো আরো তেতো, আরো বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

কৃষক পরিবারের নিত্যকার খাবার ডাল, ভাত, মাছের সালুন। কোনো বিশেষ পদ তৈরি হয়নি জামাইয়ের জন্য। ফজল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুটো মুখে দিয়ে খাওয়া শেষ করে।

দেলোয়ার মিষ্টিও নিয়ে আসে। তারই আনা মিষ্টি। ফজল বলে, 'মিষ্টি এত খাইছি আইজ! প্যাডের মইদ্যে মিষ্টির চর পইড়্যা গেছে। ওগুলা লইয়া যাও।'

মিষ্টি খেয়ে দেলোয়ারেরও একই অবস্থা। তাই আর সাধাসাধি না করে সে মিষ্টির থালা নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই সে কাঁথা-বালিশ এনে ধপাৎ করে ফেলে চৌকির ওপর।

শব্দটার প্রতিশব্দ হয় ফজলের বুকের ভেতর।

দেলোয়ার বিছানা পেতে দিয়ে চলে যায়। ফজল কাঁথা আর বালিশটার দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে।

আগে শ্বশুরবাড়ি এলে তার শোয়ার ব্যবস্থা হতো অন্দরের কোনো নিরালা ঘরে। সেখানে থাকত পাশাপাশি দুটো বালিশ। দোসরহীন বালিশটা যেন মুখ লুকিয়ে কাঁদছে আজ।

ফজল বসে বসে বিড়ি টানে। তার নাক আর মুখ দিয়ে গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। তার বুকের ভেতর জ্বলছে যে ক্ষোভের আগুন, এ যেন তারই ধোঁয়া।

সে উঠে পায়চারি করে এদিক-ওদিক। ঢেঁকিঘর থেকে এখনও ধানভানার শব্দ আসছে।

হারিকেনের আলো যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়ে অন্দরমুখি দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় ফজল। উত্তর ও পশ্চিমভিটি ঘরে বাতি জ্বলছে।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে দুটো বাতিই নিবে গেল। তাকে উপহাস করে যেন মুখ লুকাল অন্ধকারে।

ফজল দরজা দুটোয় খিল লাগিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে হারিকেনটা নিবিয়ে দেয়।

একটা সম্ভাবনা হঠাৎ উঁকি দেয় তার মনে। সে উঠে পড়ে। অন্ধকার ঘর অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে সে অন্দরমুখি দরজাটার খিল খুলে রেখে আসে।

সম্ভাবনাটা তার অন্তরের উমে রূপান্তরিত হয় নিশ্চিত বিশ্বাসে। আর সে বিশ্বাসের ওপর ভর দিয়েই চলে তার প্রতীক্ষা।

কিন্তু আসছে না কেন রূপজান? এখনো কি সবাই ঘুমোয়নি? ভারাভানুনি এখনো ধান ভানছে ঢেঁকি ঘরে। বোধহয় তার জন্যই আসতে পারছে না।

ঢেঁকিটা যেন কিছু বলছে। কি বলছে? ফজল শুনতে পায়—ওটা বলছে, 'আসি গো আসি, আসি গো আসি।'

রাত অনেক হয়েছে। ঢেঁকির শব্দ আর শোনা যায় না। ফজল অধীর প্রতীক্ষায় এ-পাশ ও-পাশ করে।

এখনও দেরি করছে কেন রূপজান? ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

'উঁহু কিছুতেই না।' মনে মনে বলে সে। 'চউখের দেখা দেখনের লেইগ্যা পরান যার ছটফট করে, তার চউখে কি ঘুম আইতে পারে?'

তার মনে হয়, রূপজান জেগেই আছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না বেরুবার।

সে বিছানা ছেড়ে খালি পায়ে ঘর থেকে বেরোয়। পা টিপে টিপে পশ্চিম ভিটি ঘরের দক্ষিণ পাশের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে হয়তো এ ঘরেই শুয়ে আছে রূপজান।

BanglaBook.org

আধ-ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে সে তাকায় ভেতর। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে সব একাকার। তার দৃষ্টি হারিয়ে যায় সে অন্ধকারে। সে মৃদু শিস দেয় বারকয়েক। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

ফজলের মনে হয় রূপজান এ ঘরে নেই। থাকলে জেগেই থাকত সে। এ অন্ধকারেও তার নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যেত। আর হয়তো পাওয়া যেত রেশমি চুড়ির মিষ্টি রিনিঠিনি আওয়াজ।

উত্তরভিটি ঘরেই তাহলে শুয়েছে রূপজান। কিন্তু সে ঘরের বারান্দায় থাকে শ্বশুর। সে-দিকে যেতে তাই সাহস হয় না তার। নিরাশ মনে কাছারি ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য সে পা বাড়ায়। এমন সময় শোনা যায় হালকা আওয়াজ—ঠুক-ঠুক-ঠুক। কাঠ বা অন্য কিছুর ওপর টোকা দেয়ার শব্দ।

আনন্দ-শিহরণে কেঁপে ওঠে তার সমস্ত শরীর। সে তাড়াতাড়ি টিনের বেড়ায় আঙুলের টোকা দেয় তিনবার। কোনো সাড়া না পেয়ে সে আবার টোকা দেয়। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কিন্তু প্রত্যাশিত ঠুকঠুক আওয়াজ আর শোনা যায় না।

তার মনে সন্দেহ জাগে—এ কি রূপজানের সঙ্কেত ? না আর কিছু শব্দ ? টিকটিকির শিকার ধরে আছাড় মারার শব্দ নয়তো ?

জানালাটা আরো একটু ফাঁক করার জন্য সে একটা পাট ভেতরের দিকে ঠেলে দেয় আর অমনি ক্রুদ্ধ আওয়াজ শোনা যায়, 'কোঁ-ওঁ-ওঁ।'

সে লাফ দিয়ে পিছিয়ে যায় ভয়ে। তার এক পায়ে কাঁটা ফুটে যায় কয়েকটা। কাঁটাযুক্ত শুকনো ডালটা সে টান দিয়ে খুলে ফেলে। একটা কাঁটা বোধহয় ভেঙে রয়েই গেল।

আচমকা ভয়ে পিছিয়ে গেলেও সাথে সাথেই ফজল বুঝতে পেরেছিল, ক্রুদ্ধ আওয়াজটা একটা উমে-বসা মুরগির। সে আবার জানালার কাছে ফিরে যায়। দৃষ্টি ফেলে ঘরের ভেতর। এবারেও কিছুই ধরা দেয় না চোখে।

তাকে চমকে দিয়ে আবার সেই আওয়াজ হয়—ঠুক-ঠুক-ঠুক। কিন্তু সেই সাথে শোনা যায় চিঁও চিঁও ডাক। ডিম ফুটে মুরগির বাচ্চা বেরুচ্ছে।

ঠুক-ঠুক শব্দটা কিসের এতক্ষণে ধরতে পেরেছে ফজল। হতাশায় ভারাক্রান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে সে ফিরে যায় কাছারি ঘরে। কলসিতে রাখা অজুর পানি দিয়ে পা ধুয়ে সে শুয়ে পড়ে।

কাঁটাটা বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে পায়ে। বরই কাঁটা বোধ হয়। তাই এত ব্যথা করছে। এটা খুলতে না পারলে ঘুম আসবে না আজ। ফজল উঠে হারিকেন ধরায়। কিন্তু কি দিয়ে খুলবে কাঁটা ? নখ দিয়ে সরু করা ম্যাচবাতির কাঠি দিয়ে সে খোঁচায় চামড়ার ওপর। কিন্তু চার-পাঁচটা কাঠি ধ্বংস করেও কাঁটার নাগাল পাওয়া যায় না।

কিসের সামান্য একটু শব্দ শুনে মাথা তোলে ফজল। একটা পাটশলা পুবদিকের জানালা দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। বাঁ হাতে পাটশলাটা ধরে সে জানালার দিকে তাকায়। একটা হাত আবছায়ার মতো সরে গেল।

ফজলের মনের বীণায় আনন্দের সুর বেজে ওঠে। আর সেই সুরের সাথে নেচে ওঠে তার দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু।

মনের উল্লাস গোপন করে সে হাসিমাখা মুখে চেয়ে থাকে জানালার দিকে। অনুচ্চ স্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলে, 'এত রাইতে আর রংঢং করণ লাগব না। আসনের ইচ্ছা থাকলে আইসা পড় শিগ্‌গির। দেরি করলে কিন্তু কপাটে খিল লাগাইয়া থুইমু।'

BanglaBook.org

জানালা থেকে দরজার দিকে চোখ ফেরাবার সময় তার নজর পড়ে হাতের পাটশলার দিকে। ওটার আগায় একটা সাদা বেলোয়ারি পুঁতি। পুঁতিটা ধরতেই পাটশলাটার ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আসে একটা খোঁপার বেলকুঁড়ি কাঁটা।

আনন্দের সুর ছাপিয়ে হঠাৎ বেজে ওঠে করুণ সুর। তার মনের গহনে সমাহিত একটা পুরাতন স্মৃতি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ঠিক এমনি একটা খোঁপার কাঁটা দিয়ে তার পায়ের কাঁটা তুলে দিয়েছিল জরিনা।

সারদা আইনের বছর। বাংলা ১৩৩৬ সাল। সবার মুখে এক কথা—আইন পাশ হয়ে গেলে ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদি দেয়া মুশকিল হবে। তাই বিয়ের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল দেশে। সদ্যোভূমিষ্ঠ অনেক ছেলে-মেয়েরও বিয়ে হয়েছিল সে সময়। দুই পেটের অজাতশিশুর বিয়ের ঘটকালির নজিরও নাকি আছে প্রচুর। সেই সময়ে ফজলের সাথে বিয়ে হয়েছিল জরিনার। ফজলের বয়স তখন এগারো আর জরিনার দশ। পাঁচ বছর যেতে না যেতেই জরিনা হাতে-পায়ে বেড়ে উঠল। তার সারাদেহে নেমে এল যৌবনের ঢল। আর ফজলের তখনো গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তারপর একদিন। ফজল তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন বাকি। রাত জেগে পড়া তৈরি করছিল সে। জরিনা ঐ সময়ে ঢুকে পড়েছিল তার পড়ার ঘরে। তার খোঁপা থেকে বেলকুঁড়ি খুলে সে ফজলের পায়ের কাঁটা তুলে দিয়েছিল। কাঁটা তোলার সময় তার পা-টা ছিল জরিনার কোলের ওপর। আর ঐ অবস্থায় তাদের দেখে ফেলেছিল ফজলের বাবা।

গুরুতর ভাবনায় পড়ে যায় এরফান মাতব্বর। তার মনে হয়—সেয়ানা বউটা নষ্ট করে ফেলবে তার 'আবাত্তি' ছেলেটাকে। ছিবড়ে বানিয়ে ফেলবে। আর ওকে দূর না করলে ছেলের পড়াশুনা একেবারেই হবে না। ছেলে বই সামলাবে, না বউ সামলাবে ?

কয়েকদিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলে এরফান মাতব্বর। জরিনাকে আবার বিয়ে দিতে যে খরচ লাগবে সে বাবদ কিছু টাকা সে জরিনার ভাইয়ের হতে গুঁজে দেয়। তারপর একদিন ফজলকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে খেজুরগাছ-কাটা চকচকে ধারালো দা হাতে নিয়ে মাতব্বর গর্জে ওঠে, 'অ্যাদে ফউজ্যা, ছ্যাপ্পে দেখছস ? তালাক দে, কইয়া ফ্যাল—তিন তালাক বায়েন। তেড়েংবেড়েং করলে তিরখণ্ড কইর‍্যা ফালাইমু।'

নিতান্ত নিরুপায় ফজল উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছিল, 'তিন তালাক বায়েন।'

সেদিনই রাগে দুঃখে ফজল বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নিরুদ্দেশ হয়ে ছিল তিন মাস। সেই থেকে তার লেখা-পড়ারও ইতি ঘটেছিল।

স্মৃতিটাকে নির্মম শক্তিতে দাবিয়ে দেয় ফজল। আজকের এ আনন্দঘন মুহূর্তে একে কোনো রকম প্রশ্রয় দিতে রাজি নয় তার মন। মৃত অতীত মনের গহ্বরে চাপা পড়ে থাক। পড়ে থাক গহন অন্ধকারে।

খোঁপার কাঁটাটা দিয়ে ফজল পায়ের কাঁটাটা তুলে ফেলে। আর ওটা তুলবার সময় ছলছল করে তার চোখ দুটো।

খোঁপার কাঁটাটা দিয়ে পালালো কোথায় রূপজান ? সে নিশ্চয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আলো জ্বলছে, তাই বোধ হয় সে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।

ফজল হারিকেনটা নিবিয়ে দেয়। ঘুমের ভান করে সে পড়ে থাকে বিছানায় আর মাঝে মাঝে বালিশে চিবুক রেখে দৃষ্টি ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য ভেজানো দরজার ওপর।

সময় এগিয়ে চলছে। চলছে ফজলের মনের ওপর দিয়ে আশা-নিরাশার মই টেনে। বারবার মাথা তুলতে গিয়ে তার ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেছে। ক্লান্ত হয়েছে চোখ দুটো।

BanglaBook.org

ফজল অস্থির হয়ে ওঠে। চঞ্চল হয় রক্তস্রোত শিরা-উপশিরায়। নিজেকে সে আর বিছানায় ধরে রাখতে পারে না। সে উঠে বসে। মনে মনে ভাবে—রূপজান তো এমনিতেই লজ্জাবতী লতা। এতদিনের অসাক্ষাতে লজ্জার মাত্রাটা হয়তো আরো বেড়ে গেছে। তাকে দেখলে লজ্জায় দৌড় মারবে নাতো সে ? নাহ্, তাকে কোনো মতেই পালাবার সুযোগ দেয়া যায় না। সে বাইরমুখি দরজার খিল নিঃশব্দে খুলে নিশ্চুপে বেরিয়ে যায়। কাছারি ঘরের পশ্চিম পাশ দিয়ে গিয়ে বেঁকিবেড়ার আড়াল থেকে সে উঁকি মারে। নাহ্! রূপজানের আলাঝিলাও দেখা যায় না উঠানে। তবে কি সে কাছারি ঘরের পুবপাশে আছে ? পুবদিকের জানালা দিয়েই তো সে পাটশলাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ফজল উঠান পার হয়ে ঢেঁকিঘরের উত্তরপাশ ঘুরে পুবপাশ দিয়ে আলগোছে পা ফেলে এগিয়ে যায়।

একটু দূরেই কাছারি ঘরের পুব পাশে ঘন অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তির আভাস পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, ঐ তো রূপজান বসে রয়েছে। তাকে দেখে পালিয়ে যাবে নাতো আবার! এত চোখপলানি খেলা ভালো লাগে না তার।

ফজল পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। কিন্তু রূপজান নড়ছে না তো একটুও! নড়লে আন্দোলিত হতো কালো অন্ধকার। বোধ হয় কাছারি ঘরের দিকে চোখ তার। তাকে ঘর থেকে বেরুতে দেখেনি তো ? দেখলে সে এরকম নিশ্চুপ বসে থাকত না। উঠে দাঁড়াত অন্তত।

ফজল নিঃশব্দে এগিয়ে যায়, পেছন থেকে বেঁধে ফেলে তাকে দুই বাহুর আবেষ্টনীতে।

মূর্তিটি গা মোচড়ামুচড়ি করে। দুহাত দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করে নিজেকে।

'আরে এমুন করতেছ ক্যান্ ?'

ফজল তাকে পাঁজাকোলা করে নেয়। চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় তার ঠোঁট, দুটি গাল। নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে না আর সে এখন।

ফজল তাকে কোলে করে এনে বিছানায় শুয়ে দেয়। নিবিড় করে বুকে টেনে নিতে নিতে ফিসফিস করে সে বলে, 'বাপের বাড়ির ভাতে রস নাই ? কেমুন হুগাইয়া গ্যাছ মনে অইতাছে!'

'এই কি! কাঁপতে আছ ক্যান্ তুমি ?' কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করে ফজল।

প্রেমিকের বুকের সাথে আরো নিবিড় হয়ে মিশে যায় প্রেমিকা। নবম হাত দিয়ে গলা জাপটে ধরে তার। কিন্তু তবুও তার কাঁপুনি থামে না, কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে।

ফজল তার গালে চুমো এঁকে দিয়ে বলে, 'কথা কওনা ক্যান্, অ্যাঁ ? তোমারে কি ডরে ধরছে ? কিসের ডর অ্যাঁ ? এত রাইতে আর কেও জাগব না। আর জাগলেই বা কি। আমি কি অন্য মাইনষের বউ লইয়া হুইয়া রইছি ?'

একটু থেমে আবার সে বলে, 'আইজ ভারি কষ্ট দিছ। খোঁপার কাঁটাডা দিয়া আবার পলাইয়া রইছিলা ক্যান্, অ্যাঁগো ? কি, মুখ বুইজ্যা রইছ যে! একবারও তো জিগাইলা না, কেমুন আছি ?'

এবারও কোনো জবাব পায় না ফজল। বুকের সাথে এক হয়ে মিশে যেতে চাইছে যেন তার প্রিয়া। তার গলায় মুখে সে চুমো দিচ্ছে বারবার।

ফজলের চঞ্চল রক্ত আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে। সারা দেহে জাগে পুলক-শিহরণ। তার ডান হাত কাপড়ের জঞ্জাল সরিয়ে অবতরণ করে প্রিয়ার দেহভূমিতে।

BanglaBook.org

কিন্তু এরকম লাগছে কেন ? এ কোন চরে নেমেছে সে ? তাকে কি কানাভুলায় পেয়েছে ? পথ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে অন্য চরে ?

সন্দেহ জাগতেই হাতের পাঁচটি খুদে অনুচর একজোট হয়ে জরিপ করতে লেগে যার চরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

তাইতো! এ চরটা তো তার পরিচিতি নয়! এর আকার-আয়তন চড়াই-উৎরাই, হালট-ঢালট, খাঁজ-ভাঁজ তার অচেনা।

ফজল এবার স্পষ্ট বুঝতে পারে এ রূপজান নয়। সে বলে ওঠে, 'কে ? কে তুমি ?'

কোন জবাব পাওয়া যায় না। তার মুখের ভাষা যখন মুক, তখন তার দেহের ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে। তার অঙ্গে অঙ্গে সার্বজৈবিক ভাষার কলরব।

ফজলের ব্যস্ত হাতটি বালিশের তলা থেকে ম্যাচবাতি বের করে। সে কাঠি খুলে ধরাতে যাবে অমনি একটা হাতের ঝটকা খেয়ে তার হাত থেকে ম্যাচবাতিটা ছিটকে পড়ে যায়। কাঠিগুলো শব্দ করে ছড়িয়ে যায় মেঝের ওপর। তার হতভম্ব হাতটি অন্য একটি হাতের আমন্ত্রণে ফিরে যায় কিছুক্ষণ আগের পরিত্যক্ত জায়গায়।

দুটি কবোষ্ণ ঠোঁট ফজলের ঠোঁটে গালে সাদর স্পর্শ বুলায় বার-বার। তার সারা দেহে সঞ্চারিত হয় বাসনা-বিদ্যুৎ। রক্তে জাগে পরম পিপাসা।

শয্যাসঙ্গিনী তাকে অনাবৃত বুকের ওপর টেনে নেয়। ফজল বাধা দেয় না, বরং এগিয়ে দেয় নিজেকে। সে ভুলে যায় ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়। ভুলে যায় নিজের নাম-পরিচয়। এ মুহূর্তে তার কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই। এখন সে শুধু একটি পুরুষ। তার দেহ অতিথি হয়েছে যে দেহের, তা শুধুই একটি রমণীর। তারও কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই। এ মুহূর্তে পরিচয়ের কোনো প্রয়োজনও বোধ করে না তারা। দুটি নর-নারী। আদিম রক্তবাহী দুটি দেহ। রক্ত-মাংসের অমোঘ দাবির কাছে তারা পরাজয় মানে। এক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাথী খুঁজে পায় অন্য দেহে। তারা মগ্ন হয় উচ্ছল আলাপনে, এক হয়ে দোলে তরঙ্গের দোলায়।

কালো রাত্রি তখন চোখ বুজে প্রহর গুনছে।

ফজল লুঙ্গিটা খুঁজে নিয়ে কোমরে জড়ায়। শুয়ে থাকে বিছানার এক পাশে। কি রকম একটা অশুচিতায় ছেয়ে গেছে তার আপাদমস্তক। পাপ-চিন্তায় বিব্রত তার মন।

সে সন্তর্পণে চৌকি থেকে নামে। নিঃশব্দে মেঝে হাতড়িয়ে বেড়ায় অন্ধকারে। কিছুক্ষণ খোঁজার পর ম্যাচবাক্সটা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় একটা কাঠিও। সে শিয়রের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঠিটা ধরায়।

চিৎ অবস্থায় শায়িত তিমির-সঙ্গিনী হকচকিয়ে ওঠে। সে মুখ ঢেকে ফেলে এক হাতের দাবনায়। অন্য হাতে আঁচল টেনে বুক ঢাকে, ঠিকঠাক করে বেশবাস।

এক হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে ফজল অন্য হাত দিয়ে তার মুখের ওপর থেকে জোর করে হাতটা সরিয়ে দেয়।

'কে! কে!! জরিনা! জরু! জরু!!'

পলাতক অতীত ফিরে আসে। সাত বছরের বিচ্ছেদ-প্রাচীর ডিঙিয়ে সে অতীত আশ্রয় খোঁজে বর্তমানের বুকে। ফজল নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সে জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিছানায় উঠে সে নিবিড় করে জরিনাকে বুকে টেনে নেয়। সে বুকের ভেতর তোলপাড় করছে আবেগ ও বেদনার বাষ্প।

BanglaBook.org

পুঞ্জীভূত বেদনা গুমরে মরছে জরিনারও বুকের ভেতর। সেই বুকের দ্রুত ওঠা-নামা অনুভব করতে পারে ফজল। রুদ্ধ কান্না বক্ষপঞ্জর ভেদ করে বুঝি বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সে পরম স্নেহে জরিনার পিঠে, মাথায় হাত বুলায়। বেদনার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে, 'জরিনা—জরু—জরু, তুমি এই বাড়িতে কবে আইছ ? ক্যান্ আইছ ?'

জরিনা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার চোখের পানিতে ফজলের কাঁধ ভিজে যায়।

ফজল শঙ্কিত হয়। এখনই হয় তো গলা ছেড়ে কেঁদে উঠবে জরিনা। সে শাড়ির এক অংশ টেনে নিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'জরিনা, লক্ষ্মীসোনা কাইন্দ না। চলো তোমারে আউগ্যাইয়া দিয়া আসি।'

জরিনা আরো নিবিড় করে ফজলের গলা জড়িয়ে ধরে। তার ফোঁপানির শব্দ আরো স্পষ্টতর হয়।

'জরু, জরু, অবুঝের মতো কইর‍্য না। কেও টের পাইলে কেলেঙ্কারি অইয়া যাইব।'

ফজল তাকে টেনে তোলে। বাহুবেষ্টনীতে বেঁধে, মাথায় মুখে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে তাকে সে সামনের দরজায় নিয়ে যায়। তারপর দরজা খুলে একরকম জোর করেই তাকে বের করে দেয় সে।

জরিনা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ফজল দাঁড়িয়ে থাকে খোলা দরজার মুখে। তার এক হাতে ছিল স্নেহ-প্রীতির স্নিগ্ধ পরশ। আর অন্য হাতে ? অন্য হাতে ছিল নিরেট নিষ্ঠুরতা। সে নিষ্ঠুরতা এখন শত হাতে তার বুকে আঘাত হানছে। আঘাতে আঘাতে বেদনার বাষ্প গলে দরদর ধারায় তার দুগাল বেয়ে পড়তে থাকে।

নিকষ কালো অন্ধকার। জরিনা পা টিপে টিপে ফিরে আসে ঢেঁকিঘরে। বলতে গেলে গেরস্তের ঢেঁকিঘরই তার আশ্রয় আজকাল। ঢেঁকিই তার অন্নদাতা।

মেঝেতে মাদুর একটা বিছানোই ছিল। সে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। সে চোখের পাতা বন্ধ করে। আর সাথে সাথেই সক্রিয় হয়ে ওঠে তার মনের চোখ। সে চোখের পাতা নেই। সে চোখ বন্ধ করা যায় না। সে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দৃশ্যপট। পটের নিশ্চল ছবিগুলো আবার চলতে শুরু করে একের পর এক।

একটি মেয়ে। বয়স তার দশ হবে কি হবে না। তাকে ঘিরে বসে গীত গাইছে বোন-বেয়ান-ভাবির দল, *'এমন সোন্দর বইনডি আমার পরে লইয়া যায়।'*

নতুন বাক্স ভরে আসে নতুন শাড়ি-সেমিজ, সোনা-রূপার নতুন গয়না। চাচি-ফুফু-খালারাও আসে। তাকে তারা সাজায় মনের মতো করে। আসে সাক্ষী-উকিল। তারা কবুল আদায় করে, শরবত দেয়।

পরের দিন ভোর বেলা। পালকি আসে উঠানে। মেয়েটিকে কোলের ওপর নিয়ে বসে আছে তার দাদি। কারা সব বলে, 'যাও, কোলে কইর‍্যা লইয়া যাও দেহি কেমনতরো জুয়ান। যাও, নিজের জিনিস, শরম কি ?'

কৌতূহলী মেয়েটি টান দিয়ে সরিয়ে ফেলে বিরক্তিকর লম্বা ঘোমটাটা। একটা ছেলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ছেলেটি তারই বয়সী বা তার চেয়ে বড়জোর বছর খানেকের বড় হবে। রেশমি আচকান তার পরনে। মাথায় ঝলমলে জরির টুপি।

দাদির কোল থেকে তাকে তুলবার চেষ্টা করে ছেলেটি। মেয়েটি তাকে হাতের ঝটকায় সরিয়ে দেয়।

হো-হো-করে হেসে ওঠে উঠানভর্তি লোকজন।

BanglaBook.org

আবার আসে ছেলেটি। আবার তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় সে। দাদি তার কানে কানে বলে, 'যাও সোনাবইন। আল্লার নাম লইয়া পালকিতে গিয়া ওড।'

'পালকিতে! এতক্ষণ কও নাই ক্যান্। বারে কি মজা!'

মেয়েটি দাদির কোল থেকে ঝটকা মেরে বেরিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে ওঠে পালকিতে। হাসি আর হাততালির হট্টগোল ওঠে চারদিক থেকে।

ছেলেটি পালকিতে ওঠে। বসে মেয়েটির মুখোমুখি হয়ে। পালকি চলে। সুর করে সারি গাইতে গাইতে চলছে বেহারারা—

আল্লা—হা ব-লো
জোরে—হে চ-লো,
বিয়া খাইয়া বল অইছে
জোরে—হে চ-লো,
ইনাম মিলব দশ টাকা
হুঁশে—হে চ-লো,
সামনে আছে কলই খেত
কোনা-হা কা-টো।
পায়ের তলে মান্দার কাঁটা
দেইখ্যা হাঁ-টো।

বিয়েটা যে কী ব্যাপার, স্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না জরিনার। বিয়ের দিনের ঘটনা নিয়ে কতজনে কত ঠাট্টা করত তাকে।

আর স্বামী কাকে বলে তা-ও কি সে জানত তখন! একটা ছবি মনে ভাসতেই হাসি পায় তার।

ঈদের দিন। ফজল আসে তাদের বাড়িতে। আসে ঠিক নয়। নতুন বাচ্চা জামাইকে সাথে করে নিয়ে আসে তার বাবা। পাশাপাশি খেতে বসে সে ও ফজল। পরিবেশন করে তার মা। ফজলের পাতের দিকে আড়চোখে চেয়ে গাল ফুলিয়ে উঠে পড়ে জরিনা। বলে, 'আর এক বাড়ির এক ছ্যামড়া আইছে। তারেই কেবুল বেশি বেশি দিতে আছে।'

জরিনার মা চোখ রাঙায়, 'এই জরিনা, চুপ।'

'চুপ করমু ক্যান্? ওরে আমার রাঙা মোরগার কল্লাডা দিছ, রান দিছ। আর আমারে দিছ দুইডা আড্ডি।'

'এই মাইয়া! ছি! ছি!' চোখ রাঙায় তার মা।

ফজল নিজের থালা থেকে রানটা তুলে দেয় জরিনার থালায়।

জরিনা আবার ফুঁসে ওঠে, 'ইস! আর একজনের পাতের জুডা খাইতে বুঝিন আক্ কইর‍্যা রইছি আমি।'

বাতে শয্যাগত বুড়ি দাদি পাশের ঘর থেকে টিপ্পনি কাটে, 'বিয়ার দিনতো আক্ কইর‍্যা আছিলি। আধা গেলাশ শরবত ছোঁচার মতন এক চুমুকে গিল্যা ফালাইছিলি! নিজের পুরুষের জুডা খাইতে ঘিন্না কিলো অ্যাঁ?'

পরে দাদি তাকে ডেকে নিয়ে পাশে বসিয়ে অনেক কথা বলেছিল, অনেক উপদেশ দিয়েছিল। কি যে সব বলেছিল তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি তখন। তারপরেও তারা

BanglaBook.org

দু'জন একসাথে খেলেছে চোখপলানি, নলডুবি, ঝগড়া করেছে, মারামারি করেছে। তাদের কাণ্ড দেখে হেসেছে বাড়ির লোকজন, আত্মীয়-প্রতিবেশী।

ফজল ও জরিনা বেড়ে ওঠে। সেই সাথে বেড়ে ওঠে তাদের লজ্জা আর সঙ্কোচ। শেষ হয় একসাথে খেলাধূলা। ফজলকে দেখলেই জরিনার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে সলাজ হাসি। সে দৌড়ে পালায়। ফজলের হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটো পিছু ধাওয়া করে তার।

কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচ যত বাড়তে থাকে তত বাড়তে থাকে একজনের প্রতি আর একজনের আকর্ষণ।

পনেরোয় পা দিয়ে জরিনা গায়ে-গতরে বেড়ে ওঠে লকলকিয়ে। জরিনার শ্বশুর এরফান মাতব্বর চিন্তিত হয়। কারণ মেয়ের অনুপাতে ছেলে বড় হয়নি। আর ফজল তখন স্কুলে পড়ে। এ সময়ে বউয়ের আঁচলের বাও যদি ছেলের গায়ে লাগে একবার, তবে কি আর উপায় আছে ? লেখাপড়া একেবারে শিকেয় উঠে যাবে।

জরিনার বাবা-মা তখন মারা গেছে। তার ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে এরফান মাতব্বর। ঠিক হয়—ফজল ম্যাট্রিক পাশ না করা পর্যন্ত জরিনা ভাইয়ের বাড়িতে থাকবে। সেখানে ফজলও যেতে পারবে না। শুধু উৎসব-পরবে তারা দু-একদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা করতে পারবে। ফজল দিঘিরপাড় স্কুলে পড়ত। তার স্কুলে যাওয়ার পথে পড়ত শ্বশুরবাড়ি। তাকে সে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো আট মাইল দূরের নড়িয়া হাই স্কুলে। তার জন্য জায়গিরও ঠিক হলো সেখানের এক বাড়িতে।

কিছু ফুল যখন পাপড়ি মেলে তখন মধুকর টের পায়। দীর্ঘ পথের বাধা-বিঘ্ন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। তুচ্ছ মনে হয় কাঁটার ভয়।

জরিনা পাশ ফিরে শোয়। স্মৃতি-কোঠার দরজা খুলে যায় আবার। দপুর বেলা। দাওয়ায় বসে একটি তরুণী ফুল-সুপারি কাটছে। হঠাৎ শোনা যায় হট্টিটির ডাক—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্, টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্।

বাড়ির পেছনে লটাবন নদীর কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডাকটা আসছে সেদিক থেকে। সে ছাঁচতলা গিয়ে দাঁড়ায়। আবার শোনা যায়—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্। এ ডাকের অর্থ জানে একমাত্র সে-ই। সে বোঝে—একটা হট্টিটি ডাকোছে তার হট্টিটিনীকে।

সে উঠানে আসে। ভাবি সরষে ঝাড়ছে। ওজন করছে ভাই। সরষে বেচতে হাটে যাবে সে। তাদের চোখের সামনে থেকে জরিনা একটা ভরা বদনা তুলে নেয়। ইচ্ছে করেই একটু পানি ফেলে দেয় ছলাৎ করে। তারপর ছাঁচতলা দিয়ে সে চলে যায় লটাবনে।

অনেকক্ষণ পরে সে ফিরে আসে। আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে আসে ঝকঝকে নতুন এক ডজন বেলকুঁড়ি কাঁটা।

জরিনা তার খোঁপায় হাত দেয়। সেই খোঁপার কাঁটার চার-পাঁচটা এখনও টিকে আছে। টিকে আছে এক রাতের এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে।

ঘটনা নয়, দুর্ঘটনা। আর তার জন্য দায়ী তার দুঃসাহস।

ফজল পরীক্ষায় পড়া নিয়ে ব্যস্ত। সে সময়ে তার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল সে। অতো রাত্রে শ্বশুর যে আবার দেখে ফেলবে, কে জানত ? কিন্তু কি অন্যায় দেখেছিল সে ? কাঁটা তুলতে দেখেছিল ফজলের পা থেকে। এই টুকুইতো!

জরিনা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। তার মুদিত চোখের পাতা বেঁধে রাখতে পারে না অশ্রুর প্লাবন।

BanglaBook.org

অনেক আলোর আশীর্বাদ নিয়ে, শিশিরের স্নেহ নিয়ে বেড়ে উঠেছিল একটি লতা। তাতে ফুটেছিল ফুল যার বুকে ছিল আশার পরাগ, পাপড়ি-পাতায় রঙিন স্বপ্ন। ঐ রাতের দুর্ঘটনায় উৎপাটিত হলো সে লতা। তারপর যে মাটিতে পুঁতে দেয়া হলো তার শিকড়, তাতে না আছে সার না আছে রস।

হেকমতের চেহারা চোখে ভাসতেই তার সমস্ত সত্তা বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। ঘৃণায় কুঁচকে যায় সারা শরীর। হেকমত চোর। সে সিঁদ কেটে চুরি করে। বিয়ের মাস খানেক পরেই চুরির মালসহ ধরা পড়ে সে। তার জেল হয় তিনবছর। খালাস হয়ে আসার কিছু দিন পরেই আবার তার খোঁজ পড়ে। তারপর থেকেই সে ফেরার। চৌকিদার-দফাদারের চোখ এড়িয়ে সে ক্বচিৎ কখনো আসে। একদিনের বেশি থাকে না। কিন্তু তার আসা না আসা সমান কথা জরিনার কাছে। শীতের মেঘের কাছে কে প্রত্যাশা করে বৃষ্টি ?

বৃষ্টি নেই, ছায়া নেই এমনি এক মরুভূমি যেন জরিনার জীবন। উদগ্র পিপাসা বুকে নিয়ে ছটফট করছিল সে বছরের পর বছর। আজ মরুর আকাশে হঠাৎ মেঘ দেখে আকুলি-বিকুলি করছিল তার চাতক-মন। সে আর ধরে রাখতে পারেনি নিজেকে। এ মেঘ যে তার পরিচিত।

জীবনে একমাত্র ফজলের সাথেই হয়েছিল তার অন্তরঙ্গ পরিচয়। সে-ই তার জীবনের প্রথম পুরুষ। বিকাশোন্মুখ সে পুরুষটি এখন পূর্ণবিকশিত। সে লাভ করেছে পূর্ণ যৌবন। যেমন হয়েছে সে দেখতে সুন্দর, তেমনি হয়েছে বলিষ্ঠ। তার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে শক্তির সজীবতা। আজকের সান্নিধ্যের অপূর্বতায় তা স্পষ্ট অনুভূত। এর কাছে হেকমত কি ? সে একটা অপদার্থ পুরুষ। তার যৌবন নেই, আছে শুধু যৌবনের পাঁয়তারা যা শুধু হাস্যকর নয়, অসহ্য। তার কোমরে লুঙ্গির প্যাঁচে গোঁজা থাকে একটা সোডার পুটলি সব সময়। পিত্তশূলের ব্যথা উঠলেই এক খাবলা মুখে দিয়ে সে মরার মতো পড়ে থাকে বিছানায়।

জরিনা চোখ মেলে। ফিকে জোছনায় জমাট অন্ধকার তরল হয়েছে কিছুটা। বিছানায় পড়ে থাকতে আর ভালো লাগে না তার। সে উঠে ঢেঁকির ওপর গিয়ে বসে কাতলা হেলান দিয়ে।

এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক পানি ঝরিয়েছে তার চোখ। এখন কিছুটা শান্ত হয়ে সে অনুভব করতে পারে, তার অন্তরের বেদনার সাথে মিশে আছে আজকের সফল অভিসারের আনন্দ। তখনই তার সারা দেহ-মনে নতুন করে সঞ্চারিত হয় তৃপ্তির অনুভূতি। সুখের আবেশে ঢেঁকির কাতলা দুটোকে সে জড়িয়ে ধরে দুহাতে। এই মুহূর্তে সব কিছুই তার কাছে আপন মনে হয়। এই নিঝ্ঝুম রাত্রিকেও মনে হয় একান্ত আপন।

মনের আঁধারে বাসনার চামচিকেটা আবার পাখা মেলতে চায়। তাকে আর আটকে রাখতে পারছে না জরিনা। সে ঝাঁপ সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

কৃষ্ণা নবমীর চাঁদ পূর্বদিগন্ত ছাড়িয়ে উঠে গেছে অনেকদূর। ক্ষয়িষ্ণু প্রতিবেশীর আগমনে সচকিত হয়ে উঠেছে আকাশের লক্ষ কোটি তারা। হয়তো বা বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ঝিরঝিরিয়ে বইছে শরতের স্নিগ্ধ বাতাস। যেন ঘুমন্ত পৃথিবীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

মোহময়ী এ রাত। এমন লজ্জাহারিণী আশ্রয়দায়িনী রাতটা পলে পলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এমন প্রীতিময়ী রাত তার জীবনে আর আসবে না কোনো দিন। এ রাতের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

জরিনা সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে উঠানের দিকে পা বাড়ায়। এ রাতের একটি মুহূর্তকণাও সে বিফলে যেতে দেবে না।

উঠানে পা দিয়েই তার দৃষ্টি হঠাৎ থমকে যায়। একটা ছায়ামূর্তি—নারীমূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে কাছারি ঘরের দিকে। ভেজানো দরজা ঠেলে মূর্তিটা ঢুকে পড়ে ঘরে। তার খিল

BanglaBook.org

এঁটে দেয়ার অস্পষ্ট শব্দ বিকট আঘাত হানে জরিনার বুকে। তার আহত আশা আক্রোশে কাঁপে, ফণা বিস্তার করে।

সে ঢেঁকিঘরের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর একপা-দু'পা করে এগিয়ে যায় কাছারি ঘরের দিকে। পশ্চিম পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পুব দিকের জানালা দিয়ে চাঁদের ক্ষীণ আলোর রেশ এসে পড়ছে ঘরের ভেতর। ঘরের ঘন অন্ধকার তাতে হালকা হয়েছে কিছুটা।

জরিনা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় নিশ্চুপে। ফিকে অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে তার। স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই শুধু রেখাচিত্র, ছায়া-অভিনয়। অস্পষ্ট ছবিগুলো তার কল্পনার তুলিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার শিরা-উপশিরায় দ্রুত আনাগোনা করে একটা উষ্ণ প্রবাহ। রোমাঞ্চিত হয় তার সারা অঙ্গ। তার চোখ নেমে আসে আপনা থেকেই।

জরিনা ঢেঁকিঘরে ফিরে আসে। তার বুকের মধ্যে অশান্ত চামচিকের পাখা ঝাপটানি। কিছুতেই ওটা থামছে না। সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢকঢক করে পানি খায়। পানি দিয়ে যেন ভিজিয়ে দিতে চায় চামচিকের অস্থির ডানা দুটো। কিন্তু থামাতে পারছেনা।

সে বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। আবার উঠে গিয়ে মাথায় পানি দেয়। সারা দেহে অসহ্য দাবদাহ। এ দাহ কিসে শান্ত হবে?

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। রাত আর বেশি নেই। নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ায় জরিনা। এগিয়ে চলে যন্ত্রচালিতের মতো। কাছারি ঘরে গিয়ে বসে চৌকির পাশে।

ফজল বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারের আবরণে ঢাকা তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে জরিনা। হাত বুলায় তার কপালে, মাথায়। ঘুমের ঘোরে ফজল হাত বাড়ায় তার দিকে। হাতটা তুলে নেয় জরিনা। ঘুমজড়ানো কণ্ঠে ফজল ডাকে, 'রূপজান, রূপজান।'

জরিনা তার মাথা রাখে ফজলের বুকে। হঠাৎ ফজলের ঘুম ভেঙে যায়।

'আমার রূপজান!'

জরিনা সাড়া দেয় না। ফজল ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। অনুচ্চ স্বরে বলে, 'ও তুমি! আবার আইছ! তুমি নিজে তে জাহান্নামে যাইবাই, আমারেও নিয়া ছাড়বা।'

একটু থেমে আবার বলে, 'জরিনা, তুমি অন্যের বউ। তোমার গায়ে আমার আঙুলের একটু ছোঁয়া লাগলেও পাপ অইব।'

জরিনা তার পায়ে মাথা কুটতে থাকে। ফজল পা সরিয়ে নেয়। সে উঠে দাঁড়ায়, জরিনাকে টেনে তোলে। বলে, 'জরিনা যাও। আর কোনো দিন আইও না। তুমি আর আমার কেউ না।'

'কেউ না!' অস্ফুট কথা জরিনার আর্তনাদের মতো শোনায়। সে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

জরিনা চলে গেছে। সে আর কেউ নয় ফজলের। তবুও এমন হাহাকার করে উঠছে কেন, ব্যথায় ভরে উঠছে কেন তার বুকের ভেতরটা?

এ হাহাকার, এ ব্যথা কখন থামবে, কিসে থামবে?

ফজল ভাবে, রূপজান কাছে থাকলে এ হাহাকার উঠবে না আর। দূর হবে মনের সব দুঃখ-ব্যথা।

ভোর হতে না হতেই ফজল কাদিরকে ডেকে আনে পাশের বাড়ি থেকে। বলে, 'তোমার বু'রে লইয়া যাইতে চাই। মিয়াজিরে গিয়া কও।'

'দুদু কি রাজি অইব?'

'রাজি অইব না ক্যান্? তোমার বু'তো আমার লগে যাওনের লেইগ্যা তৈয়ার।'

BanglaBook.org

কাদির বাড়ির ভেতর যায়। ফিরে আসে অল্পক্ষণ পরেই। আরশেদ মোল্লা যা বলেছে, কাদির এসে কোনো রকম ঢাকা-চাপা না দিয়ে তাই বলে, 'দুদু কয়, মাইয়ার গয়নাগুলা তো বেইচ্যা খাইছে বেবাক। আবার শুরু করছে মাছ-বেচা। এই জাউল্যা বাড়ি আমার মাইয়া দিমু না।'

'দিব না কি করব ? মাইয়াখান সিন্দুকে ভইরা রাখব ? তোমার দুদুরে কইও, একদিন এই জাউল্যা ভাগাইয়া লইয়া যাইব ভদ্রলোকের মাইয়া র। তখন ইজ্জত লইয়া টান পড়ব, কইয়া রাখলাম আমি। এখন চল্‌লাম। তোমার ডিঙি দিয়া আমারে দাত্রার চরে নামাইয়া দিয়া আসো।'

'দেরি করেন দুলাভাই, নাশ্‌তা খাইয়া—'

'উঁহু। তুমি জলদি ডিঙি লইয়া ঘাটে আসো।'

॥ নয় ॥

ফজল বাড়ি যায় না। বাড়ি গেলেই তার বাবা হয়তো জেরা শুরু করবে, 'রাত্রে কোথায় আছিলি ? কাইল নায়েবের লগে অমুন কইর‍্যা কথা কইতে গেলি ক্যান্ ?'

সোজা খুনের চর চলে যায় ফজল। তাকে দেখে পুলকি-মাতব্বর আর কোলশরিকেরা কোলাহল করে ওঠে। যার যার ভাওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তারা। রমিজ মিরধা বলে, 'কাইল আসুলিগ একখান খেইল দ্যাহাইয়া আইছ হোনলাম ?'

জাবেদ লশকর : 'এই মিয়া মাতবরের পো না খেললে কাইল চরের ইজ্জত থাকত না।'

ধলাই সরদার 'হোন্‌লাম আসুলিগ কোন বড় খেলুরে তুমি এমুন চিবি দিছিলা, চিবির চোডে হের জিব্বাডা বোলে সোয়া আত বাইর অইয়া গেছিল ?'

ফজল 'আরে না মিয়া। এমন কথা কার কাছে শোনলেন ?'

ধলাই সরদার 'যারা খেইল দ্যাখতে গেছিল তাগ কাছেই হুনছি।'

গতদিনের হা-ডু-ডু খেলার আলোচনায় মেতে উঠে সবাই। তাদের মুখে ফজল আর সোলেমানের খেলার তারিফ।

সবাই চলে গেলে ফজল নিজেদের ভাওর ঘরে গিয়ে ঘরের ঝাঁপ খোলে। তাদের গাবুর একাব্বর তার অনুপস্থিতিতে বেড়ের মাছ ধরে অন্যান্যদের সাথে তারপাশা গেছে মাছ বেচতে।

মাচানের ওপর হোগলা বিছানো রয়েছে। একপাশে রয়েছে ভাঁজকরা একটা কাঁথা। রাত্রে বারবার তাড়া খেয়েছে যে ঘুম, তা এসে বিছানাটার কোথাও লুকিয়ে রয়েছে যেন। তার অদৃশ্য হাতের আলতো পরশ অনুভব করে ফজল। তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। সে কাঁথার তলা থেকে বালিশ টেনে নেয়। তারপর বিছানার ওপর ঢেলে দেয় সে তার ঘুমকাতর শরীরটাকে। কিন্তু বালিশের ওপর মাথা রাখতেই হঠাৎ চমকে ওঠে সে। লাফিয়ে ওঠে তড়াক করে।

হায়, হায়, হায়! কি সর্বনাশের মাথার বাড়ি! এখন উপায় ? ফিরে যাবে নাকি সে শ্বশুরবাড়ি ?

কিন্তু এখন গিয়ে কোনো লাভ নেই, ফজল ভাবে। এতক্ষণে কাছারি ঘরের বিছানাটা তোলা হয়ে গেছে। বালিশের তলায় রাখা খোঁপার কাঁটাটা নিশ্চয় পেয়ে গেছে রূপজান। কি কেলেঙ্কারিটা ঘটে গেল তার ভুলের জন্য।

রূপজান কি কিছু বুঝতে পারবে ? বুঝতে না পারার কোনোই হেতু নেই। একটা মাত্র কাঁটা। কয়েকটা হলেও রূপজানকে ফাঁকি দেয়া যেত। সে নিজেই ভেবে আশ্বস্ত হতো, কাঁটাগুলো তারই জন্য এনে রেখেছিল ফজল। দিতে ভুলে গেছে। এখন ওই কাঁটা বালিশের

BanglaBook.org

নিচে রাখার যে কোনো কৈফিয়তই নেই। তাছাড়া কাঁটাটা যার খোঁপার, সে ঐ বাড়িতেই রাত্রে ছিল। তার খোঁপায় নিশ্চয় রয়েছে ওটার মতো আরো কাঁটা।

ফজলের শিরা-উপশিরায় ঠাণ্ডা স্রোত ওঠা-নামা করছে।

খোঁপার কাঁটাটা সম্ভবত তারই পয়সায় কেনা। জরিনাকে এ রকম এক ডজন কাঁটা দিয়েছিল সে।

নিজের পয়সার কেনা কাঁটাটা এমন নিমকহারামি করল! দুশমনি করল! নাহ্, প্রাণহীন এ কাঁটাটার আর কী দোষ ? দুশমনি করেছে জরিনা, সেই জাহান্নামের লাকড়িটা।

ফজল ভাবে, এ ঠিক পাপের শাস্তি। পাপ খাতির করে না পাপের বাপকেও। সে কবিরা গুনা করেছে। তার জন্য এখন কড়ায়-গণ্ডায় সুদে-আসলে জরিমানা দিতে হবে।

জরিনার জন্য ফজলের মনের কোটরে বাসা বেঁধেছিল অনেক স্নেহ-মততা, অনেক সহানুভূতি। কিন্তু এ মুহূর্তে রাগ ও বিতৃষ্ণার ঘূর্ণিঝড় উড়িয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে সে সব কোমল অনুভূতি। জরিনাকে সে মনে মনে গাল দেয়, 'বেহায়া ঢেম্‌নি মাগিডাই তো তারে ঠেইল্যা নামাইছে পাপের আঠাঁই দরিয়ায়। এখন কত যে চুবানি খাইতে অইব তার শুমার নাই।'

ফজল তার মনশ্চক্ষে দেখতে পায়—রূপজান ঝাঁটা মেরে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে জরিনাকে।

জরিনার জন্য আবার কেমন করে ওঠে ফজলের মন। তাড়া-খাওয়া মমতা আর সহানুভূতি মনের আশ্রয়ে ফিরে আসার জন্য পথ খোঁজে।

ফজল রূপকথার বইয়ে পড়েছিল—রাজপুত্র আর রাজকন্যার পেছনে ধাওয়া করছে এক দৈত্য। তার গতিরোধ করার জন্য রাজকন্যা ছুড়ে ফেলে দেয় তার মাথার চিরুনি। সেই চিরুনি থেকে সৃষ্টি হয় কাঁটার এক দুর্ভেদ্য জঙ্গল। জরিনার খোঁপার কাঁটটাও বুঝি তার শ্বশুরবাড়ির চারদিকে সৃষ্টি করছে দুর্ভেদ্য কাঁটার বেড়া। সে বেড়া ভেদ করে সে কি রূপজানের কাছে যেতে পারবে আর ?

'ফজু কইরে ?'

ফজলের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে সে ঝুপ্‌ড়ি থেকে বেরোয়। তার পিতার সাথে রয়েছে মেহের মুনশি, ধলাই সরদার আর জমিরদ্দি।

'হোন্ ফজু, কোলশরিকগ খবর দিছি। এইনই আইয়া পড়ব। তুই ঘরের আড়ালে ছায়ার মইদ্যে হোগলা বিছাইয়া দে। বৈডক আছে আইজ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাতব্বরের দলের লোকজন এসে হাজির হয় বৈঠকে।

এরফান মাতব্বর বলে, 'হোন মিয়ারা, আল্লার ফজলে কাম পাকা-পোক্ত অইয়া গেছে। জমিদারের সেলামি দিয়া খাজনাপাতি দিয়া পরিষ্কার অইয়া আইছি। এহন এমুন কোনো ব্যাডা নাই যে চরের তিরিসীমানায় আউগ্‌গায়।'

আহাদালী বলে, 'কত ট্যাহা খাজনা দিলেন, মাতবরচাচা ?'

'দেদার টাকা ঢাল্‌ছিরে বাপু। তোমার মতো মাইনষে গইন্যা শুমার করতে পারব না। এহন কও দেহি তোমরা, ক্যামনে ভাগ করতে চাও জমি ?'

জমির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে আলোচনা চলে অনেকক্ষণ। অবশেষে মাতব্বরের প্রস্তাবই মেনে নেয় সকলে। চরটাকে মাঝ বরাবর লম্বালম্বি দু'টুকরো করে আটহাতি নল দিয়ে মেপে ভাগ করতে হবে। চরের মাঝখান থেকে নদীর পানি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে এক এক জনের জমি। অবস্থানের দিক দিয়ে সকলের জমিই এক ধরনের হবে। তাই উৎকর্ষের দিক দিয়েও জমিতে জমিতে বড় বেশি পার্থক্য থাকবে না।

BanglaBook.org

ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে আলোচনা শেষ হলে এরফান মাতব্বর বলে, 'আমি তো ফতুর অইয়া গেছি সেলামি আর খাজনা দিয়া। এইবার আমার সেলামির যোগাড় করো।'

'নল পিছে কত কইর‍্যা সেলামি নিবেন মাতব্বরের পো?' ধলাই সরদার জিজ্ঞেস করে।

'আর সব মাতবররা যেই রহম নেয়।'

রুস্তম বলে, 'আর সব মাতবররা তো ডাকাইত। তাগ মতন ধরলে আমরা গরিব মানুষ বাঁচ্‌মু ক্যামনে?'

কদম শিকারি সায় দিয়ে বলে, 'মাতবরভাই, এট্টু কমাইয়া ধরেন।'

'তাইলে তোমরাই কও, কত কইর‍্যা দিবা।'

রমিজ মিরধা বলে, নল পিছে বিশ ট্যাহা করেন।'

'বিশ টাকা! তোমাগ খায়েশ খানতো কম না! গত ছয় বচ্ছর খাজনা চালাইছি এই নাই-চরের। তহন একটা আধা-পয়সা দিয়াও তো কেও সাহায্য করো নাই। এহন কোন আক্কেলে এমুন আবদার করো তোমরা?'

'উপরে আল্লা আর নিচে আপনে আমাগ বাপের সমান। আপনের কাছে আবদার করমু না তো কার কাছে করমু?'

'তোমরা বিবেচনা কইর‍্যা কইও। চাইরশ বিশ আত দিঘল এক এক নল জমি। এক নলে কতডুক জমি অয় ইসাব করছনি মেহের?'

'হ, করছি। এই ধরেন সাড়ে দশ কাঠার মতন। কানির ইসাবে অয় দুই গণ্ডার কিছু বেশি। একরের ইসাবে সাড়ে সতেরো শতাংশ।' মেহের মুনশি বলে।

'এহন তোমরাই কও। সাড়ে দশ কাঠা জমির লেইগ্যা তিরিশ টাকাও দিবা না কেমুন কথা?'

জমিরদ্দি : 'দিতাম মাতবরের পো। কিন্তুক চরের জমি, আইজ আছে কাইল নাই।'

ধলাই সরদার : 'হ, হ, গাঙ্গে ভাঙ্গনের ডর না থাকলে তিরিশ ক্যান্, একশ ট্যাহাই দিতাম।'

এরফান মাতব্বর 'অইচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা পঁচিশ টাকা কইর‍্যা দিও। সবাই রাজি?'

সবাই রাজি হয়।

মাতব্বর আবার বলে, 'হোন মিয়ারা, যারা আগে সেলামির টাকা দিতে পারব, তাগ ইচ্ছামতো, পছন্দমতো জমি দিয়া দিমু।'

ভালো সরেস জমি পাওয়ার আশায় সে-দিনই সেলামির টাকা নিয়ে এরফান মাতব্বরের বাড়ি হাজির হয় অনেকে। একদিনেই আদায় হয় সাত হাজার টাকা।

বহুদিন পরে এক সাথে অনেকগুলো টাকা হাতে পেয়ে মাতব্বরের মন খুশিতে ভরে ওঠে। তার বয়সের বোঝা হালকা মনে হয়। ভাটাধরা রক্তে অনুভূত হয় জোয়ারের পূর্বাভাস।

টাকা অনেকগুলো। কিন্তু টাকার কাজও রয়েছে অনেক। প্রথমেই ঋণ সালিশি বোর্ডের মীমাংসা অনুযায়ী দুই মহাজনের দেনার কিস্তি শোধ করতে হবে। তারপর যেতে হবে জগু পোদ্দারের দোকানে। পুতের বউর বন্ধক-দেয়া গয়নাগুলো ছাড়িয়ে আনতে হবে। ফজুর মা'র দু'গাছা গয়নাও বন্ধক পড়ে আছে আজ দু'বছর। বাড়ির সবার জন্য কাপড়চোপড় কিনতে হবে। ঘাসি নৌকাটা মেরামত করা দরকার। পানসি গড়াতে হবে একটা। মাতব্বরির মান-মর্যাদা বজায় রাখতে হলে পানসি একটা রাখতেই হয়। আগেও একটা পানসি ছিল মাতব্বরের। চর ভাঙার পর অভাবের সময় সেটা বেঁচে ফেলতে হয়েছিল।

BanglaBook.org

পরের দিন। এরফান মাতব্বর হাশাইল বাজারে যায়। জগু পোদ্দারের দোকানে গিয়ে ছাড়িয়ে নেয় বন্ধক-দেয়া সবগুলো গয়না। পুতের বউর গলার হার, কানের মাকড়ি, হাতের চুড়ি আর অনন্ত। ফজুর মা'র গলার দানাকবচ আর কানের করণ্‌ফুল। এগুলো বন্ধক দিয়ে পাঁচশ টাকা নিয়েছিল সে। এখন সুদে আসলে দিতে হলো আটশ টাকা।

সুদ যে কেমন করে ব্যাঙের বাচ্চার মতো পয়দা হতে থাকে বুঝে উঠতে পারে না মাতব্বর। সে মনে মনে বলে, 'ব্যাডা পোদ্দারের পুত কি দিয়া যে কি ইসাব করল, বোঝতেই পারলাম না। ফজলরে সঙ্গে আনা উচিত আছিল। ও ইসাবপত্র বোঝে ভালো।'

কাপড়চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনাকাটা শেষ করে এরফান মাতব্বর নৌকায় গিয়ে ওঠে। তাদের গাবুর একাব্বর নৌকা ছেড়ে দেয়।

মাতব্বর বলে, 'সোজা নলতা মোল্লাবাড়ি চইল্যা যা। আইজ বউ না লইয়া বাড়িত যাইমু না।'

ভাটি পানি। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকা। গয়নার পুটলিটার ওপর হাত বুলাতে বুলাতে এরফান মাতব্বর মনে মনে বলে, 'আইজ দ্যাহাইয়া দিমু আরশেদ মোল্লারে। ও বিশ্বেস করে নাই আমার কথা। মনে করছে ওর মাইয়ার গয়না আর ছাড়াইতে পারমু না। আইজ দশটা চউখ উধার কইর‍্যা আইন্যা দেখবি, যেই গয়না বন্দক দিছিলাম, তা বেবাক ছাড়াইয়া আনছি। দেহি, এইবার তুই আমার পুতের বউ কোন ছুতায় আটকাইয়া রাখস।'

আরশেদ মোল্লা নিজের ও গরুর গা ধোয়ার জন্য নদীতে নেমেছিল। দুটো বলদ ও একটা গাইকে গলাপানিতে দাঁড় করিয়ে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে সে ওদের গা ঘষামাজা করছিল। হঠাৎ একটা উদলা নৌকার ওপর তার চোখ পড়ে। নৌকাটা তার বাড়ির দিকে আসছে আর ওতে বসে আছে এরফান মাতব্বর।

আরশেদ মোল্লা তাড়াতড়ি একটা ডুব দিয়ে আধা নাওয়া গরুগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে যায় বাড়ির দিকে।

ভেজা কাপড়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মোল্লা তাঁর স্ত্রীকে ডাকে, 'কইগো রূপির মা, আমার লুঙ্গি আর নিমাডা দ্যাও দেহি জলদি।'

'এত জলদি কিয়ের লেইগ্যা ? মাইর করতে যাইব নি ?'

'আগো চুপ করো। রূপজান কই ?'

'নাইতে গেছে।'

'হোন, এরফান মাতব্বর আইতে আছে।'

'কুডুম আইতে আছে ভালো কথা। পুরান কুডুমের কাছে যাইতে আবার সাজান-গোছন লাগবনি ?'

'দুত্তোরি যা!' বিরক্ত হয়ে মোল্লা ভিজা কাপড়েই ঘরে যায়। লুঙ্গি বদলে নিমাটা গায়ে চড়িয়ে সে বেরিয়ে আছে। স্ত্রীকে বলে, 'হোন, মাতবর আমার কথা জিগাইলে কইও, দিঘিরপাড় হাটে গেছে।'

'ক্যান্ ? কুডুমের ডরে উনি পলাইতে আছে নি ?'

'পলাইতে আছি তোমারে কে কইল ? হোন, আমার মনে অয় মাতবর আইতে আছে তোমার মাইয়া নিতে। আমি থাকলেই তক্কা-তক্কি অইব। জোরাজুরি করব মাইয়া নেওনের লেইগ্যা। আমি বাড়িত্ না থাকলে আর জোরাজুরি করতে পারব না। তুমি কইও, উনি বাড়িত্ নাই। খালি বাড়িরতন মাইয়া দেই ক্যামনে ?'

BanglaBook.org

'কই গেলেন বেয়াইসাব ?' এরফান মাতব্বরের গলা।

আরশেদ মোল্লা খাটো গলায় বলে, 'ঐ যে আইয়া পড়ছে! আমি গেলাম।'

আরশোদ মোল্লা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে সটকে পড়ে।

'বেয়াইসাব কই ?' আবার হাঁক দেয় এরফান মাতব্বর। 'আরে—আরে—আরে! গরুতে ক্যালার ড্যামগুলা খাইয়া ফালাইল। কই গেলেন মোল্লাসাব ?'

এরফান মাতব্বর তার হাতের লাঠি উঁচিয়ে হেঁই হাঁট-হাঁট করে গরুগুলোকে তাড়া দেয়।

রূপজানের মা সোনাভান ওরফে সোনাইবিবি মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে আসে গরু বাঁধবার জন্য।

'আসলামালেকুম বেয়ানসাব। কেমন আছেন ?'

'আল্লায় ভালোই রাখছে।'

'মোল্লাসব কই ?'

'উনি হাট করতে গেছে দিঘিরপাড়।'

'হাট করতে গেছে! তয় এই মাত্র গরু নাওয়াইতে দ্যাখলাম কারে ?'

'হ উনিই। ঐ পুবের বাড়ির তারা হাটে যাইতে আছিল। তাই ত্বরাত্বরি গিয়া ওঠছে তাগো নায়। গরু বান্ধনেরও অব্‌সর পায় নাই।'

সোনাইবিবি গরু বাঁধবার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু গরুর শিং নাড়া দেখে সে ভয়ে পিছিয়ে আসে। তার মাথার ঘোমটা পড়ে যায়, নাকের দোলায়মান সোনার চাঁদবালিটা চিকমিকিয়ে ওঠে।

মাতব্বর বলে, 'আপনে পারবেন না। আমি আমার গাবুররে ডাক দিতে আছি। ওরে একাব্বর, এই দিগে আয়। গরুগুলারে গোয়ালে বাইন্দা রাখ।'

মাতব্বর বেঠকখানায় গিয়ে চৌকির ওপর বসে। তার প্রশ্ন এড়িয়ে অন্দরে চলে যেতে পারেনা সোনাইবিবি। সে অন্দরমুখি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মাতব্বরের সাথে কথা বলছে।

'বউমা কই, বেয়ান সাব ?'

'নাইতে গেছে।'

'আইজ বউমারে নিতে আইছি। একটা মাত্র পুতের বউ আমার। বউ বাড়িতে না থাকায় বাড়ি-ঘর আমার আন্দার অইয়া রইছে।'

'আপনেরা আমাগ মাইয়ার মোখ্‌খান যে আন্দার কইর‍্যা থুইছেন হেই কথাতো কন্ না। মাইয়ার গয়নাগুলারে বেবাক—'

'গয়নার কথা কেন ? এই দ্যাহেন, বেবাক গয়না ছাড়াইয়া আনছি।'

গয়নার পুটলিটা উঁচু করে দেখায় মাতব্বর। তারপর আবার বলে, 'বউমারে ডাক দ্যান। তার গয়না তার আতে বুঝাইয়া দিমু আইজ।'

কিছুক্ষণ পর রূপজান আসে। শ্বশুরের কদমবুসি করে সে দাঁড়ায় তার কাছে।

মাতব্বর বলে, 'তোমার এই বুড়া পোলার উপরে রাগ অইয়া রইছ মা ? এই দ্যাহো।' মাতব্বর গয়নার পুটলি খোলে। 'এই নেও মা, তোমার গলার হার। নেও, গলায় দ্যাও। শরম কিয়ের ?'

হারটা গলায় পরে রূপজান।

'আর এই ধরো কানের মাক্‌ড়িজোড়া। কানে দ্যাও মা, কানে দ্যাও। তুমি তো জানো মা, কেমুন বিপাকে পইড়্যা গেছিলাম। তা না অইলে কি আমার মা-র গয়না বন্দক দেই আমি ? কানে দিছ মা ? হ্যাঁ এইতো এহন কেমুন সোন্দর দেহা যায় আমার মা-লক্ষ্মীরে।'

BanglaBook.org

একজোড়া অনন্ত ও ছয়গাছা চুড়িসহ পুটলিটা রূপজানের দিকে এগিয়ে দিয়ে মাতব্বর আবার বলে, 'এই নেও মা। কিচ্ছু থুইয়া আহি নাই। বেবাক ছাড়াইয়া আনছি। আর দ্যাহো, কেমুন চকমক-ঝকমক করতে আছে। সবগুলারে পালিশ করাইয়া আনছি।'

রূপজানের গয়না পরা হলে মাতব্বর বলে, 'এইতো এহন আমার মা-র মোখখান হাসি-খুশি দ্যাহা যায়। আর এই নেও শাড়ি। দ্যাহো কী সোন্দর গুলবদন শাড়ি। যাও মা শাড়িডা পিন্দা তোমার মা-র কদমবুসি করো গিয়া। আর জলদি কইর‍্যা তৈয়ার অইয়া নেও।'

সোনাইবিবি দরজার আবডালে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে, 'কর্তা বাড়িতে নাই। খালি বাড়িরতন মাইয়া দেই ক্যামনে?'

'কর্তা নাই, কর্তানি তো আছে। যান বেয়ানসাব, বউমারে সাজাইয়া-গোজাইয়া দ্যান।'

'উনি বাড়িত্ না আইলে তো মাইয়া দিতে পারমু না।'

'উনি কোন সুম আইব, তার তো কোনো ঠিক নাই!'

'হ, হাটে গেছে, আইতে দেরি অইব। আপনে আর একদিন আইয়েন।'

'আর একদিন আর আইতে পারমু না। আইজই বউ লইয়া বাড়িত যাওন চাই। এইখানে এই পাড়া গাইড়্যা বইলাম আমি। যান, খাওনের যোগাড় করেন। পালের বড় মোরগাডা জবাই করেন গিয়া।'

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা। কিন্তু এখনো বাড়ি ফিরে এল না আরশেদ মোল্লা। চৌকির ওপর শুয়ে বসে বিরক্তি ধরে গেছে এরফান মাতব্বরের। অস্বস্তিতে ছটফট করে সে। এর মধ্যে রূপজান তামাক সাজিয়ে দিয়ে গেছে বার কয়েক। প্রত্যেক বারই তাকে জিজ্ঞেস করেছে মাতব্বর, 'কি মা, তোমার বা'জান আইছে?'

অধৈর্য হয়ে ওঠে রূপজানও। সে বার বার ছাঁচতলায় গিয়ে নদীর দিকে তাকায়। কিন্তু তার বা'জানকে দেখা যায় না কোনো নৌকায়। তার ব্যাকুলতার কাছে হার মানে লজ্জা-সঙ্কোচ। সে মা-কে বলে, 'মা, বা'জান এহনো আইহেনা ক্যান্?'

'উনির আহন দিয়া তোর কাম কি?'

'দ্যাহো না, মিয়াজি যাওনের লেইগ্যা কেমুন উতলা অইয়া গেছে।'

'তোর মিয়াজি উতলা অইছে, না তুই উতলা অইছস?'

লজ্জায় মাথা নত করে রূপজান। মেয়ের দিকে চেয়ে মায়ের মন ব্যথায় ভরে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সে।

রূপজানের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সে বলে, 'আমি আর কী করতে পারি, মা। তোর বাপ বেবুঝ, গোঁয়ার। আমার কোনো কথা কানে লয় না।'

'যেই গয়নার লেইগ্যা আমারে আটকাইছে, হেই গয়না তো বেবাকই দিছে আবার। বা'জান বাড়িত থাকলে যাইতে মানা করত না। তুমি মিয়াজিরে কও আমারে লইয়া যাইতে।'

'কোন্ ডাকাইত্যা কথা কস, মা। উনির হুকুম ছাড়া তোরে যদি এহন যাইতে দেই, তয় কি আমারে আস্ত রাখব! কাইট্যা কুচিকুচি কইর‍্যা গাঙে ভাসাইয়া দিব না!'

'যদি যাইতে না দ্যাও, তয় গয়নাগুলা রাখবা কোন মোখে? এগুলা ফিরাইয়া দেই?'

'ফিরাইয়া দিবি ক্যান্? উনি বাড়িত আহুক। ওনারে বুঝাইয়া-সুজাইয়া তোরে পাডাইয়া দিমু একদিন।'

BanglaBook.org

এরফান মাতব্বর মাগরেবের নামাজ পড়েও অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু আরশেদ মোল্লার আসার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না তার। মনের এ সন্দেহ তার আরো দৃঢ় হয়। সে বুঝতে পারে, আরশেদ মোল্লা তাকে দেখে পালিয়েছে। সুতরাং সে যতক্ষণ এ বাড়িতে আছে ততক্ষণ মোল্লা কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না।

মাতব্বর এশার নামাজ পড়ে বাড়ি রওনা হয়। যাওয়ার সময় বেয়ানকে বলে যায়, 'গয়নার লেইগ্যা মাইয়া আটকাইছিল। সবগুলো গয়না বুঝাইয়া দিছি। এইবার ভাল্‌মাইনষের মতন আমার পুতের বউরে যেন্ আমার বাড়িত্ দিয়া আহে।'

॥ দশ ॥

কার্তিক গেল, অগ্রহায়ণও প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু রূপজানকে দিয়ে গেল না আরশেদ মোল্লা। লোকটার মতলব খারাপ বলে মনে হচ্ছে এরফান মাতব্বরের। মোল্লার চেহারা মনে ভাসতেই তার রক্ত টগবগ করে ওঠে, *'জাক্কইর'* দিয়ে ওঠে সারা শরীরের রোম। তার ইচ্ছে হয়—মোল্লাকে শড়কি দিয়ে গেঁথে কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে।

রাগ হয় তার নিজের ওপরেও। কেন সে আহাম্মকের মতো এতগুলো গয়না তুলে দিয়ে এল মোল্লার মেয়েকে? যে মোল্লা ফেরেববাজি করে নিজের নাবালক ভাইপোর দুই কানি জমি আত্মসাৎ করতে পারে, জমির লোভী সেই মোল্লা যখন নতুন চরের জমির জন্য তার কাছে এল না, তখনই সে বুঝতে পেরেছিল, লোকটার মনে *'খন্নাস'* ভর করছে। এতটা বুঝেও কেন বোকামি করল সে! কেন দিয়ে এল গয়নাগুলো! ওগুলো থাকলে ও দিয়েই আবার সে ফজলের বিয়ে দিতে পারত।

হুঁকো টানতে টানতে উঠানে বেরোয় এরফান মাতব্বর। সেখানে বরুবিবি রোদে দেয়া ধান ঘাটছিল পা চালিয়ে।

মাতব্বর বলে, 'হোন ফজুর মা, এত টাকার গয়না খামাখা দিয়া আইলাম। আমার মনে অয় গয়নাগুলা অজম করনের তালে আছে মোল্লা।'

'আমারও মনে অয় গয়নাগুলো মাইর‍্যা দিব।'

'কিন্তু অজম করতে দিমু না। আইজ মানুষজন খবর দিতে আছি।'

'ক্যান্, মানুষজন দিয়া কি অইব?'

'কি অইব আবার! এত চর দখল করলাম এই জিন্দিগিতে, আর এহন নিজের পুতের বউ দখলে আনতে পারুম না!'

'ওনার কি মাথা খারাপ অইল নি? কাইজ্যা-ফ্যাসাদ কইর‍্যা বউ ছিনাইয়া আনলে মাতবর বাড়ির ইজ্জত থাকব? মাইনষে—'

'কি করতে কও তয়? পাজির লগে পাইজ্যামি না করলে দুইন্যায় বাঁইচ্যা থাকন যায় না।'

'আবার মোল্লাবাড়ি গিয়া দেহুক না একবার।'

'উঁহু! আমি আর যাইতে পারমু না। তোমার পোলারেই পাডাইয়া দ্যাও।'

'ও গেলে তো দিবইনা।'

'হে অইলে ঐ মাইয়ার আশা ছাইড়্যা দ্যাও। গেছে গয়না যাইক। তুমি মাইয়া বিচরাও। ফজুরে আবার আমি বিয়া করাইমু।'

'কিন্তুক ফজুরে রাজি করান যাইব না।'

BanglaBook.org

'ক্যান্ যাইব না ? এমুন খবসুরত আর ঢক-চেহারার মাইয়া যোগাড় করমু, মোল্লার মাইয়ার তন তিন ডফল সোন্দর।'

'উঁহু। কত জায়গায় কত মাইয়া দ্যাখলাম। আমার রূপজানের মতন এমুন রূপে-গুণে কামে-কাইজে লক্ষ্মী মাইয়া আর পাওয়া যাইব না।'

'মাইয়াডা তো লক্ষ্মী, কিন্তু বাপখান কেমুন ? ওর মতো অলক্ষ্মী, পাজির পা-ঝাড়া আছে দুইন্যার মাঝে ? ওর মাইয়া লক্ষ্মী অইলেই কি, আর না অইলেই কি! তুমি জিগাও তোমার পোলারে।'

'উঁহু, ও রাজি অইব না কিছুতেই।'

'ক্যামনে বোঝলা তুমি ?'

'আমি মা, আমি কি আর বুঝি না ?'

'তয় এমুন না-মরদের মতন চুপচাপ রইছে ক্যান্ তোমার পোলা ? যায় না ক্যান্ হউর বাড়ি ? আলগোছে ভাগাইয়া লইয়া আইলেই তো পারে।'

'এই বুদ্ধিডাই ভালো। চুপে-চাপে কাম অইয়া গেলে কেও টের পাইব না।'

'হ তোমার পোলারে এই পরামিশই দ্যাও। নেহাত যদি বউ স্ব-ইচ্ছায় না আইতে চায়, তয় জোর কইর‍্যা লইয়া আইব। তা না পারলে গয়নাগুলা যেন্ কাইড়্যা লইয়া আহে।'

ফজলও এ রকমই ফন্দি এঁটেছিল। দ্বিধা-লজ্জার চাপে তা ছিল তার মনে মনেই এত দিন। বাপ-মায়ের প্ররোচনা ঝেঁটিয়ে দেয় তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। সে তার মামাতো ভাই হাশমতের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করে, তার শ্বশুর যেদিন দূরে কোথাও যাবে, রাত্রে বাড়ি ফিরবে না, সেদিন সে চলে যাবে শ্বশুর বাড়ি। রাত্রে সে থাকবে সেখানে। রাত দুপুরের পর নৌকা নিয়ে সেই বাড়ির ঘাটে হাজির হবে হাশমত।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু সুযোগ আর আসে না। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত ফজল মিস্ত্রিদের কাজ দেখাশুনা করে। নতুন চরে পানসি তৈরি হচ্ছে তাদের। রাতের বেলাও ভাওর ঘর ছেড়ে সে কোথাও যায় না। বসে থাকে খবরের আশায়। গোপন খবরের জন্য সে তার চাচাতো শালা কাদিরকে লাগিয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকলেই ফজলের মনে হানা দেয় জরিনার খোঁপার কাঁটাটা। রূপজান নিশ্চয় পেয়েছে কাঁটাটা। তার বুঝতে বাকি নেই কিছু।

'বুঝুক, বুইঝ্যা জ্বইল্যা পুইড়্যা মরুক। ও-ই তো এর লেইগ্যা দায়ী। ঐ দিন রাইতে দেরি করল ক্যান্ ও ?' ফজলের মনে ক্ষুব্ধ গর্জন।

কিন্তু তবুও তার মনের দ্বিধা দূর হয় না। সে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে রূপজানের সামনে ? কাঁটাটার কথা জিজ্ঞেস করলে কি বলবে সে ?

নাহ্, মিছে কথা ছাড়া উপায় নেই, ফজল ভাবে। এমন কিছু বানিয়ে রাখতে হবে যাতে জিজ্ঞেস করলেই ঝেড়ে দেয়া যায়।

কিন্তু রূপজানের সাথে দেখা করার সুযোগই যে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুযোগের নাগাল পাওয়ার আগেই একদিন বাড়ি থেকে নূরু এসে বলে, 'দুদু, পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা হুন্‌ছি চর দখলের আয়োজন করতে আছে!'

'কার কাছে শুন্‌লি ?'

'আইজ ইস্কুলতন আইতে লাগছি, একজন মাইয়ালোকে আমারে ডাক দিয়া নিয়া চুপে চুপে কইছে এই কথা।'

'মাইয়া লোক! কে চিনস না ?'

BanglaBook.org

'উঁহু। হে কইছে, আইজই তোর চাচার কাছে খবরডা দিস।'

'মাইয়া লোকটা দ্যাখতে কেমন ?'

'শ্যামলা রঙ। নীলা রঙের শাড়ি পরনে।'

'মোডা না চিকন ?'

'বেশি চিকন না। মোডাও না।'

'বয়স কত অইব ? বুড়ি, না জুয়ান ?'

'বুড়ি না। চাচির মতই বয়স অইব।'

ফজল চিনতে পারে না কে সে মেয়েলোকটি। কিন্তু সে যে-ই হোক, নিশ্চয়ই কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী আপন জন। তার খবরটা বেঠিক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। জঙ্গুরুল্লা দাঙ্গাবাজ। তার তাঁবে অনেক কোলশরিক, লাঠিয়াল-লশকর। ডাইনগাঁয়ের পুব দিকে অনেক কয়টা চর দখল করেছে সে। ফজল চিন্তিত হয়।

নূরু ও চার-পাঁচজন পুলকি-মাতব্বরকে সাথে করে ফজল বাড়ি যায়।

এরফান মাতব্বর শুনে বিশ্বাস করতে চায় না। সে বলে, নিজের এলাকা ছাইড়্যা জঙ্গুরুল্লা এত দূরে আইব কি মরতে ?'

মেহের মুনশি বলে, 'কওন যায় না চাচাজান। জঙ্গুরুল্লার দলে অনে-ক মানুষ-জন।'

'হ ব্যাডা ট্যাহার কুমির।' সমর্থন করে বলে জাবেদ লশকর। 'মাইন্‌ষে কয়, জঙ্গুরুল্লা পাল্লা-পাথর দিয়া ট্যাহা মাপে। গইন্যা বোলে শুমার করতে পারে না।'

'হে অইলে তো তৈয়ার থাকতে অয়', এরফান মাতব্বর বলে। 'চাকইর‍্যা ভাড়া করণ লাগব, না 'তোমরাই ঠেকা দিতে পারবা ?'

ফজল 'আমরাই পারুম।'

মেহের মুনশি : 'এক কাম করলে অয়। আমাগ জমিরদ্দির মাইয়া বিয়া দিছে জঙ্গুরুল্লার কোলশরিক মজিদ খালাসির পোলার কাছে। জমিরদ্দিরে পাডাইয়া দেই খালাসি বাড়ি। মাইয়ার কাছতন খবর লইয়া আইব গিয়া।'

যুক্তিটা পছন্দ হয় সকলের। সেদিনই জমিরদ্দিকে বেয়াই বাড়ি পাঠিয়ে এরফান মাতব্বর চলে যায় খুনের চর। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়ার জন্য সে তার লোকদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে। এক এক দল পালা অনুসারে নদীর কিনারা দিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবে। মাতব্বর নিজেও আস্তানা গাড়ে ভাওর ঘরে।

চর দখলের কিছুদিন পরেই বোরো ধানের রোয়া লাগানো হয়েছিল নদীর কিনারার কোনো কোনো জমিতে। নতুন মাটিতে ফসলের জোর দেয়া যায় খুব। কিছুদিন আগে আরো কিছু জমিতে লাগানো হয়েছে বোরো ধানের রোয়া। সেগুলোও সতেজ হয়ে উঠছে।

রোদ পোহাতে পোহাতে চরটার চারদিকে চোখ বোলায় এরফান মাতব্বর। সবুজের সমারোহ তার চোখ জুড়িয়ে দেয়। নতুন চর বলেই মনে হয় না তার কাছে। চর জাগার সাথে সাথে এমন ফসল ফলানো সম্ভব হয় না সব সময়। অপেক্ষা করতে হয় দু-এক বছর।

জমিরদ্দি খবর নিয়ে ফিরে আসে।

খবরটা সত্যি। বিশুগাঁওয়ের জমিদার রায়চৌধুরীরা এ তৌজির এগারো পয়সার মালিক। তাদের কাছ থেকে বন্দোবস্ত এনেছে জঙ্গুরুল্লা, তার লোকজন তৈরি হচ্ছে। জন পঞ্চাশেক চাকরিয়াও নাকি এনেছে সখিপুরার চর থেকে।

BanglaBook.org

খবর শুনে মুখ শুকিয়ে যায় উপস্থিত পুলকি-মাতব্বর আর কোলশরিকদের। তাদের উদ্বেগভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মাতব্বর বলে, 'জমিতে ফসল দেইখ্যা চর দখলের লোভ অইছে। আহে যেন্ চরের কাছে। আমারে চিনে না। আমি যখন থিকা মাতবর তখন জঙ্গুরুল্লার নাম-নিশানাও আছিল না।'

রুস্তম বলে, 'হ, পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা এহন চদরী নাম ফুডাইছে।'

'হ, মাইনষে যেমুন কয়—বাপ-বয়সে ঘোড়া না, লেজেতে লাগাম। তোমরা ঘাবড়াইও না। ওর চর দখলের খায়েশ মিডাইয়া দিমু।'

কিন্তু মুখে যত সাহসের কথাই বলুক, মাতব্বর মনে মনে শঙ্কিত হয়। মহাভাবনায় পড়ে সে। তার দলের বেশির ভাগ লোকই আনাড়ি। তারা লাঠিও ঘোরাতে পারে না ঠিকমত। ঘোরানোর চোটে যদি বোঁ-বোঁ আওয়াজই না ওঠে, তাকে কি লাঠি ঘোরানো বলে? মাত্র দশ-বারোজন শড়কি চালাতে পারে, বেতের ঢাল দিয়ে নিজেদের বাঁচাবার কৌশল জানে। কিন্তু পেশাদার চাকরিয়াদের সামনে তারা ধরতে গেলে কুকুরের মোকাবেলায় মেকুর।

মাতব্বর বলে, 'মেহের মুনশি চইল্যা যাও ট্যাংরামারি। ঐ জাগার আলেফ সরদার আমার পুরান চাকইর‍্যা। বিশ-পঁচিশজন শাগরেদ লইয়া যেন্ তোমার লগেই আইয়া পড়ে। আর কদম চইল্যা যাও জাজিরার চর। গদু পালোয়ানের পোলা মেঘু ওর বাপের মতোই মর্দ অইছে। ওরে আর ওর দলের পনেরো-বিশজন শড়কিদার লইয়া আইয়া পড়বা জলদি।'

একটু থেমে মাতব্বর আবার বলে, 'আমাগ হাংগাল-বাংগালগুলারে লইয়া কি করি? এইগুলার আতে শড়কি দিতে ভস্‌সা পাই না। ওরা শড়কি আতে পাইলে বিপক্ষের মাইষের বুকের মইদ্যে হান্দাইয়া দিব। এই গুলার আতে দিতে অইব লাডি। কিন্তুক একজনও ঠিকমত লাডি চালাইতে পারে না।'

'হ, ঠিকই কইছেন। একজনও ভালো কইর‍্যা লাডি চালাইতে হিগে নাই।' বলে রমিজ মিরধা।

'ফজল, এক কাম কর। তুই লোনসিং চইল্যা যা। তুই না কইছিলি লোনসিংয়ের কে খুব ভালো লাডি খেইল শিখছে?'

'হ, তুরফান।' ফজল বলে। 'আমার লগে নড়িয়া ইস্কুলে পড়তো। পুলিন দাসের এক শাগরেদের কাছে সে লাঠি খেলা শিখছে।'

'পুলিন দাস আবার কে? আহাদালী জিজ্ঞেস করে।

'পুলিনবিহারী দাস। বাড়ি লোনসিং। স্বদেশী আন্দোলনের বড় নেতা। এখন বোধ করি জেলে আছে।'

'আমরা হুনছি, সে এত জোরে বোঁ-বোঁ কইর‍্যা লাডি ঘুরাইতে পারত, বন্দুকের ছর্‌রা তার লাডির বাড়ি খাইয়া ছিট্যাভিট্যা যাইত, তার শরীলে লাগতে পারত না।' মাতব্বর বলে। 'ফজল গিয়া তুরফানরে লইয়া আয়। আমাগ হাংগাল-বাংগালগুলারে কয়ডা দিন লাডি খেলার তালিম দিয়া যাইব।'

'আমি আইজই যাইতে আছি।'

'হ, তোমরা কিছু মোখে দিয়া এহনই বাইর অইয়া পড়। যাইতে-আইতে পথে দেরি কইর‍্য না কিন্তুক।'

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে তিনটা উড়োজাহাজ আসছে। বিকট আওয়াজ তুলে ওগুলো মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় উত্তর-পুব কোণের দিকে।

BanglaBook.org

এরফান মাতব্বর শুনেছে, সারা দুনিয়া জুড়ে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কোন মুল্লুকে যাইতে আছে এগুলা, জানোনি ?'

'মনে অয় আসাম মুল্লুকে যাইতে আছে।' বলে জাবেদ লশকর।

উড়োজাহাজগুলো দূর-দিগন্তে মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মাতব্বর তবুও চেয়ে আছে সেদিকে। ওগুলোর আওয়াজ যেন বাসা বেঁধেছে তার বুকের ভেতর। যেন লড়াইয়ের কাড়া-নাকাড়া বেজে চলেছে সেখানে।

মাতব্বর শক্ত করে ধরে তার হাতের লাঠিটা। তার শিথিল বাহুর পেশি কঠিন হয়ে ওঠে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোঁচকানো মুখের রেখাগুলো। ঘোলাটে চোখ দুটো ঝলকে ওঠে আক্রোশে।

॥ এগারো ॥

ফজল পরের দিনই তুরফানকে নিয়ে আসে। এসেই তুরফান পুলকি-মাতব্বর আর কোলশরিকদের জোয়ান তরুণ ছেলেগুলোকে লাঠি খেলার সবক দিয়ে শুরু করেছে। ফজল নিজেও নিচ্ছে খেলার তালিম।

আলেফ সরদার এসেছে তার তিরিশজন সারগেদ নিয়ে। মেঘু পালোয়ান নিয়ে এসেছে উনিশজন। মাতব্বরের দলের আশিজনও হাজির। যার যার হাতিয়ার—ঢাল-কাতরা, লাঠি-শড়কি, গুলেল-গুলি সব তৈরি।

দূর থেকে কেমনে গম্‌গম্‌ আওয়াজ শোনা যায়, যেমন শোনা যায় হাটের হট্টগোল। সত্যি যেন হাট বসে গেছে খুনের চরে।

চাকরিয়াদের সাথে নিয়ে পালা অনুসারে পাহারা দিচ্ছে কোলশরিকেরা। যাদের অবসর তারা বয়স ও প্রকৃতি-প্রবণতা অনুসারে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আড্ডা দেয়। একদল মাটিতে দাগ কেটে ষোলগুটি খেলে তো আর একদল কেচ্ছা-শোলকের আসর জমিয়ে তোলে। কোনো ভাওর ঘরে বসে যায় পুঁথি-পাঠের মজলিস। সুর করে পড়ে গাজী-কালু আর সোনাভানের পুঁথি। যেখানে পানসি নৌকা তৈরি হচ্ছে, সেখানকার আসর সবচেয়ে বেশি জমজমাট। বুড়ো আকু মিস্ত্রি টান দিয়েছে গানে—

ও-ও জীর্ণ কাষ্ঠের একখান তরী,
তার উপরে এক সওয়ারি,
পাড়ি ধরছে অকূল দরিয়ায় ॥
ওরে ডওরায় পানি টুবুটুবু,
তাইতে তরী ডুবুডুবু
এখন ঢেউ উঠিলে হইব অনুপায় ॥

আছরের নামাজের সময় হয়নি তখনও। এরফান মাতব্বর ভাওর ঘরে বসে কোরানশরিফ পড়ছিল। গানের আওয়াজ কানে আসতেই তার ভ্রু কুঞ্চিত হয়, বিরক্তি ধরে। গানের আওয়াজ যাতে কানে না আসে সেজন্য গলার স্বর উঁচু পর্দায় চড়িয়ে কোরান তেলাওয়াতে মন দেয় সে। কিন্তু পাক কোরানের পাতা ছেড়ে তার মনমাঝি এক সময়ে চড়ে বসে জীর্ণ কাষ্ঠের তরীতে।

ও-ও জীর্ণ কাষ্ঠের একখান তরী,
তার উপরে এক সওয়ারি,
পাড়ি ধরছে অকূল দরিয়ায় ॥

BanglaBook.org

ওরে কালা মেঘে আসমান ছাওয়া
খাড়াঝিলিক করে ধাওয়া
এখন তুফান ছাড়লে হবে কি উপায় ?
ওরে ও মন-মাঝি—
সাবধানে ধরিও হাল,
কৌশলে বান্ধিও পাল,
উজান গাঙে পাড়ি পাওয়া দায় ॥

গান শেষ হলে এরফান মাতব্বরের সংবিৎ ফিরে আসে। নিজেকে সে তিরস্কার করে বারবার। কোরান-মজিদের পাক কালামের ওপর কেন সে তার মনকে নিবিষ্ট রাখতে পারেনি। আল্লার কালাম সে অশেষ ভক্তি নিয়ে পড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলে কি তার মন উড়াল দেবে ঐ গানের কথা আর সুরের পেছনে পেছনে!

মাতব্বর আলোয়ানের কয়েক প্যাঁচে ঢেকে নেয় তার মাথা আর কান দুটো। তারপর আবার শুরু করে কোরানশরিফ তেলাওয়াত।

আছরের নামাজ পড়ে মাতব্বর আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নেয়। শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার সারা শরীর।

আবার শোনা যায় গান। দোতারা বাজিয়ে এবার গাইছে বোধহয় পাগল বয়াতি।

দয়ালরে তোর দয়ার অন্ত নাই,
এই আসমান জমিন
আর সাগর গহিন।
সবখানে তার পরমান পাই ॥

মাতব্বরের মন গানের পাখায় ভর দিয়ে আবার উড়ে চলে। তাকেও টানে গানের আসরের দিকে। সে ঝুপ্‌ড়ি থেকে বেরোয়। একপা-দু'পা করে এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। তাকে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে সবাই। বন্ধ হয়ে যায় গান। মাতব্বরের ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে গানে ক্ষ্যান্ত দিলি ক্যান্ ? চলুক, চলতে দে।'

মাতব্বর নিজেকে সামলে নেয়। সে সকলের মুরব্বি—মাতব্বর। তার উচিত নয় এদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করার। এছাড়া একবার যদি এরা প্রশ্রয় পেয়ে যায় তবে গান-বাজনায় মেতে যাবে সবাই। আর ওদিক দিয়ে বিনা বাধায় জঙ্গুরুল্লা দখল করে নেবে চর।

মাতব্বর ডাকে আকু মিস্ত্রিকে, 'কিও মিস্ত্রি, আর কদ্দিন লাগাইবা ?'

'এই ধরেন কুড়ি-বাইশ দিন।'

'অনেক দিন লাগাইতে আছ। জলদি করো। এর পর আবার ছই লাগাইতে অইব।'

একটু থেমে সে ডাক দেয়, 'ফজল কইরে ?'

'জ্বী।' ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে ফজল।

'তোর লাডির খেইল কেমুন চলতে আছে ?'

'খুব ভালো চলতে আছে।'

'উন্নতি অইছে কিছু ? না খালি খালি—'

'না অনেক উন্নতি অইছে।'

'আরো ভালো কইর‍্যা শিখতে অইব। আর হোন্, তুই, হাশমত, লালু, ফেলু, বক্কর, টিটু, একাব্বর শড়কি চালানও শিখ্যা রাখ। আর কে কে শিখতে চায় ?'

BanglaBook.org

'আমি, আমি, বলে আরো দশ-বারোজন এগিয়ে আসে।

মাতব্বর বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ সাবাস! তোমরা আলেফ সরদার আর মেঘু পালোয়ানের শাগরেদ অইয়া যাও। শড়কি চালান শিখ। খামাখা সময় নষ্ট কইর‍্য না। কি ভাই আলেফ সরদার, কই মেঘু, পারবা না আমাগ এই হাংগাল-বাংগালগোরে এট্টু লায়েক বানাইতো?'

'পারমু না ক্যান্', মেঘু পালোয়ান বলে।

'মেঘু রাজি অইয়া গেল নি ও?' হাসতে হাসতে বলে আলেফ সরদার। 'এই জমিনওলাগো এই বিদ্যা হিগাইলে হেষে আমাগ ভাত জুটব না কিন্তু কইয়া দিলাম। কি কন্-মাতবর-ভাই?'

'আরে না-না। ভাত দেওনের মালিক আল্লা। আমরা চাইলেও কি আর তোমাগ ভাত মারতে পারমু?'

'তা ঠিক কইছেন। লইয়া আহেন মণ্ডা-মিডাই। মোখ মিষ্টি কইর‍্যা তয় না পয়লা সবক দিমু।'

পরের দিন মিষ্টিমুখ করে আলেফ সরদার আর মেঘু পালোয়ান নতুন নতুন সাগরেদদের শড়কি চালনা শেখাতে আরম্ভ করে। এরফান মাতব্বর নিজে দাঁড়িয়ে দেখে। সেও এক কালে ভালো শড়কি চালাতে পারত।

এরফান মাতব্বর নতুন সাগরেদদের উপদেশ দেয়, 'মাইনষে কইতেই কয়, বাঙ্গালের মাইর, দুনিয়ার বাইর। তোমরা হেই রকম বাঙ্গাল। তোমরা কাবু পাইলে একেবারে মাইর‍্যা ফালাইবা, আবার বেকাদায় পড়লে নিজেরা মরবা। এর লেইগ্যা তোমাগ তালিম দিতাছি। চরের কাইজ্যা কিন্তু রাজা-বাদশাগ লড়াই না যে যারে পাইলাম তারে খুন করলাম। চরের কাইজ্যা অইল বিপক্ষরে খেদানের লেইগ্যা। তাই নিজেরে বাঁচাইতে শিখ একদম পয়লা। তারপর শড়কি দিয়া খোঁচা দিতে শিখ। খোঁচা কিন্তু বুকে মাথায় দিবা না। খোঁচা দিবা আতে, পায়ে। খোঁচা খাইয়া যেন্ লাঠি-শড়কি ফালাইয়া ভাইগ্যা যায়।'

রোজ ভোর বেলা তিন-চার ঘণ্টা চলে শড়কি চালনা শিক্ষা। আর বিকেল বেলা আলেফ সরদারও মেঘু পালোয়ান তাদের দল নিয়ে লাঠি-শড়কি খেলার প্রতিযোগিতায় নামে। কখনও জঙ্গুরুল্লার দল সেজে একদল আক্রমণ করে, অন্য দল এরফান মাতব্বরের পক্ষ নিয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়। মহড়ার সময় ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দেয়া হয় শড়কির ফলা।

চাকরিয়ারা মাথাপিছু এক টাকা হিসেবে *'রোজানা'* পায়। তাদের সরদার দু'জন পায় দু'টাকা করে। এর ওপর আবার মাগনা খোরাক দুবেলা। কম করে খেলেও আধা সের চালের ভাত খায় এক-এক জনে এক-এক বেলা।

চাকরিয়া এসেছে আজ বিশ দিন। এ ক'দিনে দেড় হাজার টাকার ওপর খরচ হয়ে গেছে এরফান মাতব্বরের। আরো কতদিন রাখতে হবে চাকরিয়াদের কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। কিন্তু এই হারে খরচ হলে কিছুদিনের মধ্যেই সে ফতুর হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে যা আদায় হয়েছিল সেলামি বাবদ। কোলশরিকদের কাছ থেকেও কিছু আদায় করা যাবে না এখন, আর তা উচিতও নয়। সেলামির টাকাই বহু কষ্টে যোগাড় করেছিল তারা। সে ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি অনেকে।

'এই জমিদার আর জমিদারের নায়েবরাই যত নষ্টের গোড়া।' মনে মনে গর্জে ওঠে এরফান মাতব্বর। 'যে এগারো পয়সার মালিকানা দেখায় রায়চৌধুরীরা, সেই জাগাতো আরো অনেক দক্ষিণে, এখনো পানির তলে। ছয়-সাত বচ্ছর আগে ঐখানে চর আছিল্।

BanglaBook.org

নিজেগ জাগার নাম-নিশান নাই, এখন আমার চরের বন্দোবস্ত দিছে জঙ্গুরুল্লারে। জমিদার আর ওর নায়েবের পেডের ঝুলি বাইর করন দরকার। যত কাইজ্যা-ফ্যাসাদের মূলে এই জানোয়ারের পয়দারা।'

মনের আক্রোশ মনেই চাপা দিয়ে এরফান মাতব্বর জঙ্গুরুল্লার হামলা প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একবারও হানা দেয়ার চেষ্টা করেনি বিপক্ষ দল। দিন দশেক আগে একবার, দিন দুই আগে আরো একবার রাত দুপুরে হৈ-চৈ করে উঠেছিল পাহারারত চাকরিয়ারা, 'ঐ আইতে আছে, আউগ্‌গারে, আউগ্‌গা...আউগ্‌গা...'

মার-মার করে এগিয়ে গিয়েছিল দলের সবাই। ফজল নদীর কিনারায় গিয়ে পাহারাওলাদের কাছে শোনে—অনেকগুলো নৌকা এদিকে আসছিল। এদিকের হাঁক-ডাক কুদা-কুদি শুনে ভেগে গেছে।

ফজল টর্চের আলো ফেলে।

চাকরিয়াদের একজন বলে, 'এহন কি আর দেহা যাইব ? এতক্ষণে চইলা গেছে কোন মুল্লুকে!'

মাতব্বর পুরানো ঘাগু। সে জানে, এ সব কিছু নয়। চাকরিয়াদের চাকরি বজায় রাখার ফন্দি আর কি। কিন্তু জেনেও সে বলে না এ কথা কাউকে। বললে শেষে হয়তো যেদিন সত্যি সত্যি বাঘ আসবে সেদিন রাখালকে বাঁচাবার জন্য আর এগিয়ে আসবে না কেউ।

হুড়মুড় করে চলে যাচ্ছে টাকা। প্রায় শ'খানেক টাকা খরচ হয় রোজ। দিন যত যাচ্ছে, তহবিলের টাকাও কমে আসছে তত। আর এ ভাবে খরচ করা উচিত নয়, ভাবে এরফান মাতব্বর। আলেফ সরদার ও মেঘু পালোয়ানের সাথে পরামর্শ করে সে দুই দল থেকে বেছে মাত্র দশজন রেখে বাকি সবাইকে বিদেয় করে দেয়। আলেফ ও মেঘুর *'রোজানা'* দুটাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয় তিন টাকা।

BanglaBook.org

॥ বারো ॥

পান্‌সি তৈরি শেষ হয়েছে। ওটায় গাবও লাগানো হয়েছে তিন পোঁচ। এখন পানিতে ভাসিয়ে এতে পাটাতন বসাতে হবে, ছই লাগাতে হবে।

বুধবার জোহরের নামাজ পড়ে নৌকা ভাসানো হবে। শুভ দিন-ক্ষণ ঠিক করে রেখেছে এরফান মাতব্বর। কিন্তু বুধবার আসার তিন দিন আগেই তার জ্বর হয়। বাড়ি গিয়ে সে বিছানা নেয়।

শুভ দিন-ক্ষণ যখন ধার্য করা হয়েছে তখন ঐ দিন ঐ ক্ষণেই নৌকা ভাসানো হবে—ফজলকে খবর পাঠায় এরফান মাতব্বর। গাবুর একাব্বর খবরের সাথে নিয়ে আসে তিনটে ধামা ভরে খই আর সের কয়েক বাতাসা।

পাহারারত কয়েকজন ছাড়া আর সবাই জমায়েত হয়েছে নৌকা ঠেলবার জন্য।

নৌকার বুকের সামনে মাটিতে পাতালি করে রাখা হয়েছে চারখণ্ড কলাগাছ। একবার কলাগাছের ওপর চড়িয়ে দিতে পারলে নৌকাটা সহজেই গড়িয়ে নেয়া যাবে নদীর দিকে। গায়ে গায়ে মেশামেশি হয়ে নৌকা ধরেছে অনেকে। সবার ধরবার মতো জায়গা নেই। ফজল মাথার ওপর রুমাল নেড়ে হাঁক দেয়, 'জো-র আ...ছে...ে...ে...?'

সকলে 'আ....ছে...ে...ে...।'

ফজল : 'এই জোর থাকতে যে জোর না দিব তার জোর নিব ট্যাংরা মাছে ...ে ...ে ... হেঁইও...'

সকলে 'হেঁইও।'

ফজল : 'মারুক ঠেলা।'

সকলে 'হেঁইয়ো।'

ফজল : 'মারুক ঠেলা।'

সকলে 'হেঁইও...ও...ও'

ফজল 'অ্যাই কলাগাছ ফ্যাল্ সামনে...ে...ে মারো ঠেলারে...ে...ে...

সকলে 'হেঁইও, নামছে, নামছে নামছেরে—হেঁইও।'

নৌকা নেমে গেছে নদীতে। ফজল ও আরো কয়েকজন বসেছে নৌকায়। পাঁচখানা বৈঠা এগিয়ে দেয় একাব্বর।

সকলে চিলিবিলি করে খই আর বাতাসা ভরে নিজ নিজ গামছায়। একটা ধামায় করে কিছু খই-বাতাসা তুলে দেয়া হয় পানসিতে।

ফজল হাল ধরেছে। চারজন টানছে বৈঠা। নতুন পানসি তরতর করে চলছে পানি কেটে। কিনারায় দাঁড়িয়ে খই-বাতাসা খাচ্ছে সবাই, আর চেয়ে দেখছে নতুন নৌকার চলন-দোলন। গড়নে কোনো খুঁত আছে কিনা তাও দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

'ও মিয়ারা ?'

ডাক শুনে বাঁ দিকে মাথা ঘোরায় সবাই। উত্তর দিক থেকে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে আসছে একজন অপরিচিত লোক।

'কি কও মিয়া ? দৌড়াইতেছ ক্যান ?' একজন জিজ্ঞেস করে।

'দারোগা-পুলিস আইতাছে।' লোকটি বলে।

'অ্যাঁ, দারোগা-পুলিস! কই ?'

ভীত ও বিস্মিত প্রশ্ন সকলের। কারোটা উচ্চারিত হয়, কারোটা ভয়ে লুকিয়ে থাকে মুখের গহ্বরে।

'ঐ চাইয়া দ্যাহো।'

সবাই উত্তর দিকে তাকায়। সত্যি থানার নৌকা। আরো দুটি নৌকা আসছে ওটার পেছনে পেছনে।

লোকটিকে ছুটে আসতে দেখেই পাড়ের দিকে পানসি ঘুরিয়েছিল ফজল। তাড়াতাড়ি বৈঠা মেরে ফিরে আসে সে। নৌকার থেকে লাফ দিয়ে নেমেই জিজ্ঞেস করে, 'কি ও, কি—কি ?'

'দারোগা-পুলিস আইতাছে, ঐ দ্যাহো চাইয়া।'

একই সঙ্গে অনেকগুলো সন্ত্রস্ত কণ্ঠের কোলাহলে শঙ্কিত হয় ফজল। সে থানার নৌকার দিকে চেয়ে অপরিচিত লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, 'কিয়ের লেইগ্যা আইতে আছে ?'

'কাইল বোলে ডাকাতি অইছে কোনখানে ?'

'হ অইছে এই চরের পশ্চিম দিগে।'

গত রাত্রে এশার নামাজের পর ফজল ও তার মাছ ধরার সঙ্গীরা বেড়ের মাছ ধরতে গিয়েছিল। চাকরিয়াদের খাওয়াবার জন্যই শুধু পৌষ মাসের হাড়-কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে মাছ ধরতে যেতে হয় আজকাল। ভাঁটার সময় তিরতিরে পানির মধ্যে আছাড়-পাছাড় খেয়ে মাছ ধরছিল তারা। এমন সময় শোনা যায় ডাক-চিৎকার, 'আমারে মাইর‍্যা ফালাইছে

BanglaBook.org

রে। ডাকাইত—ডাকাইত।' পরে জানা যায় পুব্যের চরের এক গেরস্ত পাট বিক্রি করে লৌহজং থেকে বাড়ি ফিরছিল নৌকায়। একদল ডাকাত তাকে মারধর করে তার পাট-বেচা পাঁচশ' টাকা নিয়ে গেছে।

অপরিচিত লোকটি বলে, 'ঐ ডাকাতির আসামি ধরতে আইতে আছে।'

'আসামি! আসামির খোঁজ পাইছে?' ফজল জিজ্ঞেস করে।

'হ আপনের নামও আছে। আর কদম শিকারি কার নাম? আরো চৌদ্দ-পনেরো জন।'

ফজল স্তব্ধ, বিমূঢ়। চোখে তার শূন্য দৃষ্টি।

মেহের মুনশি লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে ভাই? কই হোন্‌ছ এই কথা?'

'আরে মিয়া আমার বাড়ি বাঁশগাও। ফজল মিয়া তো চিনে না। ওনার বাপ চিনে। তার লগে আমার বাপের গলায় গলায় খাতির আছিল। আইজ চুরির ইজাহার দিতে গেছিলাম থানায়। ফজল মিয়ারে আসামি দেওনের কথা হুইন্যা চিল-সত্বর আইছি দারোগার নাওরে পিছনে ফালাইয়া।'

সংবিৎ ফিরে পেতেই ফজল দেখে তার লোকজন এমন কি চাকরিয়ারা পর্যন্ত ভেগে যাচ্ছে। কেউ ভাওর ঘরের দিকে ছুটছে। কেউ ছুটছে কিনারায় বাঁধা ডিঙিগুলোর দিকে।

রমিজ মিরধা বলে, 'কি মিয়া খাড়াইয়া রইছ ক্যাঁ? ঐ দ্যাহো আইয়া পড়ল।'

সে এক রকম ঠেলে নিয়ে চলে ফজলকে।—'শিগ্‌গির নায় ওড।'

ভাওর ঘর থেকে হাতিয়ার, বিছানাপত্র নিয়ে দৌড়ে আসে চাকরিয়াদের কেউ কেউ। ফজলের আগেই তারা নতুন পানসিটায় চড়ে বসে।

ফজল বলে, 'তোমরা ক্যান পলাইতেছ? তোমাগ তো ধরতে আসে না।'

'তোমরা যেমুন পলাইতে শুরু করছ, মনে অয় তোমরাই ডাকাতি করছ।' মেহের মুনশি বলে।

'আমরা ডাকাতি করছি, কয় কোন হুমুন্দির পুত।' ঝাঁঝি মেরে ওঠে আলেফ সরদার।

'এই চাকরা, মোখ্ সামলাইয়া কথা কইস।'

'দ্যাখ্, মোখ্ দিয়া না, এই শড়কি দিয়া কইমু।' আলেফ শড়কি উঁচু করে।

ফজল ধমকি দেয়, 'এইডা কি শুরু করলেন আপনেরা।'

'আরে আইয়া পড়ল! শিগগির ওড নায়।' রমিজ মিরধা তাড়া দেয়।

ফজল 'কেও বাকি নাইতো?'

জাবেদ লশকর 'আরে না—না। ঐ চাইয়া দ্যাহ্, জমিরদ্দির নায় ওঠছে দশ-বারোজন আর ঐ যে ধলাইর নাও।'

মেঘু পালোয়ান 'মিয়ারা তোমরা পুলিসের লগে দোস্তালি কর। আমরা নাও ছাইড়্যা দিলাম।'

ফজল ও বাকি আর সবাই পানসিতে ওঠে। পাঁচ বৈঠার টানে ছুটে চলে পানসি।

দূরে মান্দ্রার খাঁড়ির মুখে জড় হয় সব ক'টা নৌকা। গুনতি করে দেখা যায় সবাই পালাতে পেরেছে।

লালুর বাপ বলে, 'পুলিস আইজ একটা ঠক খাইব। একটা পোনাও পাইব না চরে।'

একাব্বর ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। পুলিসের কথা শুনেই নৌকার ডওরার মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আল্লা-আল্লা করছিল সে। এতক্ষণে তার প্রাণে পানি আসে। সে বলে, 'নাওডা আরো দূরে লইয়া যাও। পুলিস বন্দুক ছাইড়্যা দিব।'

BanglaBook.org

হো-হো হেসে ওঠে সবাই।

ফজল বলে, 'ব্যাডা কেমন নিমকহারাম। আমরা ভালোরে বুইল্যা আউগ্‌গাইয়া গেলাম। আর আমাগ দিল আসামি!'

মেঘু পালোয়ান : 'ঐ যে মাইনষে কয় না, উপকাইর‍্যারে বাঘে খায়।'

মেহের মুনশি 'আমার মনে অয় কেও পরামিশ দিয়া আমাগ নাম লাগাইয়া দিছে। না অইলে ঐ অচিনা ব্যাডায় নাম পাইল কই ?'

আলেফ সরদার 'দুশমনের কি আকাল আছে ? তোমাগ চরের কাছে ডাকাতি অইছে, তাই সন্দ করছে, তোমরা ছাড়া আর কে করব এই কাম।'

ফজল 'আমাগ না অয় সন্দ করছে, আমরা পালাইছি। কিন্তু আপনেরা ক্যান্ পলাইছেন চর খালি থুইয়া ?'

আলেফ 'মিয়া, তোমার একগাছ চুলও পাকে নাই। তাই বোঝতে পার না। দারোগা যহন জিগাইত—ও মিয়া তোমার বাড়ি কই ? তহন কি মিছা কথা কইতে পারতাম ? ট্যাংরামারির কথা হুইন্যা এক্কেরে তক্ষণ তক্ষণ মাজায় দড়ি লাগাইত। কইত এত দূর তন কি করতে আইছ এইখানে ? তোমরাই ডাকাতি করছ।'

নৌকার সবাই সায় দেয় তার কথায়। ফজলকেও মেনে নিতে হয় তার যুক্তি।

শীতকালের বেলা তাড়াতাড়ি পালায় শীতের তাড়া খেয়ে। দারোগা-পুলিশ চর থেকে চলে যায়। তাদের নৌকা দৃষ্টির আড়াল হতেই মান্দ্রার খাঁড়ি থেকে বেরোয় সবক'টি নৌকা।

মেহের মুনশি বলে, 'আস্তে আস্তে চালাও। আন্ধার অউক।'

'চইল্যাতো গেছে। আবার আস্তে আস্তে ক্যান ?' মেঘু পালোয়ান বলে। 'দুফরের খাওনডা মাইর গেছে। জলদি চালাও।'

'হ জলদি চালাও।' আলেফ সরদার বলে। 'ব্যাটাগুর মইদ্যে শোল মাছের পোনা কিলবিলাইতে আছে।'

তবু ধীরে ধীরে চলছে নৌকা। চরের কাছে পৌঁছতে সন্ধ্যা উতরে যায়।

'এই ক্যাডারে ? আর আউগ্‌গাইস্ না, খবরদার!'

'খাইছেরে! সব্বনাশতো অইয়া গেছে!'

'হায় আল্লা, জঙ্গুরুল্লা চর দখল কইর‍্যা ফালাইছে।'

ফজল ও তার লোকজন হতভম্ভ। তাদের নৌকা থেমে গেছে। পানিতে টুপটাপ পড়ছে কিছু। গুলেল বাঁশের গুলি বুঝতে পারে তারা। দু-একটি গুলি তাদের গায়েও এসে লেগেছে।

আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে ফজল হাঁক দেয়, 'কারারে তোরা ? ভাইগ্যা যা ভালো থাকতে। নইলে জবাই কইর‍্যা ফালাইমু।'

'আইয়া দ্যা-খ্ কে কারে জবাই করে।'

তারপর দুই দলে চলতে থাকে অশ্রাব্য গালাগাল।

ফজল ও মেহের মুনশি জিজ্ঞেস করে আলেফ ও মেঘুকে, 'কি মিয়ারা, পারবানি লড়তে ?'

'লড়তে পারমু না ক্যান্। কিন্তুক এই রাইতের আন্ধারে কে দুশমন কে আপন চিনা যাইব না। আউলাপাতালি লড়াই করতে গিয়া খামাখা জান খোয়াইতে অইব।'

একজন লাঠিয়াল 'আমার ঢাল-শড়কি আনতে পারি নাই।'

মেঘু 'অনেকের কাছেই আতিয়ার নাই। আতিয়ার থুইয়া পলাইছে আহাম্মকরা।'

BanglaBook.org

জাবেদ লশকর 'তয়তো ওগো মজাই। আমাগ শড়কি দিয়াই আমাগ পেডের ঝুলি বাইর করতে পারব।'

প্রত্যেকেই কাঁথা-বালিশ, ঢাল-কাতরা, লাঠি-শড়কি, মাছ ধরার সরঞ্জাম ইত্যাদি কিছু না কিছু হারিয়ে হায়-আফসোস করতে থাকে।

মেহের মুনশি বলে, 'জঙ্গুরুল্লাতো জবর ফেরেববাজ। দ্যাখছনি ক্যামনে ডাকাতি মামলা দিয়া আমাগ ছাপ্পরছাড়া কইর‍্যা দিল!'

'হায় হায়রে! এত কষ্ট কইর‍্যা ধান রুইছি।' লালুর বাপ বলে।

মেঘু পালোয়ান 'জঙ্গুরুল্লা কি মরদের মতো কাম করছে নি? হিম্মত থাকলে আইত সামনাসামনি।'

জাবেদ : 'আহ্-হারে কতগুলা জমির ধান। এত কষ্ট কইর‍্যা—'

আলেফ : 'আর হায়-হুতাশ কইর‍্যা কি অইব? চলো, মাতবরের কাছে যাই। দেহি উনি কি করতে বুদ্ধি দ্যান্।'

রমিজ মিরধা 'কাইল রাইত পোয়াইলে আহন লাগব। কাইল যদি ওগ তাড়াইতে না পারো তয় ধানের আশা মাডি দিয়া থোও।'

ফজল 'দেহি, বা'জান কি করতে কয়।'

নতুন পানসি এরফান মাতব্বরের বাড়ির দিকে রওনা হয়। তার পেছনে সারি বেঁধে চলে ছোট-বড় বাইশখানা ডিঙি।

॥ তেরো ॥

লাঠালাঠি হাঙ্গামা ছাড়াই খুনের চর দখল হয়েছে। এত সহজে চরটা দখল করতে পারবে, ভাবতে পারেনি জঙ্গুরুল্লা। সে মনে করেছিল—বিপক্ষের কিছু লোক আর চাকরিয়ারা অন্তত থাকবে চরে। তারা মুখোমুখি হবে তার লাঠিয়ালদের, ছোটখাট মারামারি হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। পুলিসের ভয়ে ওদের সবাই ছুটছাট পালিয়েছিল চর খালি রেখে।

চর দখলের পরের দিন ভোরবেলা জঙ্গুরুল্লার পানসি এসে ভিড়ে খুনের চরের ঘোঁজায়। পানসি দেখে লোকজন ভিড় করে এসে দাঁড়ায় পানসির কাছে। জঙ্গুরুল্লা রুমিটুপি মাথায় দিয়ে শালটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে খাস খোপ থেকে বেরোয়। তার পেছনে বেরোয় তার দুই ছেলে হরমুজ ও জহির।

'আসসালামালেকুম।' এক সাথে সবাই সালাম দেয় জঙ্গুরুল্লাকে।

'ওয়ালাইকুম সালাম।' ফরমাশ দিয়ে তৈরি তেরো নম্বরি জুতো-জোড়া পায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে জঙ্গুরুল্লা সালামের জবাব দেয়। জহিরের হাত থেকে রূপার মুঠিবাঁধানো বেতের লাঠিটা নিয়ে সে দাঁড়ায় নৌকার মাথির ওপর।

'মজিদ খালাসি কই হে?'

'এইতো হুজুর।'

'আমিও আছি হুজুর।' দবির গোরাপি বলে।

'চলো, চরটা আগে দেইখ্যা লই।'

'চলেন হুজুর।' মজিদ খালাসি বলে।

জঙ্গুরুল্লা চরের মাটিতে নামে। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় মজিদ খালাসি ও দবির গোরাপি।

BanglaBook.org

জঙ্গুরুল্লা থপথপ করে পা ফেলে এগিয়ে যায় বুক টান করে, মাথা উঁচু করে। তার চলনে-বলনে দিগ্বিজয়ীর দৃপ্ত ভঙ্গি।

চলতে চলতে চরটার চারদিকে চোখ বুলায় জঙ্গুরুল্লা। মাঝখানের কিছু জায়গা বাদ দিয়ে সারাটা চরেই লাগানো হয়েছে বোরো ধান। ধানগাছের গোছা পেখম ধরেছে বেশ। গাছের মাজা মুটিয়ে উঠেছে। কিছুদিনের মধ্যেই শিষ বেরুবে।

'কেমুন মিয়ারা! তোমরাতো চর দখলের লেইগ্যা হামতাম শুরু করছিলা।' চলতে চলতে বলে জঙ্গুরুল্লা। 'অত ত্বরাহুড়া করলে এমুন বাহারিয়া ধান পাইতা কই ? আমি তখন কইছিলাম না, ওরা ধান-পান লাগাইয়া ঠিকঠাক করুক, আমরা তৈয়ার ফসল ঘরে উডাইমু।'

'হ, আল্লায় করলে তৈয়ার ফসল ঘরে উডান যাইব।' দবির গোরাপি বলে।

'খুব মজা, না ? ধান বোনে হাইল্যা, প্যাট ভরে বাইল্যা।' মনে মনে হাসে জঙ্গুরুল্লা।

'আপনে জবর একখান ভোজবাজির খেইল দ্যাহাইছেন।' বলে মজিদ খালাসি।

'হ, এরই নাম ভোজবাজির খেইল, আক্কেলের খেইল। দ্যাখলা তো আমার আক্কেল দিয়া ওগ কেমুন বেয়াক্কেল বানাইয়া দিছি।' জঙ্গুরুল্লার চোখে-মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি।

'হ, ওরা এক্কেরে বেয়াক্কেল অইয়া গেছে।'

মাঘ মাস। উত্তুরে বাতাসে ঢেউয়ের আলোড়ন তোলে ধান খেতে। জঙ্গুরুল্লা শালটার এক প্রান্ত গলায় পেঁচিয়ে নেয়। বলে, 'জবর শীত পড়ছে তো। ও মজিদ, বাইরে হোগলা বিছাইয়া দ্যাও। রউদে বইয়া তোমাগ লগে কথা কইমু।'

চরের চারদিকটা ঘুরে ফিরে দেখে তারা এরফান মাতব্বরের তৈরি ভাওর ঘরের পুবপাশে এসে দাঁড়ায়।

মজিদ খালাসি ঝুপড়ি থেকে হোগলা ও বিছানার চাদর এনে মাটিতে বিছিয়ে দেয়। জুতো ছেড়ে জঙ্গুরুল্লা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে।

'আর লোকজন কই ?' জিজ্ঞেস করে জঙ্গুরুল্লা।

'বেড়ে মাছ ধরতে গেছে।'

'বেড় দিছে! বানা পাইল কই ?'

'মাতব্বরের কোলশরিকরা ফালাইয়া গেছে।' দবির গোরাপি বলে।

'আইচ্ছা! আর কি কি ফালাইয়া গেছে ?'

'ঢাল-কাতরা, লাডি-শরকি, ক্যাথা-বালিশ, থালা-বাসন, তিনডা টচ লাইট।'

'ঝাঁকিজাল, টানাজাল, মইয়া জাল, ইলশা জাল।' একজন কোলশরিক দবির গোরাপির অসম্পূর্ণ তালিকা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে বলে।

'আরো অনেক কিছু—চাঁই, দোয়াইর, আটি, বইচনা, খাদইন, পারন।' বলে আর একজন কোলশরিক।

'এইডারে কয় বুদ্ধির খেইল, বোঝলা ? আক্কেলের খেইল।' জঙ্গুরুল্লা আবার তার নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করে। 'দ্যাখলাতো আমার আক্কেলের ঠেলায় ওগ আক্কেল গুডুম।'

'হ, আপনের বুদ্ধির লগে কি ওরা কুলাইতে পারে ? আপনের বাঁইয়া পায়ের বুদ্ধিও ওগ নাই।' বলে মজিদ খালাসি।

পায়েরও আবার বুদ্ধি থাকে! মনে মনে খুশি হয় জঙ্গুরুল্লা। সে আড়চোখে তাকায় তার নিন্দিত পা দুটোর দিকে।

'বেড়ে মাছ পাওয়া যায় ?' জিজ্ঞেস করে জঙ্গুরুল্লা।

BanglaBook.org

'আইজই বেড় পাতছে। কিছু তো পাইবই।' দবির গোরাপি বলে।

'ওরা চাউল-ডাউল, তেল-মরিচ ফালাইয়া গেছে না?'

'হ কিছু ফালাইয়া গেছে। আমাগ বেবাকের তিন-চারদিন চইল্যা যাইব।'

'শোন, ভাটাতো শুরু অইয়া গেছে। ওরা মাছ মাইর‍্যা আসুক। বেবাক মানুষ একখানে অইলে কথা কইমু তোমাগ লগে। এক কাম করো, চাউল-ডাইল তো আছেই। বেড়ে মাছও পাওয়া যাইব। রান্দনের আয়োজন কর। আইজ বেবাক মানুষ একখানে বইস্যা আমার লগে খাইব।'

'হ, আয়োজন করতে আছি।' মজিদ খালাসি বলে।

'শোন, বেড়ের মাছ ধরতে গিয়ে ধানেরে পাড়াইয়া-চডাইয়া যেন বরবাদ না করে। তোমরা গিয়া হুশিয়ার কইর‍্যা দিয়া আসো।'

'হ যাই।'

মজিদ খালাসি চলে যায়।

'চরের পাহারায় কারা আছে?'

'চাকইর‍্যারা আছে। আর যারা বেড়ে মাছ ধরতে গেছে তারাও নজর রাখব।' দবির গোরাপি বলে।

'ওরা আর আইতে সাহস করব না। কি মনে অয় তোমাগ, আইব ওরা?'

'ওরা আইব ক্যামনে? কি লইয়া আইব? ওগ বেবাক আতিয়ার তো আমাগো দখলে।'

'হ, আতিয়ার বানাইয়া তৈয়ার অইতে বহুত দেরি। যহন আইব, আইয়া দ্যাখব রাক্‌কইস্যা গাঙ চরডারে খাবলা দিয়া লইয়া গেছে।'

সবাই হেসে ওঠে।

হঠাৎ হাঁক ছাড়ে জঙ্গুরুল্লা, 'মাঝিমাল্লাগুলা গেল কই? হারামজাদারা এতক্ষণের মইদ্যে এক ছুলুম তামুক দিয়া গেল না। অই কেরা, অ ফেরু—'

দবির গোরাপি উঠে পানসির দিকে দৌড় দেয়।

জঙ্গুরুল্লা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'থাউক তোমার যাওনের দরকার নাই। আমিই নৌকায় গিয়া বসি। বেড়ে কি মাছ পাও আমারে দ্যাখ্যাইয়া নিও।'

জঙ্গুরুল্লা নৌকায় উঠে ছই-এর বাইরে পাটাতনের ওপর বসে। মাঝি কেরামত ফরসি হুঁকোয় তামাক সাজিয়ে দীর্ঘ নলটা এগিয়ে দেয় তার দিকে। সে নলে মুখ দিয়ে টানে গুড়ুক—গুড়ুক।

দবির গোরাপি, হরমুজ, জহির ও আরো কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল পাড়ে।

'ও জহির, ও হরমুজ।'

'জ্বী।'

'তোরা নৌকারতন শিকল নিয়া যা। দবিররে লইয়া চরটার মাপ-জোখ নে।'

জহির নৌকা থেকে জমি মাপার শিকল নিয়ে নামে।

জঙ্গুরুল্লা আবার বলে, 'ওরা কেম্বায় জমি ভাগ করছিল, জানোনি দবির?'

'হ, চরডারে দুই ভাগ করছে পয়লা। উত্তরে একভাগ আর দক্ষিণে একভাগ। হেরপর আট আতি নল দিয়া মাইপ্যা ভাগ করছিল।'

'ঠিক আছে, আমরাও এই নলের মাপেই ভাগ করমু। ওরা যেই আইল বানছিল সেই আইল ভাঙ্গনের দরকার নাই। শিকল দিয়া নলের মাপ ক্যাম্বায় দিবা, জানোনি?'

BanglaBook.org

'জানি।' হরমুজ বলে। 'আঠারো লিঙ্কে আট হাত, মানে একনল।'

'ঠিক আছে তোরা যা। দুফরে খাওনের পর জমি ভাগ-বাটারার কাম করণ যাইব।'

পুবদিক থেকে স্টিমার আসছে। এ সময়ে খাটো চোঙার জাহাজ—দেখেই জঙ্গুরুল্লা বুঝতে পারে এটা কোন লাইনের জাহাজ। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ যাচ্ছে চাটগাঁ মেল। আবার পশ্চিম দিক থেকেও আসছে একটা লম্বা চোঙার স্টিমার। এটা নিয়মিত কোনো যাত্রীজাহাজ নয়—জঙ্গুরুল্লা বুঝতে পারে।

কোনো একটার থেকে পানি মাপা হচ্ছে। দূর থেকে তারই ঘোষণার সুর অস্পষ্ট ভেসে আসছে কিছুক্ষণ পর পর—'দুই বাম মিলে-ে-ে-ে—না—া—া—া।'

'কেরা, মজবুত কইর‍্যা নাও বাইন্দা রাখ। জবর ঢেউ ওঠব। দুই জাহাজের ঢেউ।'

কেরামত পানসিটাকে কিনারা থেকে কিছুদূর সরিয়ে দুই মাথি বরাবর লগি পুঁতে রশিতে আয় রেখে শক্ত করে বাঁধে।

স্টিমার দুটো পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে।

'পুঁ—উ-ত।' মেয়েলি মিহি আওয়াজে দীর্ঘ সিটি বাজায় লম্বা জাহাজ।

'ফুঁ-উ-ত।' চাটগাঁ মেল সিটির জবাব দেয় পুরুষালি মোটা বাজখাঁই আওয়াজে।

'এই কেরা, জাহাজ দুইডা হুইসাল মারলো ক্যান্ জানস নি?'

'হ, আমরা যেমুন নাও বাওনের সুময় আর একটা নাও দ্যাখলে কই, হাপন ডাইন, জাহাজ দুইডাও হুইসাল দিয়া কইল হাপন বাম—যার যার বাঁও দিগ দিয়া যাও।'

'দুও ব্যাডা, পারলি না কইতে। লম্বা চুঙ্গা হুইসাল দিয়া কইল—সেলামালেকুম, কেমুন আছেন? খাডো চুঙ্গা জ'ব দিল—আলেকুম সালাম। ভালো আছি। তুমি কেমুন আছ?'

খুনের চরের উত্তর দিক দিয়ে স্টিমার দুটো একে অন্যের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। পূর্বগামী জাহাজটিতে বোঝাই হয়ে যাচ্ছে দেশী-বিদেশী সৈন্য।

'এত সৈন্য যায় কই, হুজুর।' কেরামত জিজ্ঞেস করে।

'যায় লড়াই করতে। আমরা যেমুন চর দখলের লেইগ্যা বিপক্ষের লগে মারামারি করি, ওরাও তেমুন যাইতেছে বিপক্ষের লগে লড়াই করতে।'

একটা চাঙারি তিনজনে ধরাধরি করে এনে পানসির মাথির ওপর রাখে। তিনজনই শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে। ওদের সাথে এসেছে মজিদ খালাসি। সে বলে, 'কিরে তোরা শীতে এমুন ঠকঠকাইতে আছস ক্যান? তোগ এত শীত! এই শীত লইয়া পানির মইদ্যে মাছ ধরলি ক্যামনে?'

'মাছ ধরনের কালে শীত টের পাই নাই।' বলে ওদের একজন। 'মাছ ধরনের নিশার মইদ্যে শীত আইতে পারে নাই। এহন বাতাস গায়ে লাগতেছে আর শীত করতেছে।'

জঙ্গুরুল্লা খাস কামরায় গিয়ে গড়াগড়ি দেয়ার আয়োজন করছিল, শব্দ পেয়ে বেরিয়ে আসে। মাছ দেখে সে খুশি হয় খুব। অনেক মাছ! কমসে কম পনেরো সের দুই ওজনের একটা কালিবাউস। আর সবই ছোট মাছ—ট্যাংরা, পুটি, পাবদা, চাপিলা, বাতাসি, বেলে, বাটা, চিংড়ি।

'বড় মাছ দুইডা এহনো জিন্দা আছে। দুইডারে দড়ি দিয়া বাইন্দা জিয়াইয়া রাখো।' জঙ্গুরুল্লা বলে। 'ঐ দুইডারে বাড়িতে লইয়া যাইমু। কইরে, কেরা, একটা দড়ি লইয়া আয়।'

BanglaBook.org

কেরামত মাছ দুটোর কানকোর ভেতর দিয়ে রশি ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে বার করে। তারপর গিঁট দিয়ে পানিতে ছেড়ে দেয়। রশির অন্য প্রান্ত বেঁধে রাখে পানসির ঘষনার সাথে।

'মাছগুলা লইয়া যাও।' জঙ্গুরুল্লা বলে। 'হাতে হাতে কুইট্যা রান্দনের আয়োজন করো।'

চাঙারিটা তিনজনে ধরাধরি করে নিয়ে যায়। ওদের তিনজনের একজন মজিদ খালাসির ছেলে ফজিলত।

কিছুদূর গিয়ে ফজিলত বলে, 'দ্যাখলেন নি ? এই মাঘ মাইস্যা শীতে ক্যাদার মইদ্যে কষ্ট কইর‍্যা মাছ ধরলাম আমরা। আর উনি বড় মাছ দুইডা থাবা মাইর‍্যা লইয়া গেল। মাইনষে কয় কথা মিছা না—শুইয়া রুই, বইস্যা কই, ক্যাদা ঘাইট্যা ভ্যাদা।'

'এই ফজিলত, চুপ কর।' মজিদ খালাসি ধমক দেয়। 'হুজুরের কানে গেলে বাঁশডলা দিয়া চ্যাগবেগা বানাইয়া দিব। তহন ভ্যাদা মাছও পাবি না।'

'আপনেরা মোখ বুইজ্যা থাকেন বুইল্যাইতো আপনেগ চ্যাগবেগা বানাইয়া রাখছে।'

'আরে আবার কথা কয়! চুপ কর হারামজাদা।'

একটু থেমে অন্য লোক দুটিকে অনুরোধ করে মজিদ খালাসি, 'ও মিয়াভাইরা, তোমরা কুন্তু এই নাদানের কথা হুজুরের কানে দিও না।'

চরধানকুনিয়া পদ্মার জঠরে বিলীন হয়ে গেছে গত বর্ষার সময়। সেখানে বাইশ ঘর কোলশরিকের বসত ছিল। চরভাঙা ভূমিহীন আর সব মানুষের মতোই তারা ভেসে যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। কয়েকজন বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসামে চলে গেছে। সেখানে জঙ্গল সাফ করে জমি আবাদ করলেই নাকি জমির মালিক হওয়া যায়। কয়েকজন পুরানো কাঁথা-কাপড়, হাঁড়ি-পাতিল, গাঁটরি-বোচকা বেঁধে পরিবারসহ চলে গেছে শহরে। চরভাঙা এ সব মানুষের দিনের আশ্রয় রাস্তার বট-পাকুড় গাছের তলা আর রাতের আশ্রয় অফিস-আদালতের বারান্দা। যাদের সামান্য কিছু জমা টাকা আছে তারা কষ্টে-সৃষ্টে ঝুপড়ি বেঁধে নেয় বস্তি এলাকায়। পুরুষেরা কুলি-মজুরের কাজ পেলে করে, না পেলে শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয় সারাদিন। বউ-ছেলে-মেয়ে চাকুরে-ব্যবসায়ীদের বাসা-বাড়িতে ঝি-চাকরের কাজ জুটিয়ে নেয়। এমনি করে খেয়ে না খেয়ে শাক-পাতা অখাদ্য-কুখাদ্য পেটে জামিন দিয়ে এরা দিন গোনে, রাত গোনে। এরা চাষের কাজে, ফসল উৎপাদনের কাজে আর কোনো দিন ফিরে আসে না চরের মাটিতে। ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে না আর। জমি পেতে হলে সেলামি দিতে হয়। কিন্তু সেলামির টাকা সারা জীবনেও কেউ যোগাড় করতে পারে না।

চরধানকুনিয়ার চারজন এখানে-সেখানে কাজের সন্ধানে ঘুরে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। তারা বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে পাতনা দিয়ে আছে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি। অন্যের জমিতে কামলা খেটে তারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন গুজরান করে।

জঙ্গুরুল্লা খুনের চর দখল করেছে—খবর পেয়েই তারা অনেক আশা নিয়ে এসেছে তার সাথে দেখা করতে। তারা পানসির কাছে ঘোঁজার কিনারায় চুপচাপ বসে থাকে, শুনতে থাকে জঙ্গুরুল্লার নাকডাকানি। সে খাস খোপে বিশ্রাম নিচ্ছে। তার বিশ্রামের কোনো রকম ব্যাঘাত না হয় তার জন্য মাঝি কেরামত এদের সাবধান করে দিয়েছে।

নাকডাকানি কখন শেষ হবে বুঝতে পারে না অপেক্ষমাণ লোকগুলো। তারা আশায় বুক বেঁধে ধৈর্য ধরে বসে থাকে।

BanglaBook.org

জঙ্গুরুল্লার ঘুম ভাঙে যখন পেটে টান লাগে। উঠেই সে রূপার চেনে বাঁধা পকেট ঘড়িটা বের করে দেখে।

'আরে, তিনটাতো বাইজ্যা গেছে! ইস্, জহুরের নামাজটা কাজা অইয়া গেল! ও কেরা রান্দনের কি অইল ?'

'এহনো অয় নাই।' কেরামত বলে। 'মনে অয় খাইল্যা ঘাসের আগুনে তেজ নাই।'

'তুই খবর দে। শীতকালের বেলা। আর এট্টু পরেই আন্ধার ঘনাইয়া আইব।'

'হ, খবর দিতে আছি। হুজুর, চাইরজন মানুষ আইছে আপনের লগে দ্যাহা করনের লেইগ্যা।'

'কারা ? কি ব্যাপারে আইছে ?'

'চিনি না। কি ব্যাপারে কিছু কয় নাই।'

জঙ্গুরুল্লা খাস খোপ থেকে বেরিয়ে গলুইয়ের ওপর দাঁড়ায়।

'আসলামালেকুম।' একসাথে সালাম দেয় চারজন।

'ওয়ালাইকুম সালাম। তোমরাই দ্যাখা করতে আইছ ?'

'হ হুজুর।' দলের মুরব্বি তোবারক বলে।

'কও, ত্বরাত্বরি কও। আমার অত সময় নাই।'

'হুজুর, আমাগ ধানকুনিয়ার চর রসাতল অইয়া গেছে। আমাগ আর কিছু নাই।'

'আমি কি করতে পারি, কও ?'

'আমাগ কিছু জমি দ্যান। আমাগ বাঁচনের একটা রাস্তা কইর‍্যা দ্যান।'

'দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের বাঁচনের রাস্তা কি আমার বানাইতে অইব ?'

হুজুর আমাগ বাঁচনের আর কোন পথ নাই। আমরা গেছিলাম কালামাডি।'

'কালামাটি মানে টাটানগর ?'

'হ, টাটানগর, বানপুর।'

'সেইখানে তো শুনছি বহুত মানুষ কামে ভর্তি করতেছে। লড়াইর সরঞ্জাম বানাইতে আছে।'

'হ, ভর্তি করতে আছে। হেই খবর পাইয়া গেছিলাম। কিন্তু সরদারগ, দালালগ দুইশ রুপিয়া না দিলে কোনো কামে ভর্তি অওয়ন যায় না।'

'দিয়া দিতা দুইশ রুপিয়া।'

'হুজুর দুইশ ট্যাহা কি গাছের গোডা ? আমরা গরিব মানুষ। পাইমু কই এত ট্যাহা ?'

'টাকা ছাড়া দুইন্যাই ফাঁকা। বোঝ্‌লা ? তোমরা ওইখানে টাকা দিতে পার নাই, আমার সেলামির টাকা দিবা কইতন ?'

'আস্তে আস্তে শোধ কইর‍্যা দিমু।'

'দুও ব্যাটারা। নগদ সেলামি দিয়া মাইনষে জমি পায় না। আর তোরা আইছস বাকিতে জমি নিতে। যা-যা অন্য কিছু কইর‍্যা খা গিয়া।'

'হুজুর।' তোবারকের কথার স্বরে আকুল আবেদন।

'আর প্যাঁচাল পাড়িস না তো। কইলামতো অন্য কিছু কইর‍্যা খা গিয়া।'

মজিদ খালাসি ও দবির গোরাপি এসে খবর দেয়, রান্না হয়ে গেছে। তাদের আসার পর লোক চারজন আর কিছু বলার সুযোগ পায় না।

BanglaBook.org

জঙ্গুরুল্লা একটুও দেরি না করে একেবারে খাবার জায়গায় গিয়ে বসে। খাবার জায়গা বাইরেই করা হয়েছে।

খাদিমদারির জন্য কয়েকজন বাদে সবাই যার যার থালা নিয়ে গামছা বিছিয়ে বসে।

খেতে খেতে আছরের নামাজও কাজা হয়ে যায়। সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে জঙ্গুরুল্লা। সে বলে, 'মাগরেবের নামাজের পর বৈঠক শুরু অইব।'

এরফান মাতব্বরের তৈরি ভাওরবাড়ির এক ঘরে হারিকেনের আলোয় বৈঠক বসে। বিশিষ্ট কয়েকজন কোলশরিক নিয়ে জঙ্গুরুল্লা দুই ছেলেসহ সেখানে বসে। বাকি সবাই মাথায় গামছা বেঁধে গায়ে চাদর জড়িয়ে উন্মুখ হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

'হরমুজ, চরটার মাপজোখ নিছস ?'

'হ, পুবে পশ্চিমে সাড়ে ছয়চল্লিশ চেইন, উত্তর দক্ষিণে উনিশ চেইন।'

'ওরা তো আটহাতি নল দিয়া মাইপ্যা ভাগ করছিল। কত নল অয় হিসাব করছস ?'

'হ করছি।' দবির গোরাপি বলে। 'ওরা পুবে পশ্চিমে মাঝ বরাবর দুই ভাগ করছিল চরডারে। উত্তর দিগে ঘোঁজা বাদ দিয়া দুইশ ছয়চল্লিশ নল আর দক্ষিণ দিগে দুইশ আটান্ন নল।'

'মোট কত অয় ?'

'পাঁচ শ' চার নল।'

'আমাগ কোলশরিক অইল সাতষট্টি। সব্বাইকে ছয় নল কইর‍্যা দিলে, কত নল লাগে ? কাগজ কলম লও, ও মজিদ।'

মজিদ খালাসি অঙ্ক কষে বলে, 'চারশ দুই নল।'

'ঠিক আছে, এম্বায়ই ভাগ করো। একশ দুই নলের হিসাব পরে অইব।'

পানসির মাল্লা ফেকু তামাক সাজিয়ে লম্বা নলটা এগিয়ে দেয় জঙ্গুরুল্লার দিকে। সকলের সামনে নিজের বাহাদুরি প্রকাশের স্পৃহা সে দমন করতে পারে না। বলে, 'এই মিয়ারা, বাইরে কারা আছ ? মন লাগাইয়া শোন। এরফান মাতবরের দলরে কেমুন চক্করটা দিলাম। কেমনে ছাপ্পরছাড়া কইর‍্যা দিলাম, হুঁহু—হুঁ। ওরা চাকইর‍্যা রাখছিল। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, রাখুক ওরা চাকইর‍্যা। দেখি, ওগ বেতন দিয়া, খাওন দিয়া এরফান মাতবরের মিরদিনা কয়দিন সোজা থাকে। ওগ টাকা পয়সার যখন ছেরাদ্দ অইয়া গেছে, সুতা যখন খতম, তখনি দিলাম একখান গোত্তা। ব্যস, বৌকাট্টা--া--া।'

সবাই হেসে ওঠে। দবির গোরাপি বলে, 'হুজুর কি ছোডকালে ঘুড্ডি উড়াইছেন নি ?'

'আরে, ছোডকালে ঘুড্ডি আবার কে না উড়ায়! শোন, তোমাগ পরামিশ মতন যদি তখন তখনি চর দখল করতে যাইতাম, তয় কি অইত ? খুনাখুনি অইত, মামলা-মকদ্দমা অইত। কিন্তুক এমন খেইল দ্যাখাইলাম, আমার আক্কেলের ঠেলায় ওগ আক্কেল গুড়ুম।'

আবার খিকখিক করে হেসে ওঠে সবাই। মজিদ খালাসি বলে, 'হু, আপনে যেই খেইল দ্যাহাইছেন, ওগ বেবাক গেছে—ট্যাহা-পয়সা, হাতিয়ার-সরঞ্জাম। আমাগও আর খুনাখুনি মামলা-মকদ্দমার ঝামেলায় পড়তে অইল না।'

'ওগ টাকা পয়সা বেবাক খতম। ওরা আর আইব ক্যামনে চর দখল করতে ?'

'হ, ওরা আর আইতে পারব না।' দবির গোরাপি বলে।

'আর দ্যাখো, তোমাগ বুদ্ধি মতন যদি তখনি চর দখলের হামতাম করতাম, তয় এমনু তৈয়ার ধান পাইতা কই ? কি মজা অ্যাঁ ? ধান বোনে হাইল্যা, পেট ভরে বাইল্যা।'

সবাই হি-হি, হো-হো করে হেসে উঠে।

BanglaBook.org

'এই বাইল্যার গুষ্টি, হাসনের কি অইল ? তৈয়ার ধান তো পাইতেছ। আমারে সেলামি কত কইর‍্যা দিবা ?'

'আপনেই ঠিক করেন।' মজিদ খালাসি বলে।

'নল পিছু পঞ্চাশ টাকা কইর‍্যা দিও।'

'পঞ্চাশ ট্যাহা খুব বেশি অইয়া যাইতেছে। এরফান মাতবর নিছিল পঁচিশ ট্যাহা কইর‍্যা। একজন কোলশরিক বলে।

'আরে! এরফান মাতবরের লগে আমার তুলনা, অ্যাঁ! ঐ পঁচিশ টাকার জমি আছে ? ঐ জমিতো গরবাদ! চাউলে পাতিলে তল! আমি পঞ্চাশ টাকা সেলামি নিয়া জমি দিমু। কারো বাপের সাধ্য নাই এই জমির কাছে আসে।'

সবার অনুরোধে শেষে নল পিছু চল্লিশ টাকা সেলামি নিতে রাজি হয় জঙ্গুরুল্লা।

বৈঠক শেষ করে উঠবার সময় জঙ্গুরুল্লা বলে, 'আমার ফন্দি-ফিকিরে তৈয়ার ধান পাওয়া গেছে। এই ধানের অর্ধেক আমার, মনে রাইখ্য মিয়ারা।'

কোলশরিকদের কেউ আপত্তি করে না।

মজিদ খালাসি হারিকেন নিয়ে আগে আগে চলে। তার পেছনে হাঁটে জঙ্গুরুল্লা ও তার দুই ছেলে। কোলশরিক ও তাদের জোয়ান ছেলেরা তাদের অনুসরণ করে দল বেঁধে।

'এতই রঙ্গেরই খেলা জান হায়রে মন,
এতই রঙ্গেরই খেলা জান।'

দোতারা বাজিয়ে গান গাইছে কেউ।

'গান গাইছে কেডা ও ?' জঙ্গুরুল্লা জিজ্ঞেস করে।

'কোনো ব্যাপারি নায়ের মাঝি না অয় মাল্লা অইব মনে অয়।' মজিদ খালাসি বলে।

'হ, অনেক পরদেশী নাও এই ঘোঁজায় পাড়া গাইড়্যা জিরায় তামাম রাইত।' দবির গোরাপি বলে।

'বানাইয়া আদম নবী'
বেহেশত কইলা রে খুবী,
গন্দম খাইতে মানা কেন রে,
গন্দম খাইতে মানা কেন ?
খাওয়াইয়া গন্দম দানা
ছাড়াইলা বেহেশ্‌তখানা ॥
কি কৌশলে সংসারেতে আন
হায়রে মন।
এতই রঙ্গেরই খেলা জান ॥
'মকরমরে কও দাগা কর,
আদমরে কও হুঁশিয়ার,
শত্রু তোমার জানিও শয়তান রে,
শত্রু তোমার জানিও শয়তান।
দাগা কর, নাহি পড়,
কে বুঝিবে খেলা তোর ॥

BanglaBook.org

এর ভেদ তুমি মাত্র জান
হায়রে মন।
এতই রঙ্গেরই খেলা জান ॥
'নমরুদ পাপীয়ে বল,
ইব্রাহিম অগ্নিতে ফেল
আগুনরে করহ বারণ রে,
আগুনরে করহ বারণ।
ইব্রাহিমকে দাও কোরবানি ॥
ছুরিরে নিষেধ করো পুনঃ
হায়রে মন।
এতই রঙ্গেরই খেলা জান ॥
'কেহ পাপী, কেহ ভক্ত
কেহ ফকির, কেহ তখ্‌ত,
খেলা তোমার না যায় বুঝন রে,
খেলা তোমার না যায় বুঝন।
কি বুঝিবে বেঙ্গু ভ্রান্ত,
তোমার খেলার নাহি অন্ত ॥
তোমারে না বোঝে অজ্ঞ জন
হায়রে মন।
এতই রঙ্গেরই খেলা জান ॥'

গানের কথা ও সুরে সবাই অভিভূত। বিমোহিত তাদের মন। যতক্ষণ গান চলছিল একটা কথাও কেউ বলেনি।

গান শেষ হলে দবির গোরাপি বলে, 'একটা মনের মতো গান হুনলাম।'

'হ গানডা খুব চমেৎকার।' অনেকেই বলাবলি করে।

সবাই পানসির কাছে এসে গিয়েছিল গান শেষ হওয়ার আগেই। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল। ঐ সময়ে জঙ্গুরুল্লার চোখ জোছনার আলোয় জরিপ করছিল ঘোঁজাটা। অনেক কয়টা বড় মালের নৌকা পাড়া গেড়ে আছে ঘোঁজায়।

'মজিদ, দেইখ্যা আস তো কয়ডা নৌকা আর নৌকায় কি মাল বোঝাই?'

জঙ্গুরুল্লা ছেলেদের নিয়ে পানসিতে ওঠে। মজিদ খালাসি আর দবির গোরাপি চলে যায় নৌকার খোঁজ খবর নিতে।

কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে এসে জঙ্গুরুল্লাকে জানায়—নৌকার সংখ্যা বারো। তিনটা চালের নৌকা—খুলনা থেকে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জে। একটায় ঝুনা নারকেল বরিশালের নলসিটি থেকে ঢাকা যাচ্ছে। একটায় পেঁয়াজ—যাচ্ছে কুষ্টিয়ার জগন্নাথপুর থেকে চাঁদপুর। একটায় আলু—যাচ্ছে কমলাঘাট থেকে ফরিদপুর। একটায় তেজপাতা—যাচ্ছে কমলাঘাট থেকে রাজবাড়ি। একটায় খেজুর গুড়—মাদারীপুর থেকে যাচ্ছে ঢাকা। চারটা নৌকা খালি। সেগুলো বিভিন্ন বন্দরে যাচ্ছে মাল কেনার জন্য।

'এই মজিদ, আমাগ জা'গায় নাও রাখছে। খাজনা আদায় করো, তোলা উডাও।' জঙ্গুরুল্লা নির্দেশ দেয়।

BanglaBook.org

'যদি না দিতে চায়।'

'দিতে না চাইলে পাড়া উডাইয়া চইল্যা যাইতে কও এইখানতন।'

মজিদ খালাসি ও দবির গোরাপি জঙ্গুরুল্লার নির্দেশ মতো তোলা উঠিয়ে চলে আসে কিছুক্ষণ পর। তিনটা নৌকা থেকে পাওয়া গেছে সের পাঁচেক চাল। অন্যগুলো থেকে পাওয়া গেছে একজোড়া নারকেল, সের দুই পেঁয়াজ, সের খানেক আলু, পোয়াটাক তেজপাতা আর মুছি খেজুরগুড় আটখান। সবগুলো এনে তারা পানসিতে তুলে দেয়। জঙ্গুরুল্লা খুশি হয়।

'রাইত অনেক অইছে। আর দেরি করণ যায় না।' জঙ্গুরুল্লা বলে। তারপর সে হাঁক দেয়, 'এই কেরা, এই ফেকু নাও ছাইড়্যা দে ত্বরাত্বরি।'

পাড়া উঠিয়ে পানসি ছেড়ে দেয় কেরামত।

খাস খোপে হারিকেন জ্বলছে। হরমুজ ও জহিরকে বলে জঙ্গুরুল্লা, 'নাও জিরানের এমুন সোন্দর একখান ঘোঁজা আশেপাশের কোনো চরে নাই।'

'হ, ঠিকই। নাও রাখনের লেইগ্যা জায়গাডা খুবই চমেৎকার।' হরমুজ বলে।

'আইতে আছে চৈত্র-বৈশাখ মাস। আসমানে তুফাইন্যা মেঘ দ্যাখলে বহুত নাও আইয়া পাড়া গাড়ব এই ঘোঁজায়।'

'হ, তহন অনেক নাও ঢুকব এই ঘোঁজায়।' বলে হুরমুজ।

'শোন্, আমার মস্তকে একখান বুদ্ধি খেলছে। এই ঘোঁজায় নাও রাখলেই খুঁটগাড়ি আদায় করন লাগব। তাতে আমাগ অনেক পয়সা আয় অইব।'

'খুঁটগাড়ি আদায় করলে যদি এইখানে নাও না রাখে?' বলে জহির।

'রাখব না ক্যান্? নাও যাতে অন্য জা'গায় না রাখে তার একটা ফিকিরও আমার মগজের মইদ্যে ঘুরতে আছে। তোরা রউজ্যারে খবর দিস। সে যেন্ কালই আমার লগে দ্যাখা করে।'

ভাটি পানি। তবুও দূরের পথ বলে বাড়ির ঘাটে পৌঁছতে পানসিটার অনেক সময় লাগে।

॥ চৌদ্দ ॥

এরফান মাতব্বরের জ্বর সেরে গিয়েছিল। লাঠি ভর দিয়ে সে হাঁটাচলাও করছিল একটু-আধটু। কিন্তু চর বেদখল হওয়ার কথা শুনেই সে আবার নেতিয়ে পড়েছে বিছানায়।

চর গেছে, চরের ফসল গেছে। খাজনা আর সেলামির এতগুলো টাকাও গেছে বরবাদ হয়ে। তাদের তৈরি ভাওর ঘরে তালেবর হয়ে বসে গেছে জঙ্গুরুল্লার দল। হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, কাঁথা-বালিশ, লড়াইর হাতিয়ার—অনেক কিছুই মুফতে পেয়ে গেছে তারা। এসবের ওপরে গেছে মান-ইজ্জত। এর জন্যই বেশি মুসড়ে পড়েছে এরফান মাতব্বর।

সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গালাগাল দেয় দলের লোকদের, 'হারামজাদারা, চর ছ্যাইড়া পলালি ক্যান্ তোরা? ডাকাতি মামলায় আর কয়জনরে ধরত?'

'ধরা পইড়্যা হেষে কি জেল খাটতামনি আমরা।' একজন কোলশরিক বলে।

'চাকইর‍্যা হারামাজাদারা পলাইল ক্যান্। ওই নিমকহারামগুলোরে খেদাইয়া দে।'

'ওগ খেদাইয়া দিমু! কিন্তুক আমরা যে চরদখল করতে চাই আবার।' রমিজ মিরধা বলে।

'উঁহু। পারবিনা, পারবি না।' কঁকাতে কঁকাতে মাতব্বর বলে। 'ঐ চাকইর‍্যা দিয়া কাম অইব না। আমি ভালো অইয়া লই।'

BanglaBook.org

'কিন্তুক বেশি দেরি অইলে ধানগুলাতে কাইট্যা লইয়া যাইব।'

'লইয়া গেলে আর কি করমু।'

জমিরদ্দি 'কি করমু! এতগুলা ট্যাহা দিছি আপনের সেলামি।'

এরফান 'সেলামি নিয়া জমি দিছি। হেই জমি রাখতে না পারলে কি আমার দোষ? আমিও তো নায়েবরে সেলামি দিছি।'

আহাদালী : 'আপনে কারে দিছেন, কি দিছেন, আমরা তার কি জানি?'

মেহের মুনশি 'অ্যাই তোরা বাইরে যা দেহি।'

মেহের মুনশি সবাইকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জমিরদ্দি 'ও মিয়া মুনশির পো, আমরা সেলামি দিছি ওনারে। আমরা ওনার কাছে জমি চাই।'

মেহের মুনশি : 'কি শুরু করলা তোমরা? মাতবরের পো-র শরীল ভালো নাই। তোমরা চুপ অও দেহি।'

জমিরদ্দি 'ক্যান্ চুপ অইমু? আমাগ সেলামির ট্যাহা ফিরত চাই।'

রমিজ মিরধা 'ক্যান ফিরত চাও। তোমারে, আমাগ বেবাকরে জমিতো দিছিলই। আমরাই তো রাখতে পারলাম না।'

আহাদালী : 'এমুন কাইজ্যার চরের জমির লেইগ্যা সেলামি নিল ক্যান্?'

মেহের মুনশি 'সেলামি না নিলে চাকইর‍্যা রাখত কি দিয়া। ওগ রোজগার দিতে, ওগ খাইয়াইতে কি কমগুলা ট্যাহা খরচ অইছে?'

রমিজ মিরধা 'তোমরা যার যার বাড়িত যাও। মাতবরের পো ভালো অইয়া উডুক, তারপর—'

মেহের মুনশি : 'হ, তারপর একটা কিছু করন যাইব। তোমরা যাও। খবরদার, রাইতের বেলা নিজের ঘরে শুইও না। পুলিস কিন্তু ধরতে আইব।'

সেদিনের মতো সবাই চলে যায়।

রোজই দু-চারজন কোলশরিক আসে এরমান মাতব্বরকে দেখতে। রুগী দেখতে এসেও তারা রুগীর বিছানার পাশে বসে ঘ্যানঘ্যানর করে। কেউ সেলামির টাকা ফেরত চায়। এরা অনেকেই ধারকর্জ করে সেলামির টাকা যোগাড় করেছিল। কেউ বুক থাপড়ে কাঁদে। ঘরে তাদের এক দানা খাবার নেই।

এদের সকলের অবস্থাই জানে মাতব্বর। নানা ঘাত-প্রতিঘাত সওয়া বুড়ো মন তার। সে মনে আবেগ-উচ্ছ্বাস বড় বেশি ঠাঁই পায় না। তবুও এদের দুরবস্থার কথা ভেবে ব্যথিত হয় সে। তার চোখ ছলছল করে ওঠে। কখনো বালিশের তলা থেকে পাঁচ-দশ টাকা তুলে ওদের হাতে দিয়ে বলে, 'নে, কারো কাছে কইস না। আর কিছুদিন সবুর কর। আমার ব্যারামডা সারুক। জঙ্গুরুল্লারে আমাবস্যা দ্যাহাইয়া ছাইড়্যা দিমু।'

কিন্তু মাতব্বরে ব্যারাম আর সারছে না। শরীরের ব্যারামের চেয়ে মনের ব্যারামেই সে বেশি কাহিল হয়ে পড়েছে। সে বিছানায়ই পড়ে থাকে রাতদিন। মাঝে মাঝে তার মুখ থেকে বেরোয় গালাগালের তুবড়ি। সে সময়ে রাগ ও ঘৃণায় বিকৃত হয় তার মুখ। কখনো উত্তেজনায় সে হাত-পা ছোড়ে, মাথা উঁচু করে বসতে চায়। তার গালাগালের পাত্র জমিদার, নায়েব, জঙ্গুরুল্লা, দারোগা-পুলিস, আরশেদ মোল্লা, এমন কি তার কোলশরিকরাও। তুবড়ির বারুদ পুড়ে শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ ধরে সে হাঁপায়। তারপর মরার মতো পড়ে থাকে। এ সময়ে একটু একটু করে বারুদ জমা হয়। তারপর আবার হঠাৎ তুবড়ি ছোটে।

BanglaBook.org

ফজল দিনের বেলা বাপের বিছানার পাশেই বসে থাকে ডাক্তারের ব্যবস্থামত ওষুধ-পথ্য দেয়। রাত্রে পুলিসের ভয়ে সে বাড়িতে ঘুমায় না, চলে যায় দূরের কোনো আত্মীয়বাড়ি।

একদিন আরশেদ মোল্লাকে গালাগাল দিতে দিতে মাতব্বরের রাগ গিয়ে পড়ে ফজলের ওপর। সে মুখ বিকৃত করে বলে, 'এই একটা ভ্যাদা মাছ। আমার ঘরে ক্যান্ এইডা পয়দা অইছিল—ক্যান্ অইছিল ? এত দিনের মধ্যে—আরে এতদিনের মইদ্যে পারল না আহ্—আহ্—পারল না নিজের পরিবার পোষ মানাইতে। 'যা, আইজই যা—আহ্-আহ্ বউ আনতে না পারলে—আমার বাড়িতে তোর জা'গা নাই—জা'গা নাই কইয়া দিলাম।'

বরুবিবি কাছেই ছিল। বলে, 'হ, আইজই যা। তোর হউর-হাউরিরে কইস ওনার ব্যারামের কথা। বুঝাইয়া কইস, বউমারে দ্যাহনের লেইগ্যা ওনার পরান ছটফট করতে আছে। ওনারাও তো মানুষ। ওনাগো অন্তরে কি আর দয়া-মায়া নাই ?'

আরশেদ মোল্লার অন্তরে সত্যিই বুঝি দয়া-মায়া নেই।

সেদিনই বিকেলবেলা ফজল শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। সাথে নিয়ে গিয়েছিল হাশমতকে।

ফজল কাছারি ঘরে বসে থাকে। হাশমত চলে যায় অন্দরে।

আরশেদ মোল্লাকে সালাম দিয়ে সে বলে, 'ফুফাজির সাংঘাতিক অসুখ, যখন-তখন অবস্থা।' মাতব্বরের অসুখের কথাটা একটু বাড়িয়ে বলবার জন্য শিখিয়ে দিয়েছিল ফজল।

আরশেদ মোল্লা শুধু 'হুঁ' বলে চেয়ে থাকে হাশমতের দিকে।

'ফুফাজি অস্থির অইয়া গেছে ভাবিসাবেরে দেহনের লেইগ্যা।'

'হুঁ।'

'বউমা-বউমা কইর‍্যা খালি কান্দে।'

'পরের মাইয়া দেহনের এত আহেঙ্কাত ক্যান্ ? নিজের বউ-মাইয়া-পোলা দেইখ্যা পরান জুড়াইতে পারে না ?'

'কী যেন কন্ তালুইজি। নিজের মাইয়াতো বিয়া দিলে চইল্যা যায় পরের বাড়ি। পুতের বউ থাকে নিজের বাড়ি, নিজের মাইয়ার মতন।'

'হ-হ দেখ্‌ছি, মাইয়ার মতন কইও না মিয়া, কও বান্দির মতন।'

'তালুইজি, ভাবিরে এহনই লইয়া যাইতে কইছে। আপনেরেও যাইতে কইছে। ফুফাজির অবস্থা খুব খারাপ। এইবার যে বাঁইচ্যা ওড্‌ব, মনে অয় না।'

আরশেদ মোল্লা কোনো কথা বলে না।

'কি কইলেন তালুইজি ?'

'উঁহু। আমার মাইয়া আর ঐ বাড়ি দিমু না। এতদিন বেচছে মাছ। এহন আবার ডাকাতি শুরু করছে।'

'ডাকাতি! ওইডাতো জঙ্গুরুল্লার কারসাজি। চর দখলের লেইগ্যা মিথ্যামিথ্যি ডাকাতি মামলা সাজাইছে।'

আরশেদ মোল্লা উঠে নদীর ঘাটের দিকে চলতে থাকে। অনুনয় বিনয় করতে করতে তার পেছনে চলে হাশমত। কিন্তু তার অনুরোধের কোনো উত্তরই দেয় না সে।

আরশেদ মোল্লা তার ডিঙি বেয়ে পুবদিকে চলে যায়।

হাশমত কাছারি ঘরে ফিরে আসে।

ফজল দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার চোখে।

BanglaBook.org

'উঁহু, কোনো কাম অইল না।' হাশমত বলে। 'এত কইর‍্যা কইলাম। কাকুতি-মিনতি করলাম। কোনো কথাই কানে নিল না। ব্যাডা এক্কেরে অমাইনষের পয়দা।'

'হ, আমি জানতাম, লাথির ঢেঁকি আঙুলের টোকায় ওড়্‌ব না।'

হাশমতের কানের কাছে মুখ নিয়ে সে আবার বলে, 'তুই চইল্যা যা। লালুগ বাড়িতে গিয়া থাক্। কাইল গেছে পূর্ণিমা। চান মাথার উপরে ওডনের আগেই নাও লইয়া আইয়া পড়বি। লালুরেও সঙ্গে আনিস।'

হাশমত চলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার কাছারি ঘরে চৌকির ওপর বসে আছে ফজল।

রূপজান জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে যায় তাকে। সে ঘরে গিয়ে হারিকেন ধরায়। ওটা দেলোয়ারের হাতে দিয়ে বলে, 'যা কাছারি ঘরে দিয়া আয়।'

'উঁহু, না—না—না। আমি যাইমু না।'

'ক্যান ?'

'ওরে মা-রে, ডাকাইত! আমার ডর করে।'

'দুও বোকা।'

'ও, তুমি হোন নাই ? ওরে আর আমি দুলাভাই কইমু না। ও বোলে মারু ডাকাইত। রামদা লইয়া ডাকাতি করে।'

রূপজানের চোখ ফেটে পানি আসতে চায়। সে-ও শুনেছে, ফজল ডাকাতি করে। তার বাবা কয়েকদিন আগে উঠানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলছিল, 'হোনছ রূপির মা, মাতবরের পোলাডা আর ইজ্জত রাখল না। মাছ-বেচা থুইয়া এইবার ডাকাতিতে নামছে। রামদা দ্যাহাইয়া মাইরপিট কইর‍্যা এক গিরস্তের পাঁচশ ট্যাহা লইয়া গেছে।'

রূপজান ধরা গলায় বলে, 'যা না দাদা, দিয়া আয়।'

'উঁহু, আমি পারমু না।'

রূপজান নিজেই শেষে কাছারি ঘরে যায়। হারিকেনটা চৌকির ওপর রেখেই সে চলে যাচ্ছিল। ফজল খপ করে তার আঁচল ধরে ফেলে। হাসিমুখে সে তাকায় রূপজানের দিকে। কিন্তু তার চোখে পানি দেখে ফজলের হাসি মিলিয়ে যায়। তার চোখও ঝাপসা হয়ে আসে।

কারো মুখ দিয়েই কোনো কথা বেরোয় না। দুজনে চেয়ে থাকে দুজনের মুখের দিকে। একজনের মনের পুঞ্জীভূত বেদনা বুঝতে চেষ্টা করে আর একজনের চোখ।

ফজল তাকে কাছে টানে। রূপজান হারিকেনটা নিবিয়ে দিয়ে মুখ লুকায় ফজলের বুকে।

'তুমি বোলে ডাকাইত ?' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে রূপজান।

'কে কইছে তোমারে ?' ফজল উত্তেজিত স্বরে বলে।

'দুনিয়ার মাইনষে কয়।'

'তুমিও কও ? তুমিও বিশ্বাস করো এই কথা ?'

'উঁহু।'

ফজল আরো নিবিড় করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। বলে, 'সব জঙ্গুরুল্লার কারসাজি। মিথ্যা মামলা সাজাইয়া আমাগ খুনের চর দখল কইর‍্যা লইয়া গেছে। আল্লার কসম, আমরা কেও ডাকাতি করি নাই।'

রূপজান একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'শোন রূপজান, ডাকাতি কোনো দিন করি নাই। তবে আইজ কিন্তু ডাকাতি করমু।'

রূপজান কোনো কথা বলে না।

BanglaBook.org

ফজল আবার বলে, 'শোন, বাড়ির সবাই ঘুমাইয়া পড়লে তুমি আমার কাছে আইসা পড়বা।'

'উঁহু, আমি আইতে পারমু না।'

'ক্যান ?'

'সোন্দর সোন্দর কাঁডা দিয়া যে খোঁপা বান্দে, তারে যেন্ বোলাইয়া লয়।'

ফজলের বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'কি কইলা বোঝলাম না।'

'অহনতো বোঝবাই না। তোমার বালিশের তলায় মাইয়ালোকের খোঁপার কাঁডা আহে ক্যামনে ?'

'আরে, ও-হ্-হো-হো। ঐ দিন রাইতে তোমার দেরি দেইখ্যা মনে করলাম তুমি ঘুমাইয়া পড়ছ। তোমাগ পশ্চিমের ঘরের পিছনে গিয়া আন্দাকুন্দি যেই জানালা ঠেলা দিছি অমনি কোঁ-ও কইর‍্যা ওঠছে তোমাগ উমের মুরগি। আমি তো মনে করছি কি না জানি কি ? ডরে দিছি লাফ। আর পট্‌টত্ কইর‍্যা ঢুকলো একটা কাঁডা। টান দিয়া খুইল্যা দেখি খোঁপার কাঁডা। ঐডা তোমার না ?'

'ঐ রহম কাঁডা কিন্যা দিছিলা কোনো দিন ?'

'তবে কার খোঁপার ঐডা ?'

'আছে এক জনের।'

'দ্যাখো তো! তোমার মনে কইর‍্যাই আমি বালিশের নিচে রাখছিলাম। ঐডার খোঁচায় অনেকগুলো রক্ত ঝরছিল। পায়ে এহনো দাগ আছে দ্যাখবা ?'

ফজলের গলা জড়িয়ে ধরে রূপজান একটা দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন এঁকে দেয় তার ঠোঁটে।

'আমি যাই, কেও আইয়া পড়ব।'

'তোমারে ছাড়তে কি অখন মন চায়।' রূপজানের হাতে গলায় হাত বুলিয়ে ফজল বলে, 'তোমার গা খালি ক্যান ? গয়নাগুলা কই ?'

'বা'জানে উডাইয়া থুইছে চোরের ডরে।'

'আইজ আমি আইছি। একটু সাজ-গোজ কইর‍্যা আইও। গয়না ছাড়া কেমুন বিধবা বিধবা দ্যাহা যায়।'

'ছি! অমুন কথা কইও না। আল্লায় যেন্ কোনো দিন অমুন না করে।'

'রূপজান, ও রূপজান, কই গেলি ?'

'ঐ মায় বোলাইতে আছে। ছাড়ো, আমি যাই।'

ফজলের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে চলে যায় রূপজান।

কালো রাত সারা গায়ে ছোছ্না মেখে কেমন মনোহারিণী হয়েছে। বসন্তের ফুরফুরে হাওয়ায় দুলছে তার ঝলমলে আঁচল।

রাতের বয়স যত বাড়ছে, ততোই উতলা হচ্ছে ফজল। এতক্ষণে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু কেন আসছে না রূপজান ?

কাছারি ঘরে চৌকির ওপর শুয়ে শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করে।

হুঁকো টানার গুড়ুক-গুড়ুক আওয়াজ আসছে।

তার শ্বশুর এখনো জেগে আছে তা হলে!

রাতের খাবার সেরে ফজল দরজায় দাঁড়িয়ে কুলকুচা করছিল। সে সময়ে শ্বশুরকে বাইরে থেকে আসতে দেখেছে সে।

BanglaBook.org

ফজলের বিরক্তি ধরে। এত রাত্রে আবার তামুকের নেশা ধরল ব্যাটার!

ঝপ্‌পড়-ঝপ্‌পড় শব্দ তুলে স্টিমার চলছে। তার সার্চলাইটের আরো পশ্চিম দিকের জানালা গলিয়ে কাছারি ঘরে ঢোকে। ঘরটাকে দিনের মতো ফর্সা করে দিয়ে যায় কিছুক্ষণ পর পর।

পশ্চিম থেকে পুবদিকে যাচ্ছে—কোন্ জাহাজ এটা ? এ সময়ে তো কোনো জাহাজ নেই। নিশ্চয়ই সৈন্য বোঝাই করে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, মেহেরবানি কইর‍্যা রাইতের আন্ধারেই যাইস। দিনে দুফরে যাইস না কোনো দিন।' মনে মনে বলে ফজল।

কয়েকদিন আগে দুপুরবেলা একটা বড় স্টিমার পশ্চিম থেকে পুবদিকে যাচ্ছিল। ওটায় বোঝাই ছিল বিদেশী সৈন্য। দশ বারোটা গোরা সৈন্য উদাম-উবস্তর হয়ে গোলস করছিল খোলা পাটাতনের ওপর।

চাঁদ প্রায় মাথার ওপর এসে গেছে। হাশমতের আসার সময় হলো।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। পুনুপুনু করে কথাও বলেছে যেন কারা। বোধ হয় হাশমত আর লালু এসেছে। কিন্তু ওরা শব্দ করছে কোন সাহসে!

ফজল তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সামনের দরজার খিল খোলে। একটা পাট খুলতেই জোরালো টর্চের আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

'ধরো, এই—এই যে আসামি।'

ফজল অন্দরমুখি দরজার দিকে দৌড় দেয়। কিন্তু সেখানেও দাঁড়িয়ে আছে লোক।

ফজল হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

এলাকার দফাদার সামেদ আলীকে সাথে নিয়ে দুজন কনস্টেবল ঘরে ঢোকে। তাদের একজন হাতকড়া নিয়ে এগুতেই ফজল বলে, 'ঐডা থুইয়া দ্যান। আমি পলাইমু না।'

'পলানির জন্যিতো দৌড় মারছিলা। চোর-ডাকাইতেরে বিশ্বেস আছে।' বলতে বলতে হাতকড়া লাগায় কনস্টেবল।

অন্য দরজা দিয়ে হাবিলদার, জঙ্গুরুল্লা চৌধুরী ও আর একজন লোক ঘরে ঢোকে।

'মোল্লা, বাড়ি আছ নি, ও মোল্লা ?' জঙ্গুরুল্লা চেঁচিয়ে ডাক দেয়।

'কে ? কারা ?' বাড়ির ভেতর থেকে প্রশ্ন করে আরশেদ মোল্লা।

'আরে আসো এদিগে। দেইখ্যা যাও।'

ফজল দফাদারকে অনুরোধ করে, 'আপনে একটু কইয়া দ্যান্ না! আপনে কইলে হাতকড়াডা খুইল্যা দিব।'

'খুলব নারে বাপু। তারা আইনের মানুষ। আইনের বাইরে কিছু করতে পারব না।'

হারিকেন নিয়ে আরশেদ মোল্লা আসে। সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সে এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিস দেখে সে যেন ভেবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার।

'চাইয়া দ্যাখ্‌ছ কি ?' জঙ্গুরুল্লা বলে। 'জামাইরে বুঝিন একলাই সমাদর করবা। আমরা বুঝি সমাদর করতে জানি না।'

'সমাদর এই রাইত দুফরের সময় ?'

'এমুন সময় না আইলে কি জামাইমিয়ার দরশন পাওয়া যাইত ?'

ডুকরে কেঁদে উঠছে কেউ। আওয়াজ আসছে অন্দর থেকে।

BanglaBook.org

দ্রুতপায়ে আরশেদ মোল্লা অন্দরে চলে যায়। কাছারি ঘর থেকে শোনা যায় এ রকম নিচু গলায় সে ধমক ছাড়ে, 'চুপ কর্, চুপ কর্ হারামজাদি। মান-ইজ্জত আর রাখল না।' একটু থেমে সে স্ত্রীকে বলে, 'তুমি কি করগো। ওরে ক্যাঁথা দিয়া ঠাইস্যা ধরো না ক্যান্?'

'উঁহু-হুহ্-হুহ্-হুহ্-হু।' চাপা কান্নার গুমরানিতে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে জোছনা-রাতের ফিকে অন্ধকার।

'থাম্ বেহায়া শয়তান! আরে তোমারে কইলাম কি? ওর মোখের মইদ্যে টিপ্‌লা দিয়া থোও।'

'কই গেলা মোল্লা?' কাছারি ঘর থেকে ডাক দেয় জঙ্গুরুল্লা। 'আমরা গেলাম গিয়া।'

আরশেদ মোল্লা ছুটে আসে কাছারি ঘরে। অনুনয়ের সুরে বলে, 'চদ্‌রী সাব, ওরে ছাইড়্যা দ্যান। আমি জামিন রইলাম।'

'আমি কি জামিনের মালিক? জিগাও হাওয়ালদার সাবরে।'

'নেহি নেহি, হাওয়ালদার সাব কুচ্ছু করতে পারবে না।' হাবিলদার বলে গম্ভীর স্বরে।

আরশেদ মোল্লা হাতজোড় করে, 'হাওয়ালদার সাব। ওরে জামিনে ছাইড়্যা দ্যান। আমি জামিন রইলাম।'

'নেহি জ্বী। এ ডাকইতি মামলার এক নম্বর আছামি আছে। হামি জামিন মঞ্জুর করতে পারবে না।'

'হ, ঠিক কথাইতো। থানার বড় দারোগাও পারব না।' জঙ্গুরুল্লা বলে। 'যাউক বেড়াইয়া আসুক। এত চিন্তার কি আছে? এক শ্বশুরবাড়িরতন যাইতে আছে আর এক শ্বশুরবাড়ি।'

'আপনে আর কাডা ঘায়ে নুনের ছিডা দিয়েন না, চদরী সাব।' ক্ষুণ্ন কণ্ঠ আরশেদ মোল্লার।

'আরে মিয়া, তোমার তো খরচ বাঁচল। জামাইর লেইগ্যা পিডা-পায়েস তৈয়ার করতে লাগব না কমসে কম সাতটা বচ্ছর।

'সাত বচ্ছর!' আরশেদ মোল্লা যেন আঁতকে ওঠে।

'সাত বচ্ছর না-তো কি সাতদিন! ডাকাতি অইল *'মাডারের'* মানে খুনের ছোড ভাই।' দফাদার বলে।

'কিন্তুক—কিন্তুক—' অরশেদ মোল্লার মুখে কথা জড়িয়ে যায়। 'কিন্তুক আমার—আমার মাইয়ার কি অইব চদ্‌রী সাব?'

'কি অইব তা তুমি জানো আর জানে তোমার গুণের জামাই।'

'চদরী সাব, ওরে কন আমার মাইয়া ছাইড়্যা দিয়া যাইতে।'

'কিরে?' ফজলের দিকে জঙ্গুরুল্লা বলে। 'তোর শ্বশুর কি কয় শোনছস?'

ফজল কোনো কথা বলে না।

'কিরে কথা কস না ক্যান্? তুই আকাম করছস, তুই একলা তার সাজা ভোগ কর। এই বেচারার মাইয়াডারে ক্যান্ খামাখা কষ্ট দিবি?'

'হাঁ, ইয়ে ছহি বাত কইছেন চৌধুরী সাহাব।' জঙ্গুরুল্লার কথার সায় দেয় হাবিলদার। 'তোম উন্‌হার বেটি কো তালাক দিয়ে দোও। বিলকুল সাফ হোয়ে যাও।'

'না।' দৃঢ়স্বরে বলে ফজল।

'ওরে বাবা! ঢোঁড়া সাপের তেজ আছে দেখি।' দফাদার বলে।

অন্দর থেকে চাপা কান্নার ফোঁপানি ভেসে আসছে।

BanglaBook.org

ফজল কান খাড়া করে। তার দিকে তাকিয়ে তাড়া দেয় জঙ্গুরুল্লা, আর দেরি করণ যায় না। চলো এই বার।'

কাছারি ঘর থেকে বেরিয়ে রওনা হয় সবাই। যেতে যেতে জঙ্গুরুল্লা বলে, 'ও মোল্লা, তোমার কোনো কথা থাকলে আমার নৌকায় চলো।'

বাড়ির থেকে বেশ খানিকটা দূরে নদীর ঘাটে ভিড়ে রয়েছে জঙ্গুরুল্লার পানসি। আসামি নিয়ে সেটায় চড়ে বসে সবাই। তাদের সাথে ওঠে আরশেদ মোল্লাও।

ফজল এদিক-ওদিক তাকায়। জোছ্নার আলোয় দৃষ্টি চলে অনেকদূর। কিন্তু ধারে-কাছে কোনো নৌকা দেখা যায় না। ফজল ভাবে, হাশমত আসেনি। হয়তো এসেছিল, পালিয়ে গেছে। ভালোই করেছে। তাকে পেলেও ছাড়ত না এরা।

জঙ্গুরুল্লা আবার বলে, 'কিরে ব্যাডা, কইলাম কি ? তোর কাছে তো আর দেনমহরের টাকা দাবি করতে আছে না। কি ও মোল্লা, আছে দাবি ?'

'উঁহু, আমার মাইয়ার দেনমহরের ট্যাহা চাই না।'

'এইতো। এখন মোখেরতন তিনডা কথা বাইর কইর‍্যা ফ্যাল্—তিন তালাক বায়েন। আমরা বেবাক সাক্ষী।'

'না আমি কইমু না।'

'ব্যাডা কইবি না। তোর গলায় পাড়া দিয়া কথা বাইর করমু।' জঙ্গুরুল্লার সাথের লাঠিধারী লোকটি বলে।

ফজল হাবিলদারকে বলে, 'হাওয়ালদার সাব, আমার একটা হাত ছাইড়্যা দ্যানতো, দেখি কে কার গলায় পাড়া দিতে পারে।'

'এই দবির, আমি থাকতে তোরা ক্যান কথা কস ?' ধমক দেয় জঙ্গুরুল্লা। তারপর সুর নরম করে বলে, 'শোন ফজল, আমি তোর বাপের বয়সী। যা কই ভালোর লেইগ্যা কই। এই বেচারার মাইয়াডারে ঠেকাইয়া রাখলে তোর কী ফয়দা অইব ?'

'আমার ফয়দা আমি বুঝি।'

'কিন্তু আমি শুন্‌ছি মাইয়া তোরে চায় না।'

'মিছা কথা, একদম মিছা কথা।'

'কি মোল্লা, তুমি কি কও ?'

'হ ঠিক কইছেন, আমার মাইয়া ওর ঘর করতে রাজি না।'

'রাজি না, তয় তারেই তালাক দিতে কন। আমি দিমু না', ফজল বলে।

'আরে মাইয়ালোকে তালাক দিতে পারলে কি আর তোরে জিগাইতাম!' জঙ্গুরুল্লা বলে। 'মাইয়া যখন তোরে চায় না তখন—'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আইচ্ছা, এই কথা ? যাও তো দফাদার। আর কে যাইব ? দবির যাও। মাইয়ারে জিগাইয়া আমার কাছে আইসা সাক্ষী দিবা।'

দফাদার ও দবির গোরাপিকে নিয়ে আরশেদ মোল্লা বাড়ি যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলে, 'মাইয়া কইছে, সে ডাকাইতের ঘর করব না।'

'ছারেছার মিথ্যা কথা। আমি আমার নিজের কানে শুনতে চাই।' ফজল বলে।

'নিজের কানে শোননের কি আছেরে ব্যাডা ঘাড়ুয়া ? এতগুলো মাইনষে সাক্ষী দিতে আছে।' জঙ্গুরুল্লা খেঁকিয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

'না, সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠব না।' দফাদার বলে।

'ঠিক কথা কইছ। কাগজ-কলম বাইর কর। লেখ, অমুকের মাইয়া অমুকেরে আমি তিন তালাক বায়েন দিলাম।'

দফাদার একটা কাগজে লিখে জঙ্গুরুল্লার দিকে এগিয়ে দেয়। জঙ্গুরুল্লা সেটা হাবিলদারের হাতে দিয়ে বলে, 'নেন হাওয়ালদার সাব। এইবার সই আদায় করণের ভার আপনের উপর দিলাম।'

হাবিলদার ফজলের ডানহাত থেকে হাতকড়া খুলে নিয়ে বলে, 'করো দস্তখত, কর্ দোও।'

'না করুম না।'

গালে থাপ্পড় মেরে হাবিলদার বলে, 'কর্ দস্তখত।'

'না করমু না।' আরো জোরে চেঁচিয়ে বলে ফজল।

আবার থাপ্পড় পড়ে ফজলের গালে।

'জলদি দস্তখত কর্।'

'না—না—না।'

জঙ্গুরুল্লা আরশেদ মোল্লাকে বলে, 'তুমি বাড়িত্ যাও। চিন্তা কইর‍্য না। দস্তখত আদায় না কইর‍্যা ছাড়মু মনে করছ? ও মাঝিরা নৌকা ছাড়ো।'

আরশেদ মোল্লা পানসি থেকে নেমে বাড়ির দিকে পথ নেয়।

॥ পনেরো ॥

আসাধারণ রূপ নিয়ে জন্মেছিল বলে নাম রাখা হয়েছে রূপজান। গাছপাকা শবরি কলার মতো তার গায়ের রঙ। যৌবনে পা দেয়ার সাথে সাথে সে রঙের ওপর কে যেন মেখে দিয়েছে জোছনার স্নিগ্ধতা। তার ঈষৎ লম্বা মুখে টিকলো নাক। মমতা মাখানো টানা চোখ। চোখ দুটির যেন আলাদা সত্তা আছে। পাতলা ঠোঁট নেড়ে কথা বলার সময় প্রজাপতির ডানার মতো নড়ে তার চোখের পাপড়ি। ঝিলিক মেরে ওঠে ঘন নীল চোখের তারা। হাসবার সময় শশার বিচির মতো ছোট ছোট সুবিন্যস্ত দাঁত দেখা যায় কি যায় না।

শুধ রঙ-চেহারাই নয়। স্বাস্থ্যও তার ভালো। দোহারা গড়ন। দিঘল শরীর থেকে লাবণ্য যেন চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। মজবুত ভিতের ওপর গঠিত তার পরিপুষ্ট বক্ষে যেন বাসা বেঁধেছে সারা দুনিয়ার লজ্জা। প্রতিবেশিনীদের বিবেচনায় শরীরটা রূপজানের আমুনে। বুড়িয়ে যাবে না তাড়াতাড়ি, পাকবে আমন ধানের মতো দেরিতে। শুধু একটা জিনিসের অভাব। তার চুল কালো নয়। দু-তিন দিন তেল না পড়লে তার চুলের লালচে রঙ বেরিয়ে পড়ে।

রঙ ও চেহারা-সুরত সবটাই রূপজান পেয়েছে তার মা সোনাভানের কাছ থেকে। সোনাভানের মা চন্দ্রভান ছিল ধলগাঁয়ের কলু বংশের মেয়ে। সে বংশের সব ছেলে-মেয়ের গায়ের রঙ শশার মতো। গ্রামের লোক তাই ঐ বংশকে বলত পাকনা শোশার ঝাড়। চন্দ্রভানের স্বামী আদালত শেখ ছিল নারায়ণগঞ্জের এক পাট-কোম্পানির মালিক জন ল্যাম্বার্টের কুঠির মালি। আর আরশেদ মোল্লা ছিল তার কুত্তার রাখাল। সায়েবের একমাত্র ছেলে স্টিফেন বিলেত থেকে এসেছিল বাপের কাছে। তার নজর পড়ে সোনাভানের ওপর। সায়েব টের পেয়ে সাত-তাড়াতাড়ি আরশেদ মোল্লার সাথে সোনাভানের বিয়ে ঘটিয়ে দু'হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে বিদেয় করেন কুঠি থেকে।

BanglaBook.org

বিয়ের হাটে রূপসী মেয়ের জন্য গ্রাহকের ভিড় জমে। রূপজানের জন্যও ভিড় জমেছিল। নিলাম ডাকার মতো গয়না ও *'পাঁচকের'* টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে রূপজানকে ছেলের বউ করে ঘরে নিতে পেরেছিল এরফান মাতব্বর।

রূপজানকে মাতব্বর পছন্দ করেছিল শুধু তার রূপ দেখে। ছেলের বিরহী ভাঙা মনকে জোড়া লাগাবার জন্যই দরকার ছিল জরিনার চেয়েও সুরন্দী মেয়ের। তাই মেয়ের বাপের কুল, মায়ের কুল দেখবার প্রয়োজন বোধ করেনি সে, গ্রাহ্য করেননি গাঁয়ের প্রবাদ—

বউ আনো ঘর দেখে,
মেয়ে দাও বর দেখে।

প্রবাদটি যে শুধু কথার কথা নয়—পরে বুঝতে পেরেছিল সে আরশেদ মোল্লার শয়তানি দেখে। আর সে জন্য আফসোসও করেছে সে বড় কম নয়। অবশ্য নিজের কৃতকর্মের সমর্থনে সে বলে, 'বিয়ার আসল জিনিস অইল বউ। বউডা তো রূপে-গুণে, চলা-চল্‌তিতে ভালোই আছিল।'

রূপজানের তালাকের খবর শুনে আবার ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়েছে মোল্লাবাড়ি। সম্বন্ধের প্রস্তাব এসেছে অনেক কয়টা। দরও বাড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। সবচেয়ে লোভনীয় প্রস্তাব একটা এসেছিল জঙ্গুরুল্লার কাছ থেকে তালাকের আগেই। তার পীর মৌলানা তানবীর হাসান ফুলপুরী বছরে দু'বার আসেন এ এলাকায়। একবার বর্ষাকালে, গেরস্তের পাট বেচার সময়। আর একবার শীতকালে, আমন ধান উঠবার পরে পরেই। তিনি বজরা নিয়ে ফেরেন মুরিদানের বাড়ি। জঙ্গুরুল্লা তাঁর জন্য নিজের বাড়িতে মসজিদের পাশে খানকাশরিফ বানিয়ে রেখেছে। পীরসাহেবের বিবিরা থাকেন সুদূর ফুলপুরে। বাঙ্গাল মুল্লুকের পানির ভয়ে তাঁদের কেউ তাঁর সাথে আসেন না। এই বিদেশে কে তাঁর খেদমত করে?

তালাকের পর আবার মোল্লাবাড়ি আসে জঙ্গুরুল্লা। সে আরশেদ মোল্লাকে বলে, 'শোনলাম অনেক সম্বন্ধ আইতে লাগছে?'

'হ, আইছে কয়েকখান।'

'আরে এত কায়দা-ফিকির কইর‍্যা তালাক দেওয়াইলাম আমি। আর মাইনষে বুঝি এহন তৈয়ার লোটে চিড়া কোটতে চায়! খবরদার মিয়া, মোখের কথা যেন ঠিক থাকে।'

'মোখের কথা তো ঠিক থাকব। কিন্তু একটা কথা।'

'কি কথা আবার।'

'জামাইর বয়স যে শ্বশুরেরতনও বেশি। ঐ যে মাইনষে কয়, তালুইর তন পুত্রা ভারী, হেই রহম অইয়া যাইব।'

'আরে তুমি রাখো ঐ কথা। উনি অইলেন আল্লাওয়ালা মানুষ। উনারা এত ত্বরাত্বরি বুড়া অন না। দেখছ না কেমুন নুরানি চেহারা!'

'হ, পীর-দরবেশরা তো আল্লার নিজের আতের তৈয়ারি। উনাগ চেহারাই আলাদা।'

'হ শোন, ইদ্দতের কয়ডা মাস পার অউক। তারপর পীরসাব যখন শাওন মাসে আইবেন, তখন ইন্‌শাল্লাহ্‌ কাজটা সমাধা করণ যাইব।'

'আর জমির কথা যে কইছিলেন?'

'আরে হ, তোমার লেইগ্যা তো দশনল জমি রাইখ্যা থুইছি খুনের চরে।'

'দশনল না। আরো দশনল দিতে লাগব। মাইয়ার গয়না আপনেগ দেওনের দরকার নাই। গয়না আমিই দিমু।'

BanglaBook.org

'আইচ্ছা! গয়না যদি তুমি দেও, তবে নিও আরো দশ নল। কিন্তু মোখের কথা যেন্ উল্‌ডায় না।'

সব কথা পাকাপাকি করে চলে যায় জঙ্গুরুল্লা। আরশেদ মোল্লা ব্যাপারটা গোপন রাখে। এমন কি তার স্ত্রীর কাছেও বলে না কিছু। খুনের চরে গিয়ে সে মাপজোখ করে বুঝে নেয় বিশ নল জমি।

কিন্তু গোপন কথা বেরিয়ে পড়ে। একদিন আরশেদ মোল্লা আফার থেকে বাক্‌স নামিয়ে খুলে মাথায় হাত দেয়। রূপজানের একটা গয়নাও তার মধ্যে নেই। সে চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেয় স্ত্রীর সাথে, 'কই গেল গয়না ? তুই গুঁজাইয়া থুইছস ?'

'উনি কি কয়! আমি ক্যান্ গুঁজাইমু ?'

'হ, তুই না গুঁজাইলে যাইব কই ?' বুড়াকালে তোর গয়না পিন্দনের শখ্ অইছে।'

'তোবা-তোবা! গয়না পিন্দনের শখ্ অইলে তো গায়ে দিয়া বইয়া থাকতাম। আর মাইয়ার শরীল খালি কইর‍্যা মাইয়ার গয়না গায় দেয় এমুন মা আছে দুইন্যায় ?'

'তয় গেল কই ? রূপিতো সরায় নাই ? রূপি, ও রূপি।'

রূপজান এসে দাঁড়ায়। তার চোখ-মুখ ফোলাফোলা। চুল উস্কুখুস্কু। তেল না পড়ায় নারকেলের ছোবড়ার মতো রঙ হয়েছে সে চুলের।

আরশেদ মোল্লা তার দিকে চেয়ে বলে, 'গয়নাগুলা তুই সরাইয়া রাখছস ?'

রূপজান কথার জবাব দেয় না।

'কি জিগাইলাম ? গয়নাগুলো তুই সরাইয়া রাখছস ?'

'হ।'

'আমারে না জিগাইয়া নিছস্ এত সাহস তোর!'

রূপজান নিরুত্তর।

আরশেদ মোল্লা আবার বলে, 'কই রাখছস, লইয়া আয়। চোরের যেই উৎপাত চাইরধারে—'

'যাগো জিনিস তাগো কাছে পাডাইয়া দিছি।'

'কি কইলি হারামজাদি!' মোল্লা মেঝেতে পড়ে থাকা বাক্সের তালাটা হাতে নিয়ে লাফিয়ে ওঠে। ছুড়ে মারে ওটা রূপজানের দিকে। তার মাথাটা কেমন করে যেন তার অজান্তেই একদিকে কাত হয়ে যায়। আর তালাটা তার কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে গিয়ে ভেঙে দেয় একটা চালের মট্‌কি।

সোনাইবিবি ছুটে আসে। দু'হাত মেলে সে মারমুখি মোল্লার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

'ছাড়ো ছাড়ো, ওরে আইজ মাইর‍্যা ফালাইমু। ধুইন্যা তুলা-তুলা কইর‍্যা ফালাইমু।'

'ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—! জুয়ানমাইয়ার গায়ে আত তোলে, শরমও নাই। ওরে মাইর‍্যা তো ফালাইছেনই। ও কি আর জিন্দা আছে ?'

আরশেদ মোল্লা থামে। সে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে, 'হারামজাদি আমারে যে মাইর‍্যা ফালাইছে! এহন আমি গয়না পাই কই ?'

'গয়না দিয়া কি করব ?'

'আরে গয়না লাগব না মাইয়ার বিয়া দিতে ? গয়না দিতে না পারলে দশ নল জমি ফিরত দেওন লাগব।'

'জমি ফিরত দেওন লাগব! ক্যান্ ?'

BanglaBook.org

আরশেদ মোল্লা আর গোপন রাখতে পারেনা ব্যাপারটা। জঙ্গুরুল্লার কাছে তার ওয়াদার কথা সে খুলে বলে স্ত্রীকে।

সোনাইবিবি শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'মাইয়ার পরানডারে তো এক্কেরে ঝাঁজ্‌রা কইর‍্যা ফালাইছে। কায়ামরা বানাইয়া ফালাইছে। এহন আবার কবর দেওনের কারসাজি শুরু করছে।'

মা বোঝে মেয়ের মন। সত্যিই ঝাঁজরা হয়ে গেছে রূপজানের বুকের ভেতরটা।

ফজলকে ধরে নেয়ার পর তিনদিন সে বিছানায় পড়ে ছিল। দানাপানি ছোঁয়নি। তারপর যখন তালাকের খবর তার কানে এল তখন তার দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল। হুঁশ হওয়ার পর আত্মহত্যার স্পৃহা জেগেছিল তার মনে। একটা রশি সরীসৃপের মতো তার মনের দরজায় হানা দিয়েছে বারবার। কিন্তু সে জানে আত্মহত্যা মহাপাপ। তাই সে সরীসৃপ মনের দোরগোড়া থেকেই বিদায় হয়েছে।

রূপজান ভেবে পায়না—কেন ফজল তাকে তালাক দিয়ে গেল ? সে হয়তো মনে করেছে—রূপজান জানত সব ষড়যন্ত্রের কথা। জেনেও তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়নি কেন সে ?

কিন্তু রূপজান যে কিছুই জানত না। সে অবশ্য তাদের বাড়ির নিচে নদীর ঘাটে জঙ্গুরুল্লার পানসি দেখেছিল একদিন। তার বাপকেও যেতে দেখেছিল পানসিতে। তারা যে এরকম একটা চক্রান্ত করতে পারে তা সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি।

ঐ দিন রাত্রে বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে মনে করে সে কাছারি ঘরে যাওয়ার জন্য নিশ্চুপে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। আলগোছে দরজার খিল খুলে কয়েক পা এগুতেই সে দেখে তার বাপ উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেমন বেরিয়েছিল তেমনি আবার ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছিল। বাপ দেখে ফেলেছে মনে করে তার লজ্জার সীমা-পরিসীমা ছিল না। সে যদি তখন বুঝতে পারত কেন তার বাপ জেগে রয়েছে, এতরাত্রে কোন বান্ধবের জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে কি আর ধরতে পারত ফজলকে ? কাছারি ঘরে ছুটে গিয়ে, চিৎকার দিয়ে সে হুঁশিয়ার করতে পারত তাকে। লজ্জা-শরমের তোয়াক্কা সে করত না তখন।

রূপজানের মনে হয়—ফজল ইচ্ছে করে তালাক দেয়নি। যারা তাকে চক্রান্ত করে ধরিয়ে দিয়েছে তারাই জোর-জবরদস্তি করে বাধ্য করেছে তাকে তালাক দিতে। কিন্তু তার বাপ যে বলে, ফজল কাগজে লিখে তালাক দিয়ে গেছে। তবে কি সে সত্যি সত্যি নিজের ইচ্ছায় তালাক দিয়েছে ?

কেন সে এ কাজ করল ? কেন সে তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেল ? সে-তো চায়নি। এখনো তা চায় না তার মন। কোনো দিন চাইবেও না।

আবার প্রশ্ন জাগে রূপজানের মনে—বছরের পর বছর জেল খাটতে হবে বলেই কি সে এ কাজ করল ? তাকে আবার বিয়ে করার সুযোগ দিয়ে গেল ?

জেলের কথা মনে হতেই শিউরে উঠে রূপজান। সে শুনেছে—জেলে অনেক কষ্ট। সেখানে নাকি বেদম মারধর করে। পেট ভরে খেতে দেয় না। শুতে বিছানা দেয় না। গরু-মোষের মতো ঘানি টানতে হয়। চাকিতে পিষে ছাতু বানাতে হয়। কোনো কাজ না থাকলেও একদণ্ড জিরোতে দেয়না। ডালে চালে মিশিয়ে দিয়ে বলে, বাছো বসে বসে। বাছা শেষ হলে রান্না, তার পরে খাওয়া।

BanglaBook.org

রূপজানের চোখ ফেটে পানি আসে। দু'গাল বেয়ে নামে অশ্রুবন্যা। চাপা কান্নার ঢেউয়ে থরথরিয়ে কাঁপে তার সারা দেহ। সে অস্ফুটস্বরে বলে, 'তুমি বিনা দোষে জেলে পইচ্যা মরবা। আর আমি আর একজনের ঘরে গিয়া সাধ-আহলাদ পুরা করমু ? না, কিছুতেই না। কিছুতেই না।'

তাকে কি জেল থেকে খালাস করে আনা যাবে না ?—ভাবে রূপজান।

কেন যাবে না ? ঠিকমত মামলার তদবির করলে, টাকা খরচ করলে নিশ্চয় তাকে খালাস করে আনা যাবে। টাকায় কি না হয়! তার শ্বশুর নিশ্চয় টাকা খরচ করবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে সন্দেহ জাগে—শ্বশুরের কাছে যদি এখন টাকা না থাকে ? তার বন্ধক দেয়া গয়না ছাড়াতে যদি সব টাকা ফুরিয়ে গিয়ে থাকে ?

এ কথা মনে হওয়ার পরেই একদিন সুযোগ বুঝে সে বাক্স খুলে তার সবক'টা গয়না সরিয়ে ফেলেছিল। কি হবে গয়না দিয়ে ? যার গয়না তারই কাজে লাগুক। বাপের কাছে সেদিন মিথ্যে করে বলেছিল—যাদের গয়না তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আসলে গয়নাগুলো তখনো তার কাছেই ছিল। লুকিয়ে রেখেছিল কাঁথার গাঁটরির মধ্যে। সে সুযোগ খুঁজছিল, কেমন করে কাকে দিয়ে ওগুলো পাঠাবে শ্বশুরের কাছে।

অনেক ভেবে-চিন্তে রূপজান তার চাচাতো ভাই কাদিরকে ঠিক করে। সে জানে—এ পাড়ায় একমাত্র কাদিরেরই কিছুটা টান আছে ফজলের জন্য। আর তাকে বিশ্বাসও করা যায়।

কাদির যেদিন গয়নার পুটলি নিয়ে মাতব্বর বাড়ি পৌঁছে, সেদিন এরফান মাতব্বরের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। তার বিছানার চারপাশে বসে লোকজন দোয়া-দরূদ পড়ছে। বরুবিবি শিয়রের কাছে বসে চোখের পানি ফেলছে, চেয়ে আছে মাতব্বরের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পরে পরে চামচে করে পানি দিচ্ছে সে মাতব্বরের মুখে। ঘরের এক কোণে বসে কাঁদছে বাড়ির মেয়েরা।

মসজিদের ইমাম সাহেব এসে তওবা পড়িয়ে চলে গেছেন।

বিছানা থেকে উঠবার শক্তি আগেই হারিয়েছিল এরফান মাতব্বর। আরশেদ মোল্লা জঙ্গুরুল্লার সাথে ষড়যন্ত্র করে পুলিস ফাঁড়ির পুলিস ডেকে ফজলকে ধরিয়ে দিয়েছে শুনে রাগে উত্তেজনায় সে চিৎকার করে উঠেছিল। ঝাড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে যেন প্রচণ্ড ঝড়ে উৎপাটিত বুড়ো বটগাছ। কাঁপতে কাঁপতে সে চৌকির থেকে নিচে পড়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। তারপর থেকেই তার জবান বন্ধ। তার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে দ্রুত। দিঘিরপাড় থেকে ডাক্তার এসেছিলেন। ঐষধ দিয়ে বলে গেছেন, 'রুগীকে যদি কিছু খাওয়াতে মন চায়, তবে খাওয়ানো যেতে পারে।'

কাদির দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ, নির্বাক। সে কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

রমিজ মিরধা কাদিরকে চিনতে পেরে বলে, 'তুমি আরশেদ মোল্লার ভাইপুত না ? তুমি আইছ কি করতে ? তোমার চাচায় বুঝিন্ পাডাইয়া দিছে মাতবরের পো-র মরণকষ্ট দ্যাখতে ?'

'মাঐজীর লগে দুইডা কথা কইমু।' কাদিরের মুখে কথা জড়িয়ে যায়।

'কি কথা ? কইয়া ফালাও।' মেহের মুনশি বলে।

'বু' আমারে পাডাইছে। এই গয়নাগুলা দিছে। এগুলা বেইচ্যা দুলাভাইর মামলার তদবির করতে কইছে।'

কাদির গয়নার পুটলিটা বরুবিবির দিকে বাড়িয়ে দেয়।

বরুবিবি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

BanglaBook.org

মেহের মুনশি পুটলিটা হাতে নেয়। গয়নাগুলো খুলে রাখে বরুবিবির সামনে।

বরুবিবি দু'হাত ভরে গয়নাগুলো তোলে। তার হাত কাঁপছে। মাতব্বরের মুদিত চোখের সামনে সেগুলো মেলে ধরে কাঁদে-কাঁদো স্বরে বলে, 'ওগো হোনছে ? বউ বেবাক গয়না পাডাইয়া দিছে।'

'ও দুদু, হোনছেন ?' কানের কাছে মুখ নিয়ে মেহের মুনশি ডাকে। মাতব্বর চোখ মেলে। মরা মাছের চোখের মতো ঘোলাটে সে চোখ।

'ও দুদু, দ্যাহেন চাইয়া। বেবাক গয়না পাডাইয়া দিছে বউ।'

বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে মাতব্বর। তার ঠোঁট নড়ে। কি যেন বলতে চায়, কিন্তু পারে না। সে মুখ হাঁ করে।

বরুবিবি চামচ ভরে পানি দেয় তার মুখে। সে আবার চোখ বোজে।

তারপর আর এক রাত বেঁচেছিল মাতব্বর। মরার আগে কিছুক্ষণের জন্য তার বাকশক্তি ফিরে এসেছিল। জিভে জড়ানো ছাড়াছাড়া অস্পষ্ট কতকগুলো শব্দে সে তার অন্তিম ইচ্ছা জানিয়ে গেছে। রূপজানের গয়না সম্বন্ধে সে শুধু বলে গেছে, 'বউর মহরানার হক।'

কথা ক'টির ব্যাখ্যায় সকলেই একমত—রূপজানের কাছে ফজলের দেনমহরের দেনা এরফান মাতব্বর শোধ করে গেছে। রূপজান ছাড়া ও গয়নায় আর কারো হক নেই।

॥ ষোল ॥

দু'সপ্তাহ হাজতবাসের পর আদালতে হাজির করা হয়েছিল ফজলকে। সেখানেই সে তার পিতার মৃত্যুর খবর পায়।

মামলার তদবিরের জন্য মেহের মুনশি আদালতে এসেছিল। তার নিযুক্ত উকিল ফজলকে জামিনে খালাস করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন অনেক। আসামির পিতার মৃত্যু হয়েছে—এ কারণ দেখিয়েও তিনি জামিন মঞ্জুর করাতে পারেননি।

বুকভরা কান্না নিয়ে আবার ফজল জেলে ঢোকে। কান্না চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে ওঠে তার বুক। ফুলে যায় চোখ-মুখ। অন্যান্য আসামিরা কাছে এসে দু-একটা সহানুভূতির কথা বলতেই তার রুদ্ধ কান্না বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে ফজল। বুকের পুঞ্জীভূত মেঘ অনেক পানি ঝরিয়ে হালকা হয় কিছুটা। কান্নার তাণ্ডব কমে এলে প্রথমেই যে ছবিটি তার কল্পনায় ভাসে তা একটি কবরের। কবরের পাশে বসে কাঁদছে তার মা। পরিধানে তার সাদা থান। তার গা ঘেষে বসে আছে আমিনা আর নূরু। তারাও কাঁদছে।

রূপজানও কি কাঁদছে ? হ্যাঁ, এতো সে। সে-ও কাঁদছে। না-না-না, ভুল দেখছে সে।

ফজল তার মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলতে চায় রূপজানের ছবি। কিন্তু পারেনা। তার মনে হয়—রূপজান কাঁদছে না, কাঁদার ভান করছে। সে কাঁদতে পারে না। কেন কাঁদবে সে ? কার জন্য কাঁদবে ? ফজলের বাপ তার কে ? ফজলই তো তার কিছু নয়। সে ডাকাত। ডাকাতের ঘর করবে না বলে সে তালাক নিয়েছে।

রূপজান কি সত্যিই বলেছিল—সে ডাকাতের ঘর করবে না ? এখনো সন্দেহ জাগে ফজলের মনে। কিন্তু সে যদি এ কথা না-ই বলে থাকে, তবে দু-দুটো লোক কেন সাক্ষী দিল এসে ? এমন ডাহা মিথ্যে কথা বলে তাদের লাভ ? কিন্তু রূপজান তো সেদিন তার কাছে বলেছিল—সে বিশ্বাস করে না ডাকাতির কথা। কি জানি, হয়তো মনে করেছে—যার

BanglaBook.org

কপালের ভোগ সে একাই ভোগ করুক। সে কেন এমন পুরুষের অদৃষ্টের সাথে নিজেরটা জড়িয়ে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করবে ?

ফজল আবার ভাবে, ঠিকই করেছে রূপজান। ঐদিন যদি সে এটুকু বুঝত, তবে আর তাকে অতটা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো না। তালাকনামায় একটা দস্তখত মেরে দিলেই সে জঙ্গুরুল্লা ও হাবিলদারের অকথ্য নির্যাতন থেকে রেহাই পেত। তার বুড়ো আঙুলে কালি মাখিয়ে জোর করে তার টিপসই নেয়ার দরকার ছিল না তাদের।

দু'মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেক আসামি ছাড়া পেয়ে চলে গেছে। অনেক নতুন আসামি এসেছে। নতুনের মধ্যে দু'জন তার পরিচিত। তারা বিক্রমপুরের নামকরা হা-ডু-ডু খেলোয়ার বাদল আর আক্‌লাস। দিঘিরপাড়ের জেদাজিদির খেলায় ঘাঁড়ের মতো জোরোয়ার এই বাদলকেই সে মাজায় ধরে রেখে দিয়েছিল।

বাদল আর আক্‌লাস জেলে ঢুকতেই ফজল ম্লান হেসে এগিয়ে যায় তাদের কাছে।

বাদল চিনতে পেরে বলে, 'কিহে বাহাদুর, তুমি এখানে কেন ? কবে এলে ?'

'এই দুই মাসের কিছু বেশি।' জবাব দেয় ফজল।

'অ্যাঁ, দু'মাস!'

একজন আসামি বলে, 'ওনারে মিথ্যা ডাকাতি মামলায় ফাঁসাইয়া দিছে। বাপ মারা গেছে তবুও বেচারা জামিন পাইতেছে না।'

শুনে বাদল আর আক্‌লাস দু'জনই ব্যথিত হয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই ওদের সাথে ফজলের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

ওরা নাকি কোন ষড়যন্ত্র মামলার আসামি। ইংরেজ শাসকদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্য ওরা এক গুপ্ত রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল। দলের নেতাসহ সাতজন ধরা পড়েছে।

দলের নেতা মতির বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে। এর আগে নাকি তিন বারে বছর দশেক জেল খেটেছে সে। তার পাতলা ছিপিছিপে শরীরে মেদের নামগন্ধ নেই। গাল দুটা বসে গেছে। চোখে পুরু চশমা। চোখেমুখে মেদহীন দিনের গম্ভীর্য। কথা বলার সময় চোখের তারায় বিদ্যুত জ্বলে, ঠোঁটের কোণে চিকচিক করে কেমন এক অদ্ভুত হাসি।

তার দিকে তাকালেই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে ফজলের। সে ভাবে—দেশের স্বাধীনতার জন্য জেল খাটতে খাটতে মতিভাইয়ের স্বাস্থ্যের এ দশা হয়েছে।

মতি তার দলের সবার সাথে কি সব আলোচনা করে। ফজল বুঝতে পারে না সব। তাদের আলোচনা থেকে সে এটুকু জানতে পারে—জাপানিরা রেঙ্গুন দখল করেছে। এগিয়ে আসছে বাংলাদেশের দিকে। চাটগাঁ ও আরো অনেক জায়গায় বোমা ফেলে ছারখার করে দিয়েছে।

কয়েকদিন পরে আবার ফজলকে আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু এবারেও তার উকিল জামিন মঞ্জুর করাতে পারেননি। মেহের মুনশির কাছে বাড়ির খবরাখবরের সাথে এক দুঃসংবাদ পায় ফজল। পুলিস আর মিলিটারি মিলে তাদের এলাকার শতশত নৌকা ফতেগঞ্জ নিয়ে আটক করেছে। ফজলদের নতুন পানসি আর ঘাসি নৌকাটাও নিয়ে গেছে। অনেকে ফতেগঞ্জ গিয়ে তাদের নৌকায় নম্বর লাগিয়ে ফেরত নিয়ে এসেছে। এর জন্য নাকি অনেক টাকা ঘুস দিতে হয়। মেহের মুনশি ফতেগঞ্জ গিয়েছিল। দেশের সব জায়গা থেকেই নৌকা আটক করা হয়েছে। হাজার হাজার নৌকার ভেতর থেকে সে ফজলদের পানসিটা খুঁজে বার করতে পারেনি। ঘাসিটা সরকার কিনে নিতে চেয়েছিল। দাম ধার্য হয়েছিল মাত্র একশ' টাকা। তিরিশ টাকা বোট ইন্সপেক্টরকে ঘুস দিয়ে ওটায় নম্বর লাগিয়ে ফেরত আনা হয়েছে।

BanglaBook.org

ফজলের মনে হয়, নতুন পানসিটা দেখে কারো লোভ লেগেছিল। সে-ই নিজের বলে দাবি করে ঘুস দিয়ে ওটা নিয়ে গেছে।

বিপদ কখনো একা আসে না। কথাটা একেবারে খাঁটি—ভাবে ফজল। যে পানসিটা গেল তা আর সারা জীবনেও সে গড়াতে পারবে না।

এত নৌকা জমা করছে কেন সরকার ? আবার কতগুলোয় নম্বর লাগিয়ে ছেড়েই বা দিচ্ছে কেন ?—ফজল বুঝতে পারে না। বাদল বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারটা : এই নদী-নালার দেশে নৌকা ছাড়া যুদ্ধ করা অসম্ভব। সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি পারাপার আনা-নেয়ার জন্য নৌকার দরকার। জাপানিরা এগিয়ে আসছে। দরকারের সময় যাতে নৌকার অভাব না ঘটে, আবার বেগতিক দেখলে সমস্ত নৌকা পুড়িয়ে ডুবিয়ে কৃতিত্বের সাথে পালানো যায় তাই নৌ-শুমারি করে রাখছে ইংরেজ সরকার। তারা বেছে বেছে কিছু নৌকা কিনেও রাখছে যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্য।

ফজল অবাক হয়ে ভাবে—এত খবর রাখে এ রাজনৈতিক বন্দিরা! তারা খবরের কাগজ পড়ে। তাই দুনিয়ার খবর তাদের পেটে। এক-একজন যেন খবরের গুদাম।

খবরের কাগজ পড়বার জন্য এরা অস্থির হয়ে পড়ে। জেলখানায় খবরের কাগজ আসার সাথে সাথে রাজনৈতিক বন্দিরা এক-একজন এক-এক পাতা নিয়ে পড়তে শুরু করে। একজন পড়া আরম্ভ করলে তিন-চারজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে পাতার ওপর। স্বাধীনতা আন্দোলন আর যুদ্ধের খবর জানার জন্য এরা সব উদগ্রীব। এদের দেখাদেখি ফজলও কাগজ পড়া শুরু করেছে। সবার পড়া হয়ে গেলে সে কাগজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলে। মোহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা থাকলে সে এদের মতো অস্থির হয়ে যেত কাগজ পড়ার জন্য। লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ার পর সে আর কাগজ পড়ার সুযোগই পায় নি। এখন অন্যান্যদের মতো সে-ও খবরের কাগজ আসার প্রতীক্ষায় সময় গোনে।

এতদিন দুনিয়ার কোনো খবরই রাখত না ফজল। এখন খবরের কাগজ পড়ে সে বুঝতে পারে—দুনিয়ার হালচাল বদলে যাচ্ছে, যুদ্ধের কারণে দ্রুত বদলে যাচ্ছে দুনিয়ার চেহারা।

কাগজ পড়ে সে আরো জানতে পারে, সারা দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। দুটি রাজনৈতিক দল—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধ বেড়েই চলেছে। কংগ্রেস চায় অখণ্ড ভারত আর মুসলিম লীগ চায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলিমদের জন্য আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্র—পাকিস্তান।

॥ সতেরো ॥

মহকুমার জেলখানা। পাশাপাশি দুটো মাত্র ব্যারাক। একটায় রাখা হয় বিচারধীন আসামি, অন্যটায় স্বল্প মেয়াদের দণ্ডিত অপরাধী। ব্যারাক দুটোর শিকের দরজা একই দিকে অবস্থিত। দরজার সামনে খোলা লম্বা বারান্দা। একজন রাইফেলধারী সেপাই বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফেরে।

আলো-বাতাসের জন্য কয়েদিরা দরজার কাছ ঘেঁষে জটলা করে সব সময়। অনন্ত আকাশ আর সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে ক্লান্তি আসে না তাদের চোখে। মনের আনন্দে উড়ে যাওয়া মুক্ত পাখির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অনেকে।

রাত আটটার ঘণ্টা পিটিয়ে এক পাহারাদার তার চার ঘণ্টার কাজের পালা শেষ করে। নতুন পাহারাদার আসে তার জায়গায়।

ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরা দরজার কাছে বসে গল্পগুজব করে। শুধু মতি জানালার গরাদের ওপর দুই কনুই রেখে চুপচাপ বসে আছে। তার দৃষ্টি পাঁচিলের বাইরের একটা আমগাছের ওপর। ঘন অন্ধকারে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। এক লহমার জন্য হঠাৎ গাছের টিকির কয়েকটা পাতা চিকমিকিয়ে ওঠে যেমন চিকমিক করে শেষ বিকেলের রোদে। কিছুক্ষণ পর পর আরো দু'বার দেখা যায় সে ক্ষীণ আলোর চিকিমিকি।

মতি উঠে দাঁড়ায়। দলের লোকদের বলে, 'কিরে তোরা চুপচাপ বসে আছিস কেন ? একটু গান-টান কর।'

দ্বিতীয়বার আর বলতে হয় না। একজন গানে টান দিতেই দলের সবাই গাইতে শুরু করে দেয়—

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—
সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—
আমার জন্মভূমি,
সে যে আমার জন্মভূমি,
সে যে আমার জন্মভূমি।

ফজল ও বাকি সাত-আটজন আসামি দূরে বসেছিল। গানের আকর্ষণে ফজল গিয়ে বাদলের পাশে বসে। গানের কথা ও সুর গুনগুন করে তার মনের ভেতর।

গান শেষ হয়। ফজলকে দেখে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে সকলে। বাদল মতির দিকে চেয়ে বলে, 'ঠিক আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।'

কী ঠিক আছে, বুঝতে পারে না ফজল। কিছুক্ষণ পরই সে দেখে আক্‌লাস বিঘত দেড়েক লম্বা কালোমত কি একটা জিনিস তার জামার ভেতর থেকে বার করে রানের নিচে রাখল।

মতি বলে 'মোহন, এবার তোর সেই গানটা ধর। আর তোরা সবাই কবির সাথে সাথে দোহার ধরিস আর তালে তালে তালি দিস।

মোহন — ও ভাই কোথা থেকে উড়ে এল লালমুখো বাদুড়,
ও ভাই কোথা থেকে ...ে...ে...
একজন — কোথা থেকে ?
মোহন — পার হয়ে তেরো নদী সাত সমুদ্দুর,
সকলে — ও ভাই জাগো...জাগোরে ভাই জাগো,
ও ভাই ওঠো...ওঠোরে ভাই ওঠো,
করো তারে দূর।

তালির তালে তাল মিলিয়ে লোহা-কাটা করাত চলে দরজার শিকের ওপর। গান আর হাততালির শব্দে ঢাকা পড়ে করাতের আওয়াজ। পাহারাদার টহল দিয়ে এদিকে মুখ ঘোরাবার আগেই কারো রানের নিচে চলে যায় করাতটা।

BanglaBook.org

মোহন ও ভাই উড়ে এসে জুড়ে বসে বড় সে চতুর,
ও ভাই উড়ে এসে..ে...ে...

একজন তারপর ?

মোহন তার সাথে যোগ দি'ছে—(প্রহরীর দিকে তাকিয়ে) কে বলো তো ?

প্রহরী কে ?

মোহন তার সাথে যোগ দিছে ছুঁচো আর ইঁদুর,

সকলে ও ভাই মারো—মারো রে ভাই মারো,
ও ভাই কাটো—কাটোরে ভাই কাটো,
করো তারে দূর।

বারবার গাওয়া হচ্ছে একই চরণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই গানের কথা আর সুর রপ্ত হয়ে যায় ফজলের। সে-ও তালি বাজিয়ে গান গায় সকলের সাথে।

মোহন ও তোর বুকে বসে খুন চুষে পেট করে সে পুর,
ও তোর বুকে বসে...ে...ে...

একজন তারপর ?

মোহন লুটে নেয় নিজ দেশে সাত-সমুদ্দুর।

সকলে ও ভাই ধরো, ধরোরে ভাই ধরো,
ও ভাই লড়ো, লড়োরে ভাই লড়ো
করো তারে দূর।

দুটো শিকের বেশ কিছুটা কাটা হয়ে গেছে। কিন্তু করাতের আওয়াজ যেন বেশি হচ্ছে এখন। গান আর তালির শব্দ ছাপিয়ে রাখতে পারছে না করাতের কুড়ুৎ-কুড়ুৎ আওয়াজ। মতি শঙ্কিত হয়। সে করাত চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে মোহনকে বলে, 'ওরে কবি, তোর গানের জারিজুরি আর চলবে না এখন। নতুন গান তৈরি কর।'

কিছুক্ষণ পর মোহন আবার নতুন গানে টান দেয়ঃ

আমার দেশের কৃষাণ-মজুর,
মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমোর,
ওরাই যে খাঁটি মানুষরে—
ঐ যে দেখ মাঝি ভাই,
বাড়িতে তার খাবার নাই,
তবু তার বৈঠা চরে কুড়ুৎ-কুড়ুৎ

সকলে কুড়ুৎ-কুড়ুৎ-কুড়ুৎ-কুড়ুৎ

হাততালি আর কুড়ুৎ-কুড়ুৎ শব্দ এবার করাতের আওয়াজকে বেমালুম ঢেকে দেয়।

মোহন ঐ যে দেখ কারিগর,
নাইক তার চালে খড়,
তার কুঁদ-বাটালি চলে তবু খুড়ুৎ-খুড়ুৎ

সকলে খুড়ুৎ-খুড়ুৎ-খুড়ুৎ-খুড়ুৎ

মোহন গোয়াল ভাইরে দেখ চেয়ে,
দেখছে কি সে ঘি খেয়ে ?
তবু সে মাখন টানে ঘুড়ুৎ-ঘুড়ুৎ।

BanglaBook.org

সকলে ঘুড়ুৎ-ঘুড়ৃৎ-ঘুড়ুৎ-ঘুড়ুৎ
মোহন তাঁতি ভাইয়া কাপড় বোনে,
ছেঁড়া কাপড় তার পরনে,
তবু সে মাকু চালায় ঠুড়ুৎ-ঠুড়ুৎ
সকলে ঠুড়ুৎ-ঠুড়ুৎ-ঠুড়ৃৎ-ঠুড়ুৎ
মোহন আমরা যে ভাই খাঁচার পাখি,
চোখের জলে ভাসে আঁখি,
খাঁচা ভেঙে কেমনে পালাই ফুড়ুৎ-ফুড়ৃৎ
সকলে ফুড়ৃৎ-ফুড়ৃৎ-ফুড়ৃৎ-ফুড়ৃৎ

রাত বারোটায় নতুন পাহারাদার আসার আগেই দুটো শিক কাটা হয়ে গেছে। এক একটার দু'জায়াগায় করাত চালানো হয়েছে দু'হাত অন্তর। অল্প আঁশের ওপর যথাস্থানে রেখে দেয়া হয়েছে ওগুলোকে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

মতি, বাদল ও আরো একজন দরজার কাছে বিছানা পেতে শুয়ে আছে।

পেটাঘড়ি রাত একটা ঘোষণা করে।

মতি শুয়ে শুয়েই দৃষ্টি ফেলে আমগাছটার টিকিতে। পাতার ওপর আলোর চিকিমিকি দেখে সে টোকা দেয় বাদলের গায়ে। বাদল কাশি দিয়ে সঙ্কেত জানায় আর সবাইকে!

ঠক-ঠক আওয়াজ তুলে টহল দিচ্ছে প্রহরী। এ দরজা থেকে ঘুরে সে এগিয়ে যাচ্ছে অন্য প্রান্তে। তার বুটের আওয়াজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। বাদল আলগোছে মোচড় দিয়ে শিকের টুকরো দুটো খসিয়ে ফেলে। সে আর আক্‌লাস চুপিসারে বেরিয়ে বারান্দার থামের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে।

প্রহরী এগিয়ে আসছে অন্য প্রান্ত থেকে। দরজার কাছে পৌছবার আগেই পেছন থেকে বাদল শক্ত হাতে তার মুখ চেপে ধরে রুমাল দিয়ে। আর আক্‌লাস তাকে জাপটে ধরে রাইফেলটা সরিয়ে নেয়।

দু'জনে তাকে মাটিতে পেড়ে তার মুখের ভেতর রুমাল গুঁজে দেয়। মুখ থেকে সামান্য আওয়াজ বের করবারও সুযোগ পায় না প্রহরী। তার লাল পাগড়িটাকে তারা দুটুকরো করে তার হাতে পায়ে বেঁধে উপুড় করে চেপে ধরে রাখে।

মতি দলের আর সবাইকে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ছুটে যায় পেছনের পাঁচিলের দিকে। বাইরে থেকে একটা দড়ির মই নেমে আসে। মই বেয়ে চটপট তারা পাঁচিলের বাইরে চলে যায়। বাদল আর আক্‌লাস এসে দেখে, ফজলও উঠছে মই বেয়ে।

বাদল ফিস ফিস করে বলে, 'এই ফজল, তুমি কেন পালাচ্ছ? কেন নিজের বিপদ বাড়াচ্ছ?'

আক্‌লাস বলে, 'আরে যেতে দাও। জলদি করো।'

বাইরে বেরিয়ে সটকে পড়ে যে যেদিকে পারে, মিশে যায় কালো রাত্রির অন্ধকারে।

অল্পক্ষণ পরেই বেজে ওঠে পাগলা ঘণ্টা। রাত্রির নিস্তব্ধতা খানখান করে দিয়ে ঘণ্টা বাজতে থাকে অবিরাম।

ফজল ছুটছে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে সে ছুটছে। একটা শুকনো খাল পেরিয়ে সে পাটখেতের ভেতর ঢোকে। চুপটি মেরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়া দরকার।

খালের ভেতর কিছু একটা গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো।

ফজল দাঁড়ায়। অন্ধকারে সাদামতো কিছু একটা নড়ছে, কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

BanglaBook.org

মানুষ! দলের কেউ নয় তো ?

ফজল ভয়ে ভয়ে নামে খালের ভেতর। কাছে গিয়ে টেনে তোলে মানুষটিকে।

'কে ? কেরে তুই ? উহ্—উহ্।'

এ যে মতিভাই! গলার স্বরে চিনতে পারে ফজল। সে বলে, 'আমি ফজল। শিগ্‌গির ওঠেন।'

মতিকে কাঁধে তুলে সে পাটখেতে নিয়ে বসিয়ে দেয়। হাঁপাতে থাকে তারা দু'জনেই।

'ব্যথা পাইছেননি মতিভাই ?'

'হ্যাঁ, পায়ে চোট লেগেছে। ছাল উঠে গেছে অনেক জায়গায়।'

'হাঁটতে পারবেন ?'

'দেখি পারি কিনা।'

টলতে টলতে দাঁড়ায় মতি। কয়েক কদম ফেলে বলে, 'পারব।'

'তবে জলদি চলেন।'

'কিন্তু কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। চশমাটা পড়ে গেছে পাঁচিল ডিঙোবার সময়।'

'আমার হাতে ধরেন। চলেন শিগগির। কোন দিগে যাইবেন ?

'নিয়ে চলো তোমার যেদিকে ইচ্ছে। তুমিতো দক্ষিণ দিকে যাবে ?'

'হ।'

'তাই চলো। রাস্তা দিয়ে যেয়ো না কিন্তু।'

'না। ধানখেতের আইল দিয়া, পাটখেতের আড়ালে আড়ালে যাইতে পারমু। আন্ধার রাইতে কেও-দেখতে পাইব না।'

'মানুষের আনাগোনার শব্দ পেলে পাটখেত ঢুকে চুপটি মেরে থাকতে হবে, বুঝলে ?'

'হ।'

ফজল একটা ধঞ্চে গাছ টেনে তোলে। ওটা ভেঙে হাত দু'য়েক লম্বা একটা লাঠি বানিয়ে নেয়। লাঠিটার এক মাথা মতির হাতে দিয়ে অন্য মাথা ধরে ফজল নিয়ে চলে তাকে অন্ধের মতো। তাড়াতাড়ি হাঁটলে তার অসুবিধা হবে ভেবে ফজল আস্তে ধীরে পা চালাচ্ছিল। মতি তাড়া দেয়, 'আরো জোরে হাঁটো, নইলে ধরা পড়ে যাব।'

ফজল এবার জোরে পা চালায়। মতি লাঠি ধরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় তার পিছু পিছু। পথে কোনো অসুবিধা থাকলে, উঁচু-নিচু থাকলে তাকে আগেই সাবধান করে দেয় ফজল।

পূর্ব দিগন্তে চাঁদ উঁকি দিয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি সরু চাঁদ। চাঁদের আকার দেখে ফজল বুঝতে পারে, বড়জোর দু'তিন দিন বাকি আছে অমাবস্যার। সে আরো বুঝতে পারে, ধলপহরের সময় হয়ে আসছে। সে বলে, 'মতি ভাই, রাইত কিন্তু আর বেশি নাই।'

'আস্তে কথা বলো।' ফিসফিসিয়ে বলে মতি। 'কোথায় এসেছ ?'

'সেরাজাবাদের খালের কিনারে আসছি। এখন কোনমুখি যাইবেন ?'

'খালে পানি আছে ?'

'না।'

'খালের ভেতর দিয়ে পুব দিকে নদীর পাড়ে চলে যাও। নদীর কিনারা ধরে চলতে চলতে দেখো নৌকা পাওয়া যায় কিনা। নৌকা একটা চুরি না করে উপায় নেই।'

BanglaBook.org

খালের ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর তারা নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছে।

ছোট শাখানদী। নাম রজতরেখা। ক্ষীণ ঘোলাটে জোছনায় নদীটাকে রুপালি চাদরের মতো মনে হয়।

তারা চলতে থাকে নদীর কিনারা ধরে। কিছুদূর গিয়েই একটা ছইওলা এক-মাল্লাই নৌকা দেখতে পায় ফজল। একটা বাড়ির নিচে নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকাটা।

'মতিভাই, একটা নৌকা পাইছি। কিন্তু নৌকার মাঝির বাড়ি বোধ করি নদীর পাড়েই। টের পাইয়া গেলে—'

'না টের পাইব না। রাতের এ সময়ে কেউ জেগে নেই। চলো, উঠে পড়ি নৌকায়।'

দু'জনেই নৌকায় ওঠে। ফজল রশি খুলে পাড়া উঠিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়।

'পুব পাড়ে লোকজনের বসতি কম। ওপাড়ে চলে যাও। আমাকেও একটা বৈঠা দাও। চোখে ভালো না দেখলেও টানতে পারব।'

দু'জনে বৈঠা টেনে যখন দিঘিরপাড় বরাবর পৌঁছে তখন সূর্য উঠে গেছে। দিঘিরপাড় ডানে রেখে আরো কিছুক্ষণ বৈঠা টানার পর তারা বড় নদীতে গিয়ে পড়ে।

'এইবার কোনমুখি যাইবেন, মতিভাই ?'

'চলো দক্ষিণপাড় চলে যাই। পাড়ি দিয়ে যেতে পারবে তো ?'

'তা পারব। কিন্তু অনেকদূর উজাইয়া পাড়ি দিতে অইব।'

'কেন ?'

'পানির তেজ খুব বেশি। সোজা পাড়ি দিলে দক্ষিণপাড় যাওয়া যাইব না। নৌকা ঠেইল্যা লইয়া যাইব মেঘনায়।'

প্রাণপণ বৈঠা টানে দু'জনে। বাঁ-দিকে একের পর এক বাহেরক, সাতকচর আর চাকমখোলা পেছনে ফেলে ধীর গতিতে উজিয়ে চলছে নৌকা। আরো কিছুদূর গিয়ে ফজর দাত্রার খাঁড়ির মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দেয়।

'এইবার আপনে বৈঠা রাখেন, মতিভাই। আমি একলাই বাইয়া যাইতে পারমু।'

অনভ্যস্ত মতি বৈঠা টেনে খুবই ক্লান্ত। সে বৈঠা রেখে সটান শুয়ে পড়ে ছই-এর নিচে পাটাতনের ওপর।

দক্ষিণ দিকে নৌকা চলছে। কিছুদূর যাওয়ার পর ফজল বলে, 'মতিভাই আমি তো প্রায় বাড়ির কাছে আইসা পড়লাম।'

'উঁহু, এখন বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না তোমার।'

'কিন্তু পেটে কিছু না দিলে এতটা পথ—'

'তা ঠিকই বলেছ। তবে চলো। বাড়ি গিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। দেরি হলে বিপদ হবে।'

বৈঠা টানতে টানতে ফজলের হঠাৎ মনে হয়, বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না। বাবা মারা যাওয়ার পর মা, বোন, আত্মীয়-স্বজন শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। তাকে দেখে কান্নার রোল পড়ে যাবে বাড়িতে। মা বিলাপ করতে শুরু করবে। তার নিজের বুকের কান্নাও বাঁধ মানবে না তখন।

ফজলের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

ভোরের রোদের ছোঁয়া লাগছে পিঠে। ফজল সুমুখে ডানে বাঁয়ে তাকায়। পরিচিত পরিবেশ তার চোখ জুড়িয়ে দেয়।

BanglaBook.org

অসংখ্য ডিঙি। ডিঙির মালিকেরা ইলিশ মাছের জাল ফেলে খোট ধরে বসে আছে। সাথের লোক গলুইয়ে বসে আছে হাল ধরে। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে ডিঙি একটার পর একটা। যেন ডিঙির মিছিল। দ্রুত ধাবমান ইলিশ মাছ জালে ধাক্কা খেলে খোট-ধরা হাত টের পায়, ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সারা শরীর। আর অমনি টান মেরে জালের ছড়িয়ে থাকা প্রান্ত দুটি একসাথে মিলিয়ে বন্ধ করে দেয়। মাছ আটকা পড়ে যায় জালের ভেতর। ফজল জানে, এ এক অদ্ভুত শিহরণ, অদম্য নেশা। কোনো এক ইলিশ শিকারি নাকি স্বপ্নে খোট পেয়ে জোরে মেরেছিল এক টান। তার আঙুল ঢুকে গিয়েছিল বউর নাকের চাঁদবালির মধ্যে। টানের চোটে আঙুলে আটকানো চাঁদবালি নাক কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কয়েকটা সরু লম্বা জেলে নৌকা নিকারির টেঁকের দিকে যাচ্ছে। সারা রাত জেগে মইজাল, টানাজাল, জগৎবেড় জাল দিয়ে জেলেরা ধরেছে যে মাছ তা বিক্রি করবে দাদনদার মাছের ব্যবসায়ীদের কাছে।

বাঁদিকে একটা সোঁতা জুড়ে ভ্যাশাল পেতেছে এক জেলে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার সাথে আড়াআড়ি লম্বালম্বি কোনাকুনি বাঁশ বেঁধে সাঁকোর মতো বানানো হয়েছে। এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে জাল। সাঁকোর সাথে ঠেকিয়ে ওটার এক কোণে শরীরের ভার চাপিয়ে পাড় দিলে পানি থেকে মাছ নিয়ে ওপরে উঠে যায় জাল। অদ্ভুত এক ফাঁদ। ফাঁদের মালিক ফাঁদ পেতে মাকড়শার মতো চুপচাপ বসে আছে সাঁকোর ওপর।

বড় বড় নৌকা গুনের টানে উজিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। কাঁধে বেল্টা ঠেকিয়ে গুন টানছে মাল্লারা। বছরের এ সময়ে ওদিকে কোথায় যাচ্ছে নৌকাগুলো—জানে ফজল। এগুলো ফজলি আম কিনতে যাচ্ছে মালদহ জেলায়। হালমাচার ওপর দাঁড়িয়ে তোঁতাশলা আর মুইন্যাশলা ধরে মাঝি হালে গুড়ি দিচ্ছে কেড়োৎ-কোড়োৎ।

পশ্চিমদিক থেকেও আসছে বড় বড় নৌকা। প্রায় পাঁচতরাস পর্যন্ত বোঝাই করা হয়েছে নৌকাগুলো। এগুলোতে গুটি আম আসছে রাজশাহী ও মালদহ জেলা থেকে। যাবে বড় বড় বন্দরে। তাড়াতাড়ি বন্দরে পৌঁছতে না পারলে আম পচে যাওয়ার ভয় আছে। তাই অনুকূল স্রোত থাকা সত্ত্বেও মাল্লারা প্রাণপণ দাঁড় টেনে চলেছে।

অনেকদিন পর ফজল ফিরে এসেছে পদ্মায়। পদ্মার পানি, পদ্মার তরঙ্গ তার অন্তরঙ্গ। পদ্মার পলিমাটি তার আশ্রয়। সে আঁজলা ভরে পানি খায়। বুকভরে টানে মুক্ত বাতাস।

ফজল ডানদিকে তাকায়। দূরে পশ্চিম দিকে একটা বাড়ি। কলাগাছের ঘন ঝাড় আড়াল করে রেখেছে ঘরগুলো। এতদূর থেকে একটা শাড়ির আঁচলও দেখা যাচ্ছে না। রূপজান কি তার কথা ভাবছে এখন?

'ফজল।'

'জ্বী।'

'বাদলের কাছে শুনেছি, তোমাকে মিথ্যে ডাকাতি মামলায় জড়িয়েছে। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

ফজলের মুখে সব ঘটনা শুনে শক্ত হয়ে ওঠে তার চোয়াল। সে রাগে ঠোঁট কামড়ায়।

'ঐ যে দ্যাখেন মতিভাই, ডানদিকে দূরে ধু ধু দেখা যায় সেই খুনের চর।'

মতি ডান দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ ঝাঁপসা দেখতে পাচ্ছি। ইংরেজদের চাঁই জমিদারগুলো হচ্ছে এই সব ঝগড়া-ফ্যাসাদের মূল। ওদের খতম করা দরকার সকলের আগে।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর আবার সে বলে, 'জানো ফজল, আগে এখানে নদী ছিল না। এখানে ছিল একটা খাল। লোকে বলতো ওটাকে রথখোলার খাল। চাঁদরায়-কেদার রায়দের রথটানা হতো ওখান দিয়ে। আগের দিনে পদ্মা ফরিদপুরের মাঝ দিয়ে বরিশালের কন্দর্পপুরের কাছে মেঘনায় মিশেছিল। এখন যেটা আড়িয়াল খাঁ সেটাই ছিল তখন আসল পদ্মা।

'আইচ্ছা! আমরা তা হইলে চরুয়া ছিলাম না, আসুলি ছিলাম!'

'হয়তো ছিলে। আগে বাঙলার মাটিতে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা ছিল এক সাথে। ব্রহ্মপুত্র গতি বদলে পশ্চিম দিকে গিয়ে যমুনার সাথে মিশে। এই দুটি নদীর স্রোত গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলে যায়। তার পরেই রথখোলার খাল ভাঙতে ভাঙতে নদী হয়ে যায়। চাঁদ রায়-কেদার রায়ের কীর্তি, রাজ রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস করে। তাই পদ্মার আর এক নাম কীর্তিনাশা।

'ভালো একটা ইতিহাসের কথা শুনাইলেন মতিভাই। আমরা তো কিছুই জানি না। জানলে কি আর আসুলিরা আমাগো নিন্দা করতে পারে? কথায় কথায় চরুয়া ভূত কইয়া ঠেশ দিতে পারে?'

'এই যে নদী, এই যে তোমাদের চর—এখানে বিক্রমপুরের অনেক গ্রাম ছিল। পদ্মা বিক্রমপুরকে দু'ভাগ করে গিয়েছে। আগে বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা ছিল ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর। নদীর ভাঙনের ফলে আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের কেউ উত্তরপাড় রয়ে গেছে। কেউ চলে গেছে দক্ষিণপাড়।'

'আমরাও তা হইলে বিক্রমপুরের লোক। এইবার আসুলিরা কেউ টিটকারি দিলেই শুনাইয়া দিমু।'

'তুমি চরের লোক বলে নিজেকে ছোট মনে করো নাকি ফজল?'

'আসুলিরা যে তাই কয়।'

'একদম বাজে কথা। দেশ, কুল, জাতি, ধর্ম দিয়ে কি ছোট-বড় বিচার হয়? মানুষের বিচার হয় তার কাজ দিয়ে—একথা মনে রেখো। তোমার বড় পরিচয় তুমি মানুষ—পৃথিবীর আর সবার মতো মানুষ। তোমার কাজে, কথায়, অবহেলায়, উদাসীনতায় কোনো লোকের সামান্য ক্ষতিও না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে সব সময়। যারা মানুষকে ভালোবাসে, মানুষের ভালো করে তারাই বড়, তারাই মহৎ। যারা মানুষকে ভালোবাসে না, মানুষের ভালো চায় না তারাই ছোট, তারাই অধার্মিক।

ফজল কথাগুলোর কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। বলে, 'আপনারাও তো মানুষরে ভালোবাসেন না। শুনছি, আপনারা ডাকাতি করেন, মানুষ খুন করেন।'

'হ্যাঁ, ডাকাতি করি, দরকার হলে খুনও করি। যারা অমানুষ, যারা দিনের পর দিন মানুষের রক্ত শোষণ করে, অত্যাচার করে, যারা বিদেশী শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে, বার বার সতর্ক করার পরেও যারা পথে আসে না, তুমি কি মনে করো তাদের বাঁচবার অধিকার আছে? বেঁচে থাকার চেয়ে তারা পচে গলে দেশের মাটির উর্বরতা বাড়াক। এদের অন্যায়-অত্যাচার আর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকার না করে উদাসীন হয়ে বসে থাকা অন্যায়। এদের ক্ষমা করা মহাপাপ।'

'কিন্তু অন্যান্য-অত্যাচারের বিচারের জন্য তো আইন-আদালত আছে।'

'আইন-আদলাত!' মতির মুখে বিদ্রূপের হাসি। একটা কাটারি যেন চিকমিকিয়ে ওঠে তার ঠোঁটের ফাঁকে। 'আইন-আদালত তো পয়সার গোলাম। পয়সাওলা শোষক গোষ্ঠীর কথায় ওঠে বসে।'

BanglaBook.org

'আইচ্ছা, এই যে গরিব মাঝির নৌকাটা চুরি করলাম। এইটা কি অন্যায় হয় নাই, আমাদের ?'

'নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে। এর প্রতিকার অবিশ্যি করতে হবে।'

'কিভাবে করবেন ?'

'সেটা পরে দেখা যাবে। আগে তো পালিয়ে বাঁচি। কতদূর এলে ফজল ?'

'উল্টা বাতাস। নাওটা জোরে চলতেছে না। যতদূর আসছি আরো দুই এতখানি গেলে পাড়ি শেষ হইব। আমি কিন্তু বাড়ি যাইতেছি না।'

'কোথায় যাচ্ছ তাহলে ?'

'সোজা দক্ষিণ পাড়, আপনে যেইখানে যাইতে চান।'

'না খেয়ে বৈঠা বাইতে পারবে তো ?'

'তা পারব। কিন্তু আপনার বোধ হয় খিদা লাগব।'

'না, লাগবে না। তুমি বুঝেশুনে যাও। দেখো কেউ যেন চিনতে না পারে।'

'না, দাড়ি-মোচে যা একখান চেহারা হইছে, সহজে কেউ চিনতে পারব না।'

একটা ছেঁড়া গামছা পড়ে আছে পাটাতনের ওপর। বোধ হয় মাঝি ওটা পা মোছার জন্য রেখেছে। ফজল ওটাই মাথায় বেঁধে নেয়। এবার আর তাকে চেনার সাধ্যি নেই কারো।

একটা ছোট লঞ্চ আসছে পুব দিক থেকে।

'কিসের আওয়াজ ?' জিজ্ঞেস করে মতি। 'লঞ্চ বোধ হয় ?'

'হ্যাঁ, ছোট্ট একটা লঞ্চ। কিন্তু চলতি বড় জবর।'

কিছুদূর দিয়ে লঞ্চটা চলে যায়।

ফজল বলে, 'কয়েকটা ধলা সাহেব যাইতেছে।'

'আচ্ছা! লঞ্চটার গায়ে কিছু লেখা আছে ?'

'হ্যাঁ, ইংরেজীতে লেখা আছে, আর্মি বোট নম্বর পি-৪৬৮। একটা সাহেব চোখে দূরবিন লাগাইয়া দেখতে আছে।'

'হুঁ, নদীতে টহল দিতে শুরু করেছে! আমাদের নৌকার নম্বর আছে তো ?'

মাথির একপাশে আলকাতরা দিয়ে লেখা নম্বর পড়ে ফজল বলে, 'হ্যাঁ আছে, ১৭৩৫ নম্বর।'

'নম্বর আছে বলেই বোধ হয় কিছু বলল না। নম্বর না থাকলে কি জানি হয় তো এখনই বিপদ ঘটত।'

ভোর থেকেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল। বেলা এক প্রহরের কিছু পরেই সারা আকাশ ছেয়ে যায় কালো মেঘে। যেন ছানি পড়েছে পৃথিবীর চোখে। ফজল বলে, 'দিনের অবস্থা বড় ভালো না। মেঘ করছে খুব।'

'ঝড় উঠবে না তো ?'

'মনে হয় না। এখন তো জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। ঝড়-তুফান না-ও আসতে পারে। উত্তরের আসমানে খাড়াঝিল্‌কি মারতে আছে খুব।'

'বৈঠাটা আমার হাতে দাও। তুমি জিরিয়ে নাও কিছুক্ষণ।'

আরো কয়েকবার বৈঠা চেয়েছিল মতি। কিন্তু ফজল দেয়নি। এবার আর সে মানা করে না। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। শ্রান্ত হাত দুটো বিদ্রোহ করতে চাইছে।

মতির হাতে বৈঠা দিয়ে বলে ফজল, 'ডাইন কোনাকুনি রাইখেন নৌকার মাথা। তা না হইলে কিন্তু ভাটির টানে জঙ্গুরুল্লার চরের দিগে লইয়া যাইব।'

BanglaBook.org

মতির হাতে বৈঠা দেয়ার আর এক উদ্দেশ্য ছিল ফজলের। সে মাঝির কাঁথার গাঁটরি তন্নতন্ন করে খোঁজে। চোঙা-চুঙি উপুড় করে ঢেলে দেখে, হাতিয়ে দেখে নৌকার উত্তরা। কিন্তু একটা আধলাও খুঁজে পায় না সে। তার আশা ছিল দু-চার আনার পয়সা পেলে চরের কোনো ছুটকো দোকান থেকে চিড়েমুড়ি কিনে নেবে। শান্ত করবে উদরের ভোক্ষসটাকে। ওটা বড় বেশি খাই-খাই শুরু করে দিয়েছে।

ফজল আবার বৈঠা হাতে নেয়। একটা খাঁড়ি উজিয়ে দক্ষিণের প্রধান স্রোতে পৌছবার আগেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

'কি করি মতিভাই এখন ? বিষ্টি তো শুরু হইল।'

'কোনো চরের কিনারায় নিয়ে যাও।'

ফজল একটা ঘোঁজার ভেতর চলে যায়। পুরো নৌকাটা ঢুকিয়ে দেয় কাশবনের ভেতর। দুটো লগি পুঁতে শক্ত করে বাঁধে দুই মাথি। তারপর সে ছই-এর ভেতর ঢুকে দু'দিকের ঝাঁপ নামিয়ে দেয়।

বৃষ্টি পড়ছে ঝরঝর। ছই-এর ওপর যেন দাপাদাপি করছে দূরন্ত ছেলেরা। ঝড়ো বাতাসে নৌকাটা দুলছে এদিক-ওদিক। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আসছে।

কাঁথার ওপর মতি শুয়ে পড়েছিল। মাঝির তেলচিটে বালিশটা তার মাথার নিচে গুঁজে দেয় ফজল।

বালিশের অর্ধেকটা ছেড়ে দিয়ে মতিভাই বলে, 'তুমিও শুয়ে পড় ফজল, জিরিয়ে নাও। বিষ্টি যেন কখন থামে ঠিক নেই।'

মতিভাই মাথার পাশে মাথা রেখে ফজল বলে, 'খিদা লাগছে না মতিভাই ?'

'খিদে তো লেগেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই তো আমি করিনি। কাজ না করে বসে বসে খাওয়ার কথা চিন্তা করাও অন্যায়। কাজ করেছ তুমি, খিদে পাওয়া উচিত তোমার।'

'আমার তো দারুণ খিদা লাগছে।'

'চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করো। যে পরিশ্রম করেছ—'

দু'জনেই চোখ বুজে পড়ে থাকে।

খাবার সময় পেরিয়ে খিদে যখন ধীরে ধীরে মরে যায় তখন ক্লান্ত অবসন্ন শরীর ঘুমে ঢলে পড়ে।

তারা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, কিছু খেয়াল নেই তাদের। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে এখনো। এখনো ঢাকা পৃথিবীর চোখ। তাই সময়ের আন্দাজ করতে পারে না তারা। তবে পেটের ভোক্ষসটা নাড়ি-ভুঁড়িগুলোকে যে রকম খুবলাতে শুরু করেছে তাতে সহজেই বোঝা যায়— খাবার সময় হয়েছে আবার। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়েছে।

বৃষ্টির পানিতে প্রায় টুবুটুবু হয়েছে নৌকার ডওরা। ফজল তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাটাতন সরায়, সেঁউতি বের করে পানি সেচে।

গলুইয়ের ঝাঁপ ফাঁক করে আকাশের দিকে তাকায় ফজল। বলে, 'বিষ্টি ছেক দেয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না, মতিভাই।'

'কিন্তু সন্ধ্যার আগে বিষ্টি না থামলে সারা রাত এখানেই পড়ে থাকতে হবে।'

'কেন ?' রাত্রেই পাড়ি দিয়া ওপার যাইতে পারব।'

'কিন্তু রাতের বেলা ওপার গিয়ে কোনো লাভ নেই। পথ চিনে যেতে পারব না।'

BanglaBook.org

'ওপারে কোনে গ্রামে যাইবেন ? কার বাড়ি ?'

'নয়নপুরে—আমার বোনের বাড়ি।'

'নয়নপুর আবার কোনখানে ?'

'পণ্ডিতসার যেতে পথে পড়ে। বছর দশেক আগে এসেছিলাম একবার। বোমার মামলায় পড়ে লুকিয়ে ছিলাম অনেক দিন। এত বছর পরে পথ চিনে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

'কোনো চিন্তা কইরেন না মতিভাই। মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে বিলাত যাওয়া যায়।'

'আজ যদি যেতে পারতাম, গিয়েই বোনকে বলতাম—"শিগ্‌গির খিচুড়ি রান্না কর, ডিম ভেজে দে।" আর যদি ইলিশ মাছ ভাজা থাকে তো কথাই নেই।'

'আর কইয়েন না মতিভাই। জিহ্বায় পানি আইসা গেল। এই ঘন ডাওরে গরম গরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা আর নয়তো আণ্ডা বিরান—ওরে মাবুদের পেটের মধ্যে খাম খাম শুরু হইয়া গেছে।'

ফজল ঢোক গিলে। তার চোখের সামনেই যেন সে দেখতে পায় গামলা ভরা খিচুড়ি। গরম গরম খিচুড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভাজা ইলিশ মাছের খিদে-চেতানো গন্ধ এসে লাগছে নাকে।

নাহ, আজ খিচুড়ি না পেলে পেটের ভোক্ষসটা কিছুতেই শান্ত হবে না। ভাবে ফজল। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় ? কার বাড়ি গেলে এখন খিচুড়ি খাওয়া যায় ? নিজেদের বাড়ি সে বহুদূর পেছনে ফেলে এসেছে। সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তার ভাইয়ের দোস্ত রফি শিকদারের বাড়ি ধুলচর। পশ্চিম দিকে মাইল খানেক উজান ঠেলে যাওয়া যায় সেখানে। কিন্তু বৃষ্টি মাথায় করে অতটা পানি ভাঙবার শক্তি নেই শরীরে। আর এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে বেশরমের মতো খিচুড়ির ফরমাশইবা দেবে সে কেমন করে ? এ খাঁড়িটা ধরে বেশ কিছুদূর পিছিয়ে গেলে তাদের কোলশরিক কেরামতের বাড়ি। সেখানে গিয়েও খিচুড়ির ফরমাশ দেয়া যাবে না। আর কোথায় যাওয়া যায় ?

হ্যাঁ, অল্প কিছুদূরেই আর একটা বাড়ি আছে। বাড়িটার কথা মনে পড়তেই কেমন একটা আনন্দ তার বিধ্বস্ত মনের ধ্বংস স্তূপ সরিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এ যেন ঠিক আনন্দ নয়, আনন্দের কালো বিষণ্ন ছায়া।

জরিনা তার কেউ নয়। কোনো সম্পর্ক নেই আর তার সাথে। কোনো দাবি নেই তার ওপর।

রূপজানও আর কেউ নয় তার।

জীবনের ভিত ধসে গেছে। ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে সব। ভগ্নস্তূপের নিচে মৃতপ্রায় মনটা তার কিছু একটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চায়।

অধিকার ও অনধিকারের সীমান্তে এসে দাঁড়ায় ফজলের অভিলাষ। মমতা মাখানো এক পলক চাহনি, সমবেদনার দুটি কথা, স্নেহের একটুখানি পরশের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে তার বিপর্যস্ত মন। মনের এই আকুতিই তাকে তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করে। এ মুহূর্তে পেটের খিদেকে ছাপিয়ে উঠেছে মনের পিপাসা।

বৃষ্টির তোড় আর নেই। শুধু টিপটিপানি আছে এখন। তাড়াতাড়ি নৌকার বাঁধন খুলে লগি দুটো তুলে ফেলে ফজল। তারপর কাশবন থেকে বের করে নৌকাটাকে সে স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য সে ছই-এর ভেতর গিয়ে বসে।

BanglaBook.org

'কি করছ ফজল ? নৌকা ছেড়ে দিলে কেন ?'

'কাছেই একটা বাড়ি আছে জানাশোনা।'

'আচ্ছা, তবে এতক্ষণ যাওনি কেন ?'

'মনে ছিল না।'

হালবিহীন নৌকা ভাটির টানে ভেসে যায় ঘুরপাক খেয়ে। কিছুদূর যাওয়ার পর নৌকাটাকে ফজল আর একটা খাঁড়ির ভেতর বেয়ে নিয়ে যায়। কিনারায় ভিড়িয়ে বাঁধে লগি পুঁতে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখনো বৃষ্টি পড়ছে টিপিরটিপির।

ফজল নেমে যায় নৌকা থেকে।

মতিভাই বলে, 'বেশি করে খাবার নিয়ে এসো। দেরি কোরো না কিন্তু।'

ফজল কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে যায়। কাশ আর লটাবনের ভেতর দিয়ে পথ। অন্ধকারে পথ চলতে চলতে সে ভাবে—জরিনার বুড়ি শাশুড়ি আছে বাড়িতে। তার চোখ এড়িয়ে কেমন করে দেখা করবে সে জরিনার সাথে ? ধারে কাছে আর কোনো বাড়ি নেই—এই যা রক্ষে।

এ তল্লাটে কোথাও চুরি হলেই হেকমতকে ধরার জন্য পুলিস আসে। জ্ঞাতিদের ঘরেও খানাতল্লাশি হয়। এজন্য বিরক্ত হয়ে তার জ্ঞাতিরা তাকে তাদের পাড়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারাই তার ঘরদোর তুলে এনে চরের এক কোণে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে।

ফজল ডাক দিয়ে উঠে, 'টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট।' না, হট্টিটির ডাক এখানো ভোলেনি সে। কিন্তু এত বছর পরে জরিনা যদি বুঝতে না পারে এ সঙ্কেত ? হেকমত আজ বাড়ি আছে কি না, তাই-বা কে জানে ?

ফজল নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ায় ঘরের পেছনে।

ঘরে কুপি জ্বলছে তরজার বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পায়, জরিনা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছে, তার শাশুড়ি শুয়ে আছে মেঝের একপাশে হোগলার বিছানায়।

ফজল সরে যায় কিছুদূরে কাশবনের কাছে। ডেকে ওঠে, টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্।

জরিনা কান খাড়া করে। বড় মধুর হট্টিটির ডাক। তার দু'আঙুলে ধরা সুইটি পড়ে যায়। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সুইটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আবার ফোঁড় তোলে সে।

টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্....

আবার সেই ডাক। কিছুক্ষণ পরে আবার, তারপর আরো কয়েক বার।

জরিনা দাঁড়ায়। দরজার কাছ থেকে বদনা নিয়ে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্....

ডাকটা আসছে কাশবনের দিক থেকে। জরিনা বদনাটা উঠানে রেখে সেদিকে এগিয়ে যায়। ওদিক থেকে ফজলও এগিয়ে আসে। কিন্তু অন্ধকারে একটা মানুষের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ঠাওর করতে পারে না জরিনা। মূর্তিটার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতেই সে নিঃশঙ্ক বিশ্বাসে মাথা নোয়ায় কদমবুসি করার জন্য।

ফজল তার দুই বাহু ধরে টেনে তোলে। ফিসফিসিয়ে বলে, 'না—না জরু, আমার পায়ে হাত দিও না। আমি—আমি পাপী, আমি ডাকাইত।' তার কণ্ঠে কান্নার রেশ কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'না—না, মিছা কথা—মিছা কথা।'

জরিনা তার হাত ধরে কাশবনের দিকে যেতে যেতে বলে, 'আমার হাউড়ি আছে ঘরে। টের পাইয়া যাইব।'

BanglaBook.org

'জরু, তুমি তো কইলা মিছা কথা। কিন্তু মাইনষে কয় আমারে ডাকাইত। রূপজান—সেও কয় আমারে ডাকাইত।' ফজলের কথায় কান্না ঝরে পড়ে।

জরিনার চোখে পানি আসে। ধরা গরায় সে বলে, 'আমি বেবাক হুনছি। আরশেদ মোল্লা যোগ দিছে জঙ্গু শয়তানডার লগে। ওরাই তোমারে ধরাইয়া দিছে।'

'হ, এর শোধ নিয়া ছাইড়্যা দিমু। শোধ নেওনের লেইগ্যাই পলাইয়া আইছি জেলেরতন।

'জেলেরতন! কবে পলাইছ?'

'কাইল রাইতে। পলাইয়া যাইতে আছিলাম দক্ষিণপাড়। বিষ্টির লেইগ্যা পাড়ি দিতে পারি নাই।'

'বাড়িত্ গেছিলা?'

'না।'

'খাইছ কনুখানে?'

'খাই নাই। কোথায় খাইমু? সাথে একটা পয়সাও নাই।'

'এতক্ষণ কও নাই ক্যান্। জলদি বাড়িত্ লও।'

'তুমি কি ভাত রাইন্দা থুইছ নি?'

'না, দুইডা চাউল ফুডাইতে বেশি দেরি লাগব না। কিন্তু খাইবা কি দিয়া? মাছ-তরকারি কিছু নাই।'

'ডাইল আছে?'

'আছে।'

'তবে খিচুড়ি পাকাইতে পারবা?'

'তা পারমু।'

'বেশি কইর‍্যা খিচুড়ি পাকাও। সাথে নৌকায় মানুষ আছে আর একজন। আর আণ্ডা থাকলে ভাইজ্যা দিও।'

'কে আছে নায়?'

'তুমি চিনবা না তারে। মস্ত বড় একজন বিদ্বান মানুষ।'

ফজলের হাত ধরে বাড়ি নিয়ে যায় জরিনা। তাকে রান্নাঘরে বসিয়ে সে ঘরে যায়। মাটির ঘড়া থেকে চলে বের করে, শিকেয় তোলা ডিবা থেকে বের করে ডাল।

'কি ঘুড়ুঘুড়ু করতে আছস বউ?' পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করে শাশুড়ি।

'এই ডাওরের মইদ্যে খিচুড়ি খাইতে মন চাইতে আছে। অল্প দুগা ভাত আছে। পানি দিয়া থুই। পান্তা খাইমু।'

শাশুড়ি বলে, 'হ, বিষ্টি-বাদলের দিনে গরম গরম খিচুড়ি ভালোই লাগে। আমি উঠ্‌মু?'

'না, আপনি আন্ধারে হুইয়া থাকেন। রাইন্দা বাইড়্যা আপনেরে ডাক দিমু।'

জরিনা এক হাতে কুপি অন্য হাতে হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যায়।

কুপির মৃদু আলোয় এতক্ষণ পরে সে প্রথম দেখতে পায় ফজলের মুখ। দাড়ি-গোঁফে বদলে গেছে চেহারা। খিদেয় শুকিয়ে গেছে মুখ। চোখ বসে গেছে। গায়ের উজ্জ্বল রঙ গেছে ফ্যাকাশে হয়ে। মাথায় এলোথেলো চুল। বহুদিন তেল-পানি না পড়ায় জট পাকিয়ে গেছে।

জরিনা নির্বাক চেয়ে থাকে ফজলের মুখের দিকে। পলকহীন দৃষ্টি মেলে ফজলও তাকায়। গোধূলির বিষণ্ন ছায়া জরিনার মুখে। মমতা-মাখা দুটি চোখের কোণে চিকচিক করে পানি।

BanglaBook.org

জরিনা চোখ নামায়। চাল-ডাল ধুয়ে বাটনা বেটে সে তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দেয়।

জরিনা চুলোর মুখে লাকড়ি গোঁজে। তার পাশে পিঁড়েতে বসে চাল চিবোয় ফজল।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙে জরিনা। সে নিচু গলায় বলে, 'মিয়াজির মরণের পর গেছিলাম তোমাগ বাড়ি। আম্মার কান্দন দেইখ্যা কইলজা ফাইট্যা যায়। মরণের দিন মিয়াজি তোমারে দ্যাখতে চাইছিল। মরার আগক্ষণে দুই-তিন বার তোমার নাম ধইর‍্যা বোলাইছিল।'

ফজল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

জরিনা এক সময়ে ঘরে গিয়ে নারকেল তেল আর চিরুনি নিয়ে আসে। চিরুনি চালিয়ে সে ফজলের চুলের জট ছাড়ায়, তারপর তেল মাখিয়ে আঁচড়ে দেয়, সিঁথি কেটে দেয় পরিপাটি করে।

'হেকমত কই ?' জিজ্ঞেস করে ফজল।

'কোনো খবর নাই। মাসখানেক আগে আইছিল একদিন রাইতে। আবার রাইতের আন্ধারেই চইল্যা গেছে।'

'মোল্লাবাড়ি গেছিলা ?'

'গেছিলাম একদিন। তোমারে যেদিন ধরাইয়া দেয় তার কয়েকদিন আগে।'

'কাইল-পরশু একবার যাইতে পারবা ?'

'উঁহু।'

'ক্যান ?'

জরিনা কোনো উত্তর দেয় না।

আগে রূপজান তাকে বড় গলায় বু'জান বলে ডাকত, হাসি-মশকরা করত কথায় কথায়। সে তার চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দিত। রূপজানকে সুন্দর করে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরতে শিখিয়েছিল সে-ই। রূপজানের বিয়ের পর জরিনা ধান ভানতে গিয়েছিল মোল্লাবাড়ি। রূপজান তার কানে কানে বলেছিল, 'বু'জান লো, তোমার ছোডকালের পুরুষটা জ্বালাইয়া মারে আমারে। রাইতে এট্টুও ঘুমাইতে দেয় না।' সেই রূপজান বদলে গেছে এখন। সেদিন কাজের খোঁজে গিয়ে কাজ তো জোটেইনি, ভালো ব্যবহারও পায়নি সে। রূপজান তাকে সোজা বলে দিয়েছে, 'আমাগ ধান ভানন্ লাগব না। আর কোনোদিন আইও না আমাগ বাড়ি।' তারপর জরিনা আর যায়নি সে বাড়ি, আর যেতেও চায় না। তার বিশ্বাস, রূপজান কিছু টের পেয়েছিল।

'কইলা না, ক্যান্ যাইতে পারবা না ?' ফজল আবার জিজ্ঞেস করে।

'কি করতে যাইমু ?'

'গিয়া রূপজানরে খালি জিগাইবা—সে ডাকাইতের ঘর করব না—এমুন কথা ক্যান্ কইল ? সত্য সত্যই কি সে বিশ্বাস করে আমি ডাকাইত ?'

'এহন আর এই কথা জিগাইয়া লাভ কি ?'

'লাভ নাই। খালি মনডারে বুঝ দিতে চাই। রূপজান আমারে ডাকাইত মনে করে, ঘিন্না করে—এই কথা ভাবলেই মনে অয় কে যেন অন্তরডারে ট্যাঁটা দিয়া খোঁচায়।'

'আইচ্ছা যাইমু একদিন।' উড়কি দিয়ে খিচুড়ি নাড়তে নাড়তে বলে জরিনা।

কিছুক্ষণ পরে খিচুড়ি নামিয়ে সে ডিম ভাজে। খাবার পরিবেশন করার আয়োজন দেখে ফজল বলে, 'নায়ের মইদ্যে আমার মতো ভুখা আছে আর একজন। তারে থুইয়া খাইতে একটুও মজা লাগব না।'

BanglaBook.org

'তোমার কাছে বইয়া তোমারে কোনো দিন খাওয়াইতে পারি নাই। আশা করছিলাম—'

জরিনার কথা শেষ না হতেই মুচকি হেসে ফজল বলে, 'হ, শেষে কইতে পারবা, আর এক বাড়ির ছ্যামড়াডা বেশি বেশি খাইয়া ফালাইল।'

হাসি ফোটে জরিনার মেঘাচ্ছন্ন মুখে।

ফজল বলে, 'সামনে বহুত দিন পইড়্যা রইছে। খাওয়ানের অনেক সুযোগ পাইবা।'

'সত্য কও তো ? আইবা তো আবার ?'

'হ, আইমু।'

'কবে আইবা ?'

'আইমু একদিন।'

'না, কইয়া যাইতে অইব।'

'তিন-চার দিন পর।'

'আমার মাথা ছুঁইয়া কও।'

মাথা ছুঁয়ে ফজল বলে, 'এই কইলাম। এইবার বিদায় দ্যাও। মতিভাই খিদায় মরতে আছে।'

জরিনা কিছুটা খিচুড়ি রেখে বাকিটা হাঁড়িশুদ্ধ তুলে দেয় ফজলের হাতে। ডিম ভাজা রাখে শরার ওপর। তারপর বলে, 'পাতিলডা গাঙের পাড়ে কাশঝোপের মইদ্যে থুইয়া যাইও। কাইল বিচরাইয়া লইয়া আইমু।'

ফজল রওনা হয়। জরিনা তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, হাত রাখে তার পায়ে। ফজল তার মাথায় হাত বুলায়।

রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছিল আর এক ঢলক। ভোররাত্রে নৌকার পানি সেচে পাড়ি দেয় ফজল। ভোর হওয়ার আগেই তারা দক্ষিণপাড় পৌঁছে যায়। ফজল তীরে নামে। তার হাত ধরে নামে মতি।

'নৌকাটা বাঁধবার দরকার নেই।' মতি বলে।

'ভাসাইয়া লইয়া যাইব তো!'

'যাকগে। নৌকার দামটা দূরের কোনো পোস্টাপিস থেকে বেনামিতে মানি অর্ডার করে দিলেই হবে।'

'কার নামে মানি অর্ডার করবেন ? মাঝির নামতো জানি না ?'

'থানার দারোগার কাছে পাঠালেই মাঝি পেয়ে যাবে টাকাটা। নৌকার নম্বরটা লিখে দেব। নৌকা চুরির পর মাঝি নিশ্চয়ই থানায় গিয়ে এজাহার দিয়েছে।'

'আইচ্ছা! এখন কোন দিগে যাইবেন ?'

'গাঁয়ের পথ ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে থাকো। কিছুদূর গেলেই একটা চক পড়বে।'

মতির হাত ধরে এগিয়ে যায় ফজল। চকে পৌঁছতে পৌঁছতে ফরসা হয়ে যায়।

চকের জায়গায় জায়গায় জমে আছে বৃষ্টির পানি। তারা ধান আর পাটখেতের আল ধরে পা চালায়। ধান আর পাট গাছের ঝরা পানিতে ভিজে যায় তাদের জামা-কাপড়।

ছড়ছড় আওয়াজ শুনে পাশের দিকে তাকায় ফজল।

'আরে কই মাছ! বিষ্টিতে কই মাছ উজাইছে মতিভাই!'

'ধরো।'

BanglaBook.org

ফজল তিনটে কইমাছ পায় ধানখেতের মাঝে। মাছের কানকোর ভেতর পাটের কোষ্টা ঢুকিয়ে সে ঝুলিয়ে নেয় হাতে। চকের শেষ মাথায় পৌঁছতে পৌঁছতে গোটা পনেরো কইমাছ কুড়িয়ে পাওয়া যায়। এক হালটের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পাওয়া যায় আরো সাতটা। সবগুলোকে সে কোষ্টায় গেঁথে নেয় মালার মতো করে।

মতি বলে, 'আজ খাওয়াটা খুব জমবেরে ফজল।'

'হ, আল্লা খুব মেহেরবান।'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ।' মতি হাসে। 'কিন্তু এই মেহেরবানিটা গতকাল জাহির করলেই ভালো করত আল্লা। কাল খিদের জ্বালায় যখন কষ্ট পাচ্ছিলাম তখন অত বিষ্টি না ছিটিয়ে আমাদের নৌকায় কিছু চিড়ে-মুড়ি ছিটিয়ে দিলে বুঝতাম আল্লা খুব মেহেরবান। তাহলে কি আর খিচুড়ি মেগে খেতে হতো কাল?'

পথের লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে।

বহু বছর পরে ভাইকে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলে বোন।

॥ আঠারো ॥

মতির বোনের বাড়ির তিনদিন ছিল ফজল। এমন একটি স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে আসবার সময় চোখ তার ছলছল করে উঠেছিল। তার নিজের বড় বোন নেই। সে অভাব পূরণের জন্যই বোধ হয় মতিভাইয়ের সাথে এমন করে দেখা হয়েছিল তার।

চণ্ডীপুর থেকে নৌকা কেরায়া করে সে বাড়ি রওনা হয়। বাড়ির ঘাটে পৌঁছতে রাত হয়ে যায় বেশ। জেল থেকে পালাবার পর রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সে।

ফজল ছই-এর ভেতর থেকে বেরোয়।

বাড়িটা অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু অন্ধকারটা যেন বড় বেশি মনে হয় তার কাছে। বাড়ির সূর্য ডুবে গেছে, তাই বুঝি এত অন্ধকার।

ফজলের দুচোখ অশ্রুতে ভরে যায়। সে নৌকার ভাড়া মিটিয়ে ঘাটে নামে। দুঃসহ বেদনায় ভরাক্রান্ত দেহটা বয়ে নিয়ে চলে পা দুটো। কিন্তু পায়ের নিচের মাটিতে যে আশ্বাস নেই, ভরসা নেই।

চলতে চলতে তার মনে আবার সেই ভয় জাগে; তাকে দেখেই বাড়ির সবাই কান্না জুড়ে দেবে। ইনিয়ে-বিনিয়ে বিলাপ করতে শুরু করবে। তা শুনে তার বাড়ি আসার কথা জেনে ফেলবে আশপাশের লোকজন। জেনে ফেলবে জঙ্গুরুল্লা আর আইনের মানুষ চৌকিদার আর দফাদারও।

ফজল দাঁড়ায়। ম্যাচবাতি জ্বালিয়ে সে ডানে বায়ে দৃষ্টি ফেলে। কিছু দূরেই দেখতে পায় তার পিতার কবর।

সে হাঁটু গেড়ে বসে কবরের পাশে। তার বুকের কান্না রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চায়। বেরিয়েও যায় দু-একবার। কান্নার বেগ রোধ করা যখন কঠিন হয়ে পড়ে তখন সে মুখটাকে শক্তহাতে চেপে ধরে নদীর কিনারায় ফিরে আসে। সেখানে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলে অনেকক্ষণ। কিছুটা শান্ত হলে চরের কিনারা ধরে সে এগিয়ে যায় পশ্চিম দিকে মেহের মুনশির বাড়ি।

দু-তিনবার দরজায় খট্‌খট্ দেয়ার পর মেহের মুনশির ঘুম ভাঙে। আচমকা ঘুম ভেঙে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে? কেডা ও?'

BanglaBook.org

'আমি। আমি ফজল।'

'ফজল, আহারে ভাই, আইছ তুমি!' কান্নাঝরা কণ্ঠে বলে মেহের মুনশি। থিতিয়ে আসা শোক আলোড়ন তোলে তার বুকের ভেতর। নিজেকে সামলে নিয়ে সে কুপি জ্বালায়। ঘর থেকে বেরিয়ে ফজলকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, 'তোমার লেইগ্যা চিন্তায় জারাজারা অইয়া গেছি আমরা। চাচিজি কাইন্দা চউখ অন্ধ কইর‍্যা ফালাইছে।'

উদ্‌গত শোকাবেগ অনেক কষ্টে সংবরণ করে ফজল বলে, 'মা-র কান্দাকাডির ডরে বাড়িতে যাই নাই। কান্দাকাডি শুনলে সব মানুষ টের পাইয়া যাইব।'

মেহের মুনশি তার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে যায়। চৌকির ওপর বসিয়ে বলে, 'বাড়িত না গিয়া ভালোই করছ। গেল রাইতের আগের রাইতে পুলিস ঘেরাও করছিল তোমাগ বাড়ি। কিন্তুক আমি জিগাই, তোমারে এই অলক্ষ্মীতে পাইল ক্যান্? জেলেরতন ক্যান্ পলাইয়া আইছ?'

'পলাইয়া আইছি শোধ নিতে। জঙ্গুরুল্লার লগে দোস্তালি পাতাইছে আরশেদ মোল্লা।'

'হ, পা-না-ধোয়ার পাও ধইর‍্যা আরশেদ মোল্লা বিশ নল জমি পাইছে খুনের চরে।'

'জমিডা ভালো কইর‍্যা খাওয়াইয়া দিমু। সবুর করেন মিয়াভাই। এই দুইডারে জবাই করতে না পারলে আমার রক্ত ঠাণ্ডা অইব না।'

'কিন্তুক খুনাখুনি কইর‍্যা কি ফয়দা অইব?'

'এই দুই জানোয়ারের লাশ পচাইয়া সার বানাইমু চরের মাডির। ওগ হারামিহয়রানির লেইগ্যাই বা'জান মারা গেছে, না অইলে বা'জান এত তাড়াতাড়ি মরত না।'

'হ ঠিক কথাই কইছ। কিন্তুক—'

'আপনে আর 'কিন্তুক কিন্তুক' কইর‍্যেন না তো মিয়াভাই। আপনে বুড়া অইয়া গেছেন। আপনের রক্তে তেজ নাই। আমার রক্ত যে টগবগ করতে আছে রাইতদিন।'

'আমার কথা হোন ফজল। খুন-জখমি কইর‍্যা আরো বিপদ অইব। মামলামকদ্দমা জেল-ফাঁসি—'

'জেল-ফাঁসিরে আর ডরাই না, মিয়াভাই। জাহান্নামি দুইডারে খুন না করতে পারলে আমার পরান ঠাণ্ডা অইব না। ওরা জাহান্নামি। ওগ মাপ করলে জাহান্নামে যাইতে অইব।'

'চর দখলের কি করবা?'

'চর দখল করতে অইব। আপনেরা একজন মাতবর ঠিক করেন। তারপর—'

'মাতবর ত তুমি।'

'আপনে একলা কইলে তো অইব না। সব্বাই যদি না মানে তবে আর কিসের মাতবর।'

'মান্‌ব না ক্যান। বেবাকে মান্‌ব।'

'কিন্তু আমি তো এখন ফেরার। ডুব দিয়া রইছি। যদি কোনোদিন ভাসতে পারি তখন না হয় আমারে মাতবর বানাইবেন। এখন কারোরে মাতবর ঠিক করেন। পলাইয়া পলাইয়া যতখানি পারি ততখানি সাহায্য আমি করমু। কিন্তু আমি চরে আইছি এই খবর যেন কেও না জানে।'

'না, একটা কাউয়ার কানেও যাইব না এই কথা। কিন্তু একবার চাচির লগে দেহা করণ তোমার দরকার।'

'মা যেই রহম কান্দাকাডি করে। বেবাক মানুষ টের পাইয়া যাইব। চৌকিদার-দফাদার টের পাইয়া খবর দিব পুলিসের কাছে।'

'হোন, আমি ভোরে গিয়া চাচিজিরে বুঝাইমু। কান্দাকাডি করতে মানা করমু। আর যদি কান্দতে চায় তয় যেন্ কাইল দিনের বেলায়ই কাইন্দা লয় কতক্ষণ। তারপর রাইতের বেলা তোমারে লইয়া যাইমু।'

BanglaBook.org

'হ তাই করেন।'

'আরে খালি কথা আর কথাই কইতাছি। তোমার খাওনের কথা জিগাইতে মনে নাই।'

'উঁহু, আমার খাওয়া লাগব না। নতুন বইন পাইছি একজন। পথে খাওনের লেইগ্যা মুড়ি, নারকেলের লাড়ু আর ফজলি আম দিছিল।'

'কে এমুন বইনডা।'

'আপনে চিনবেন না। মায়ের পেডের বইনের মতন।'

'আইচ্ছা, আমি বিছান কইর‍্যা দিতাছি। ঘুমাইয়া পড় জলদি। রাইত দুফর কাবার অইয়া গেছে।'

মেহের মুনশির ঢেঁকিঘরের এক পাশে শুকনো লটাঘাসের স্তূপ। বর্ষার সময় এগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। স্তূপের আড়ালে হোগলার বিছানায় একটা পুরো দিন শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয় ফজল। তার মনের ভেতর পদ্মার স্রোতের মতো আঁকা-বাঁকা চিন্তা বয়ে চলে। বাবা, মা, আমিনা, নূরু, স্বার্থপর রূপজান, দুঃখিনী জরিনা সবাই এসে বারবার নোঙর ফেলে সেই স্রোতে। কখনো সে স্রোত ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে। তার মাঝে ঘুরপাক খায় আরশেদ মোল্লা আর জঙ্গুরুল্লা। ফজলের মনের বিক্ষুব্ধ ঢেউ আছড়ে পড়ে তাদের ওপর।

সন্ধ্যার অনেক পরে মেহের মুনশির সাথে সে বেরোয়। বাড়ির উঠানে পৌঁছতেই নূরু ছুটে এসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। বরুবিবি শব্দ পেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। মেহের মুনশি ধমক দিয়ে তাকে বিপদের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে থামে। ফজলও অনেক কষ্টে সংবরণ করে নিজেকে।

সে মায়ের কাছে গিয়ে বসে। তাদের রুদ্ধ কান্না বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। কখনো সে কান্না ফুঁপিয়ে বেরোয়। তাদের গাল বেয়ে নামে অশ্রুর প্রপাত।

বরুবিবি ফজলের মুখে মাথায় হাত বুলায়। মা ও ছেলে দুজনেই বড় বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছে। কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না।

মেহের মুনশির তাড়া দেয়, 'ও চাচি, বেশি দেরি করণ যাইব না। কিছু খাওয়াইতে মন চাইলে জলদি কইর‍্যা খাওয়াইয়া দ্যাও।'

ফজল বাড়ি আসবে খবর পেয়ে অনেক পদ রান্না করেছিল বরু বিবি। আমিনা খাবার পরিবেশন করে। কিন্তু ফজলের গলা দিয়ে খাবার নামতে চায় না। সে শুধু চিবোয়। কয়েক গ্রাস মুখে তুলে এক গ্লাস পানি খেয়ে সে উঠে পড়ে।

বরুবিবি ঝাপসা চোখ মেলে চেয়ে থাকে ছেলের দিকে, ধরা গলায় বলে, 'কিছুই তো খাইলি না বা'জান?'

'না মা, খিদা নাই একদম! এইখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না। আমি যাই।'

বরুবিবি আবার ফোঁপাতে শুরু করে।

'তুমি কাইন্দ না মা। আমি ধারে কাছেই কোনো জায়গায় থাকমু। কারো কাছে কইওনা কিন্তুক। ও আমিনা, ও নূরু খবরদার!'

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সে মেহের মুনশির সাথে বেরিয়ে পড়ে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে।

জরিনাকে যখন কথা দিয়ে গেছে ফজল, তখন নিশ্চয়ই সে আসবে। সে জেল থেকে পালিয়েছে। তার এখন আশ্রয়ের প্রয়োজন। কিন্তু ঘরে রয়েছে শাশুড়ি। তাকে দূরে কোথাও পাঠাতে না পারলে কেমন করে তার ঘরে ফজলকে সে জায়গা দেবে? তাই সে একদিন একটা বাহানা তৈরি করে, 'আম্মা আপনের শরীলডা খুব কাবু অইয়া গেছে।'

BanglaBook.org

'বুড়া মানুষ। কাবু অইলে আর কি করমু।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নাজুবিবি।

'আমিতো আপনেরে প্যাড ভইর‍্যা দুইডা খাইতেও দিতে পারি না। আর যেই দিনকাল পড়ছে। ধান ভানতে বড় বেশি ডাক দেয় না কেও। চাউলের কল অওনে এই দশা। ঘর লেপন আর চিড়া কোডনের কামে আয় নাই।'

'হগো মা। দিন-কাল বড় খারাপ পড়ছে। তুই আমার প্যাডের মাইয়ার তনও বেশি। যারে পেডে রাখছিলাম, হেই লক্ষ্মীছাড়াডা একটা পয়সাও দেয় না। তুই না থাকলে এতদিনে মইর‍্যা যাইতাম।'

'আম্মাগো, এহন বুঝি না খাইয়া মরতেই অইব। আপনে এক কাম করেন—আপনের বইনের বাড়ি বেড়াইতে যান কয়ডা দিনের লেইগ্যা। ভাল্-ভালাই খাইয়া আহেন। আপনের শরীলডাও ভালো অইব আর এদিগে ঘরে কিছু চাউল-ডাইলও জমা অইব।'

বেড়াতে যাওয়ার নামে নাজুবিবির ঠ্যাঙ দুটো ডিলিক দিয়ে ওঠে সব সময়। বউ একা ঘরে থাকবে বলে বেড়াবার শখ চেপে রাখতে হয় তাকে। এখন বউয়ের কাছ থেকেই যখন প্রস্তাব এসেছে বেড়াতে যাওয়ার তখন সে মনে মনে খুশি হয়। মুখে বলে, 'কিন্তুক আমি গেলে তুই ঘরে একলা থাকবি ক্যামনে?'

'আমার লেইগ্যা চিন্তা কইর‍্যেন না। যেই বাড়ি কাম করতে যাইমু, হেইখানেই থাকতে পারমু আমি।'

নাজুবিবি পরের দিনই তার বোনের বাড়ি চর-কানকাটা চলে যায়।

জেল-পালানো আসামি রাতের আঁধারেই আসবে—বুঝতে পারে জরিনা। তাই দিনের বেলা যেখানেই থাকুক, যে কাজেই থাকুক, বেলা ডোবার আগেই সে বাড়ি ফিরে আসে।

ফজল কাঁজির ভাত খুব শখ করে খায়। জরিনা তাই কাঁজি পেতে রেখেছে। পানিভরা মাটির হাঁড়িতে ফেলে রাখা হয় যে চাল তারই নাম কাঁজি। কাঁজির ভাত খেতে যে সব অনুপান-উপকরণের দরকার তারও কিছু কিছু সে যোগাড় করে রেখেছে। লশকর বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছে মুঠো খানের মেথি আর কালিজিরা। এগুলো খোলায় টেলে বাটা হবে। নদীতে গোসল করার সময় শাড়ির আঁচল দিয়ে ধরেছে ছোট ছোট মাছ—চেলা আর খরচান্দা। অল্প কয়েকটা মাছ এক দিনেই যা পেয়েছিল। পরের দিন এ মাছ ধরবার সময় ভট্‌ভট্ আওয়াজ তুলে যাচ্ছিল একটা কলের নৌকা। যাচ্ছিল বেশ কিছু দূর দিয়েই। হঠাৎ ওটা মোড় নেয় কিনারার দিকে। জরিনা জাবড়ি দেয় পানির ভেতর। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয় শরীর। আঁচল ঠিক করে গায়ে জড়ায়, ঘোমটা টানে। দুটো ধলা মানুষ শিষ দিচ্ছিল। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সে দেখে পাঁচ কি দশ টাকার কয়েকটা নোট দেখিয়ে কুৎসিত ইশারা করছে একটা বাঁদরমুখো।

জরিনা পাড়ে উঠে একদৌড়ে এসে ঘরে ঢোকে। তারপর থেকে নদীর ঘাটে যাওয়ার আগে চারদিক ভালো করে দেখে নেয় সে।

সেই চেলা আর খরচান্দা মাছ কয়টা শুঁটকি দিয়ে রেখেছে জরিনা। শুঁটকি মাছের ভরতা কাঁজির ভাতের এক বিশেষ অনুপূরক।

পুরানো দুটো চাঁই ছিল ঘরের বেড়ায় টাঙানো। সে দুটোর পেটে সুতোয় গাঁথা ফড়িংয়ের টোপ ভরে সে লটা ঝোপের আঁড়ালে পেতে রাখে রোজ বিকেল বেলা। ভোরে উঠিয়ে তার ভেতর পায় পাঁচ-সাতটা করে ছোট আণ্ডালু চিংড়ি। তিন-চার দিনে অনেকগুলো হয়েছে। সবগুলোই সে জিইয়ে রেখেছে একটা পানিভরা বৌকার ভেতর। রান্নাঘরের চালে বিছিয়ে রয়েছে ফনফনে পুঁই লতা। পুঁই-চিংড়ির চচ্চড়ি ফজলের খুব প্রিয়।

BanglaBook.org

খালাসিবাড়িতে ধান ভেনে সেদ্ধ চালের বদলে আতপ চাল চেয়ে এনেছে জরিনা। এ চাল পাটায় বেটে আর কিছু না হোক কয়েকটা চিতই পিঠা বানিয়ে ফজলের সামনে দিতে পারবে সে। ঘরে গুড় আছে। এখন একটা নারকেল যোগাড় করতে হবে যেভাবে হোক।

তিন-চার দিন পরে আসবে বলেছিল ফজল। কিন্তু সাত দিন পার হয়ে গেছে সে এল না। জরিনার একবার মনে হয়, সে আর আসবে না। পরক্ষণেই আবার মনে হয়—পুলিসের ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে হয়তো। সেখান থেকে বেরুতে পারছে না।

জরিনা চাঁই দুটো নিয়ে নদীর পাড়ে যায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের গায়ে এক ফালি মেঘ বিঁধে রয়েছে বর্শার ফলার মত। সে আঘাতে সূর্যের রক্ত যেন ছড়িয়ে পড়েছে টুকরো টুকরো মেঘের ওপর।

শাড়িটাকে কোমরে গুঁজে হাঁটুর ওপর তুলে নেয় জরিনা। তারপর পানিতে নেমে চাঁইদুটো লটা ঝোপের ভেতর পেতে রাখে।

ডাঙায় উঠেই তার চোখে পড়ে একজোড়া বক। বকদুটো পাখা ঝাড়ছে, ঠোঁট দিয়ে একে অন্যের পালকে বিলি দিচ্ছে। আজকের মতো শেষ হয়েছে ওদের মাছ শিকার। এখন রাতের আস্তানায় ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বগা উড়ে এসে তাড়া করে জোড়ের বগাটাকে। ওটাকে অনেক দূর হটিয়ে দিয়ে সে বগির দিকে আসে এবং গলা বাড়িয়ে ঠোঁট নেড়ে সোহাগ জানায়। বগিটা উড়াল দিয়ে ওর ভীরু দুর্বল সঙ্গীর কাছে চলে যায়। শক্তিশালী বগাটা আবার আক্রমণ করার আগেই বগা আর বগি সোজা দক্ষিণ দিকে উড়ে চলে যায়।

পলকহীন চোখ মেলে জরিনা চেয়ে থাকে উড়ন্ত বক-জোড়ার দিকে। ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে সে ঘরের দিকে রওনা হয়।

আবার ফজলের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয় তার মন। তাকে পুলিস ধরে নিয়ে যায়নি তো?

জরিনার বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। চোখের কোণে চকচক করে পানি।

হঠাৎ তার মনে হয়, বেগানা পুরুষের জন্য এমন করে চিন্তা করা তার অন্যায়। ঘোর অন্যায়। নিজের স্বামীর জন্য সে-তো এমন করে ভাবে না। তার স্বামী ফেরার। পুলিসের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কি খায়, কোথায় থাকে, ঠিক-ঠিকানা নেই। তার জন্য তো একফোঁটা পানিও ঝরে না তার চোখ থেকে।

হঠাৎ দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার দু'গাল বেয়ে।

এ অশ্রু কার উদ্দেশে তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন বোধ করে না জরিনা। তার মনের অপরাধবোধটাই এখন সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে।

আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে পাশের চর থেকে। শিথিল আঁচল টেনে মাথায় দেয় জরিনা। ঘরে গিয়ে কুপি জ্বালে। নামাজ সে কদাচিৎ পড়ে। কিন্তু আজ হঠাৎ নামাজ পড়ার তাগিদ অনুভব করে সে তার মনের ভেতর।

সে অজু করে নামাজের জন্য দাঁড়ায়। অজু করা সত্ত্বেও কেমন না-পাক মনে হয় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সারা শরীর ছেয়ে রয়েছে কেমন এক অশুচিতা।

একটা মাত্র ভালো শাড়ি আছে তার। গোলাপী রঙের সেই শাড়িটাই তার পরনে। আজই ওটা বাক্স থেকে নামিয়ে ধোয়া হয়েছিল। এ পরিষ্কার শাড়িটাই তার কাছে নাপাক মনে হয়।

জরিনা শাড়িটা খুলে তালিমারা একটা শাড়ি পরে। আবার অজু করতে বসে প্রথমেই সে চোখের কাজল পানি দিয়ে ঘষে মুছে ফেলে। নখ দিয়ে আঁচড়ে তোলে কপালের টিপ। যত্ন করে বাঁধা খোঁপাটাও খুলে ফেলে সে।

BanglaBook.org

নামাজের শেষে সে মোনাজাত করে, 'আল্লাহ তুমি রহিম, তুমি রহমান। আমার গুনা তুমি মাপ কাইর‍্যা দ্যাও আল্লা। আমার শরীলের গুনা, মনের গুনা, চউখের গুনা মাপ কইর‍্যা দিও আল্লাহ্। *রাববানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাও ওয়াকেনা আজাব আন্-নার। আমিন।*'

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে চরের বুকে। জরিনা বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। চলন্ত নৌকার পালগুলো অস্পষ্ট হতে হতে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। চাঁদহীন আকাশে তারার মহোৎসব।

আজ আর রান্না-বান্নার প্রয়োজন নেই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সে ধান ভেনেছে গাজিবাড়ি। দুপুরে সেখানেই খেয়েছে। আজ রাতে তার না খেলেও চলবে।

জরিনা ঘরে গিয়ে কুপি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। গত তিনচার দিন কুপি জ্বালিয়ে সে অনেক রাত পর্যন্ত বসে কাটিয়েছে। নষ্ট করেছে যুদ্ধের বাজারের দুষ্প্রাপ্য কেরোসিন। সে কয়দিনের ঊনা ঘুমের জন্য এখন দুনা ঘুমের প্রয়োজন। আজ আবার সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। এ অবস্থায় শুতে না শুতেই চোখ বুজে আসার কথা। কিন্তু চোখ বুজেও ঘুম আনতে পারছে না জরিনা। সে নামাজে বসে মনের যেসব গুনা, অবাঞ্ছিত ভাবনা-চিন্তা, কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে এসেছিল, তাড়িয়ে দিয়েছিল উড়তে সক্ষম পাখির ছানার মতো, সেগুলো এখন ফিরে আসতে চাইছে মনের নীড়ে।

এশার নামাজের আজান শুনে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে জরিনা। কুপি জ্বালে। অজু করে নামাজে দাঁড়ায়। নামাজ শেষ করে মোনাজাতের জন্য হাত উঠায়, 'আল্লা সব গুনা মাপ করো আল্লা। শরীলের গুনা মনের গুনা, চউখের গুনা—সব গুনা—'

টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্।

জরিনার প্রার্থনা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। সে তাড়াতাড়ি কুপিটা নিবিয়ে আবার শুরু করে, 'আল্লা আমার সব গুনা মাপ করো। *রাববানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া—*'

টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্....

'রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া—'মোনাজাতের পরেরটুকু আর মনে আসছে না তার। কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কোনো রকমে সে 'আমিন' বলে মোনাজাতের হাত বুলায় চোখে ও কপালে।

টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টিঁ-হট্।

জরিনা কানে আঙুল দেয়। কিন্তু তবুও সে স্পষ্ট শুনছে, বারবার শুনছে হট্টিটির ডাক। তার মনের তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে যে টিঁ-টিঁ ডাক, তাই বুঝি শুনছে সে।

জরিনা ঘর থেকে বেরোয়। ডাকটা অনেক কাছে শোনা যাচ্ছে এখন। সে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরের পেছনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

টিঁ-টিঁ-টিঁ আর শোনা যাচ্ছে না এখন। তবে কি ফজল চলে গেল ? ভাবে জরিনা। যাক চলে যাক। আল্লায় যেন তার মুখ আর না দেখায়।

অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যায়। জরিনা রান্নাঘরের কোণের দিকে গিয়ে উঁকি মারে। একটা মূর্তি উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ঠাঁয়।

কিছুক্ষণ পরে মূর্তিটা নড়েচড়ে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে দরজার ওপর টোকা দেয় কয়েকবার। কোনো সাড়া না পেয়ে ভেজানো দরজাটা খোলে। ম্যাচবাতি জ্বালিয়ে দেখে ঘরে কেউ নেই। মেঝেতে বিছানা পাতা। বালিশের পাশে একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পড়ে রয়েছে।

BanglaBook.org

সে দরজাটা ভেজিয়ে উঠানে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিড়ি ধরায়। সে সময়ে দেশলাইর আলোয় এক লহমার জন্য ফজলের মুখ দেখতে পায় জরিনা। তার অন্তরের স্নেহ-মমতা শাসন-শৃঙ্খলা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফজল রওনা হয়। জরিনার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে সাথে বুকটা যেন তার রিক্ত হয়ে যায়।

কিছুদূর গিয়েই ফজল ফিরে আসে। তার পায়ের মৃদু শব্দে জরিনার বুকের হাহাকার থামে।

ফজল ঘরে গিয়ে ম্যাচবাতি জ্বালিয়ে কুপি ধরায়। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে সে বুঝতে পারে, খাবার হাঁড়ি-পাতিল এ ঘরে রাখা হয় না।

কুপি হাতে সে রান্নাঘরে যায়। সব হাঁড়ি-পাতিল চুলোর পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এক কোণে একটা পানির কলসি। তার পাশে একটা মাটির বৌকা বাঁশের চালুনি দিয়ে ঢাকা। ওটাও বোধহয় পানিভরা।

ফজল চালুনিটা সরিয়ে হাত দেয় বৌকার ভেতর। সাথে সাথেই ভয়ে সরিয়ে আনে হাতটা।

ব্যথায় উৎপীড়িত মুখেও হঠাৎ হাসি ফোটে জরিনার। রান্নাঘরের পেছন থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে সব কিছুই দেখছিল।

ফজল কুপিটি বৌকার মুখের কাছে নিয়ে দেখতে পায়—চিংড়ি মাছ গিজগিজ করছে পানির ভেতর। সে বোকার মতো হেসে ওঠে। ভাগ্যিস পান্তাবুড়ির মতো শিং মাছ জিইয়ে রাখেনি জরিনা।

কুপিটা নিবিয়ে সে বেড়া হেলান দিয়ে বসে থাকে। আহাদালীর ছোট্ট ডিঙি বেয়ে সে এসেছে। কেউ না দেখে সেজন্য ধানখেতের ভেতর ওটাকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। এখন ওটা তুলে এত রাত্রে কার বাড়ি গিয়ে সে আশ্রয় নেবে?

খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। ফজল কুপিটা জ্বালায় আবার। সে বৌকার ভেতর থেকে কয়েকটা চিংড়ি মাছ তোলে। জীবন্ত মাছগুলো ছটকা মেরে ছিটকে পড়ে এদিক ওদিক। সে ওগুলোর খোসা ছাড়ায়। চিৎনা একটা হাঁড়ির ভেতর পানি ঢেলে মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নেয়। খুঁজেপেতে একটা চিমটা পাওয়া যায় বেড়ার সাথে গোঁজা। সেটার সাহায্যে একটা মাছ পাটখড়ির আগুনে ঝলসিয়ে সে মুখে দেয়। চিবোতে চিবোতে লবণের খোঁজ করে।

জরিনা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। তার বুকের ঝড় ছিন্নভিন্ন করে দেয় সব বাঁধা-বন্ধন। চোখের প্লাবনে ভেসে যায় সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। সে চোখ মুছে ঘোমটা টেনে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায় রান্নাঘরের দরজায়।

ফজল চমকে পেছন ফিরে তাকায়। তার মুখে মলিন হাসি ফুটতে ফুটতে মিলিয়ে যায় জরিনার চোখে পানি দেখে।

দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কারো মুখ দিয়েই কোনো কথা বেরোয় না। নিজেকে সামলে নিয়ে ফজল বলে, 'ঘরে অতিথি আইলে মানুষ খুশি অয়। তোমার চউখে পানি দেইখ্যা মনে অয় তুমি খুশি অও নাই।'

জরিনা নিরুত্তর। তার চোখের পানির উৎস কোথায় ফজল জানে। তাই পরিবেশটা স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে সে আবার বলে, 'তুমি খুশি অও নাই, কেমন?'

BanglaBook.org

'না।'

ফজল জানে এটা তার অন্তরের কথা নয়। সে খুশি হয়েছে এ কথা তার মুখ থেকে শুনবার জন্য সে আবার বলে, 'সত্য কইর‍্যা কও, তুমি খুশি আছ?'

'না।'

'তবে আমি চইল্যা যাই।'

জরিনা কোনো উত্তর দেয় না। চুলোর পাশ থেকে সে ভাতের হাঁড়িটা তুলে নেয়। ঘর থেকে চাল এনে ধুয়ে বসিয়ে দেয় চুলোর উপর।

'জানো জরিনা, চাউল বড় মাংগা অইয়া গেছে।'

'হ, আমিও হুনছি। তিন ট্যাহা মনের চাউল পাঁচ ট্যাহা অইয়া গেছে।' চুলো ধরাতে ধরাতে বলে জরিনা।

'দাম আরো বাড়ছে। আইজ দর উঠছে সাড়ে পাঁচ টাকায়।'

'মানুষ এইবার না খাইয়া দপাইয়া মইর‍্যা যাইব।'

'হ, এইবার কী যে উপায় অইব মানুষের, কওন যায় না। দুনিয়াজোড়া লড়াই চলতে আছে। চিনি পাওয়া যায় না। কেরোসিন পাওয়া যায় না—'

জরিনা বৌকার ভেতর থেকে আরো কয়েকটা চিংড়ি মাছ তোলে। মাছ কুটতে কুটতে সে বলে, 'খুব খিদা লাগছে, না?'

'হ সাংঘাতিক—'

'খিদার চোডে মাছ পোড়াইয়া খাইতে শুরু করছিলা। পোড়া মাছ তো ভূতের ভোগে লাগে।'

'হ ভূতই অইয়া গেছি। আইজ পুলিস আইছিল। খুব তালাশ করছে। সারাডা দিন আছিলাম একটা পাটখেতের মইদ্যে।'

'ভাত ফুটতে বেশি দেরি লাগব না। তুমি চালের উপরতন কয়েকটা পুঁই এর আগা কাইট্যা আনো।'

ফজল পুঁই-এর ডগা কেটে এনে দেয়।

রান্না শেষ হয়। চুলোর পাশে পিঁড়ি বিছিয়ে ফজলকে খেতে দেয় জরিনা। মাটির বাসনে ভাত বাড়তেই ফজল বলে, 'আমি আসছি বুইল্যা তুমি তো খুশি অও নাই। নিজের মোখেই তখন না করছ। বেখুশি মাইনষের ভাত তো মোখে দিতে ইচ্ছা করে না।'

'বেখুশি মাইনষেরে দিয়া ভাত তো রান্দাইয়া ছাড়ছ। এহন মোখে দিতে ইচ্ছা করব না ক্যান?' জরিনা মাছের সালুন দিতে দিতে বলে।

'সত্য কইর‍্যা কও জরিনা, তুমি খুশি অইছ? না কইলে এই উইঠ্যা গেলাম আমি।' ফজল সত্যি সত্যি উঠবার উদ্যোগ করে।

'হ, খুশি অইছি। এইবার বিছমিল্লাহ করো।'

'তুমি খাইবা না?'

'আমি খাইছি।' মিছে কথা বলে জরিনা।

'আবার অল্প কইর‍্যা খাও আমার লগে।'

'যহন দিন আছিল, তহনই একসাথে খাওয়ার সযোগ পাই না। এহন আর—'

পেটে খিদে নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করতে ভালো লাগে না ফজলের। সে গোগ্রাসে খেয়ে চলে আর জরিনা বেশি বেশি করে ভাত তরকারি তুলে দিতে থাকে তার পাতে।

BanglaBook.org

মেঝেতে পাতা হোগলার ওপর একটা নকশি কাঁথা বিছিয়ে দেয় জরিনা। তেলচিটে বালিশের ওপর বিছিয়ে দেয় নিজের হাতের তৈরি গেলাপ। তারপর মশারি খাটাতে খাটাতে বলে, 'এইবার শুইয়া পড়। রাইত দুফর পার অইয়া গেছে।'

'তোমার বালিশ কই ? তুমি শুইবা না ?'

'উঁহু, আমি বইয়া পাহরা দিমু। জানোই তো চোরের বাড়ি। চৌকিদার-পুলিস আইতে পারে যে কোনো সময়।'

'পুলিস আইতে পারে!' আঁতকে ওঠে ফজল। 'তবে তো এইখানে থাকন ঠিক না!'

'আগে আইতো ঘন ঘন চোরবক্সরে ধরতে। এহন ক্বচিৎ কোনোদিন আহে।'

'কিন্তু আমি ঘুমাইমু আর তুমি সারা রাইত জাইগ্যা থাকবা ? তার চাইতে দুই জনই জাইগ্যা থাকি না ক্যান্। কথা কইতে কইতে রাইত পোয়াইয়া যাইব।'

অতীতের গর্ভে ডুবে যাওয়া নানা কথা, নানা স্মৃতি ভেসে উঠছে জরিনার মনেও। কিন্তু জরিনা এদের বেরুবার সুযোগ না দিয়ে বলে, 'উঁহু কথা কইও না আর। নিসাড় রাইতের কথা অনেক দূর থিকা হুনা যায়।'

ফজল আর কথা বলে না।

জরিনা আবার বলে, 'হোন, পুলিস আইলে যদি পলাইতে না পার, তবে ঐ কোনায় খাড়াইয়া থাকবা। আমি তোমারে হোগলা দিয়া প্যাঁচাইয়া দিমু। কেও বুঝতেই পারব না।'

'হেষে দম ফাপর অইয়া মইর‍্যা যাইমু না তো!'

'উঁহু। মরবা না। চোরা ভাদাম্যারে এই রহম কইর‍্যা বাঁচাইয়া দিছিলাম একদিন।'

জরিনা দরজায় খিল লাগিয়ে নিজের জন্য নামাজের মাদুরটা বিছিয়ে নেয়। তারপর কুপটি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে বসে পড়ে তার ওপর।

ফজল বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে। রূপজানের কোনো খবর এখনো দেয়নি জরিনা। আর দিবে বলেও মনে হয় না। জরিনার বোধ হয় ভালো লাগে না রূপজানের নাম শুনতে। ফজলেরও তাই কেমন বাধোবাধো ঠেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। শেষে দ্বিধা কাটিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'মোল্লাবাড়ি গেছিলা ?'

'না।'

'কোনো খবর আছে ?'

'হোনলাম, রূপজানের নিকার কথা পাকা অইয়া গেছে।'

'নিকা! কার লগে ?'

'ফুলপুরী মওলানার লগে।'

'অ্যাঁ!' উত্তেজনায় চিড়বিড়িয়ে উঠে বসে ফজল। 'ঐ বুইড়্যার লগে! ঐ পাকনা দাড়িওয়ালার লগে। রূপজান রাজি অইছে ?'

'মাইয়ালোক রাজি অইলেই বা কি, না অইলেই বা কি।'

'বোঝলাম জঙ্গুরুল্লা আছে এর মইদ্যে। নিজের পীররে খুশি করণের কারসাজি।'

ফজল দাঁতে দাঁত ঘষে। তীব্র ক্রোধে ফুলে ওঠে তার সারা শরীর। পেশিগুলো শক্ত হয়ে ওঠে।

জরিনা চেয়ে আছে মশরির দিকে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শুধু শোনা যায় ফজলের ফুঁসে ওঠা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

BanglaBook.org

জরিনা তিনবার আয়াতুলকুরসি পড়ে আঙুল দিয়ে কুণ্ডলী দেয় তার চারদিকে আর মনে মনে প্রার্থনা করে, এই কুণ্ডলী ডিঙিয়ে দাগাবাজ শয়তান যেন তার কাছে আসতে না পারে।

ফজল বিড়ি টানছে বসে বসে। বিড়ির আগুন আলেয়ার মতো জ্বলছে আর নিভছে। জরিনার মনে হয়, আলেয়াদানা যেন দাগা দেয়ার চক্রান্ত করছে। আলোয় আকৃষ্ট পোকার মতো তাকে টানছে আর টানছে।

সে চোখ বন্ধ করে। দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে বিছানো মাদুরটা।

অনেকক্ষণ পর চোখ খোলে জরিনা। নিঃসীম অন্ধকারে সে ডুবে আছে। সাদা মশারির অস্পষ্ট আভাস চোখে পড়ে কি পড়ে না। কিন্তু তার অন্তরালের মানুষটিকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, শুনতে পায় তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

জরিনার মনের কোটরে ঘুমিয়ে থাকা চামচিকেটা জেগে ওঠে। নিশির ডাকে নিশাচরী বেরিয়ে যেতে চায়। তার ডানার ঝাপটায় জরিনার আঁকা আয়তুল কুরসীর কুণ্ডলী দূরে সরে যাচ্ছে, ফিকে হয়ে যাচ্ছে বুঝি।

জরিনা উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ার সাথে ঝুলিয়ে রাখা তসবি ছড়া সে নামিয়ে আনে। মুসল্লি বাপের স্মৃতিচিহ্ন এ হাজার দানার তসবি। লক্ষ লক্ষ বার জপিত আল্লার নাম ওর প্রতিটি গুটিকায়।

মাথা ও শরীর গলিয়ে সে তসবির মালা নামিয়ে দেয় মাদুরের ওপর। তসবির নিরাপদ আবেষ্টনীর মাঝে সে এবার শক্ত হয়ে বসে।

ফজলও বসে আছে। রূপজানের নিকের খবর শুনে তার রক্ত টগবগ করে উঠেছিল। সে রক্তে এখন উত্তাল তরঙ্গ। সে কোথায় কোন পরিবেশে আছে সে দিকে এতটুকু খেয়াল নেই। প্রতিহিংসার পরিকল্পনায় নিবিষ্ট তার মন।

আরশেদ মোল্লা আর জঙ্গুরুল্লা মানুষ নয়। মানুষের সুরত ধরে পয়দা হয়েছে দুটো জানোয়ার। ওদের চেহারা বিকৃত বীভৎস হয়ে দেখা দেয় তার মনের চোখে। ওদের চুল-দাড়ি যেন জড়াজাড়ি করে ঝুলছে সুতানালি সাপের মতো।

জাহাজের ফুঁৎ-ফুঁৎ সিটি শুনে সংবিৎ ফিরে পায় ফজল। ঝপ্‌পড় ঝপ্‌পড় আওয়াজ তুলে জাহাজ চলছে। কাশি দিয়ে গলা সাফ করে সে ডাকে, 'জরিনা ঘুমাইছ ?'

'না। তোমার কি ঘুম ভাইঙ্গা গেল ?'

'না, ঘুমাই নাই এহনো।'

'ঘুমাও, রাইত দুফর কুত্তু পার অইয়া গেছে।'

'ঘুম আর আইব না। তোমার ঘরে কেরোসিন তেল আছে ?'

'কেরোসিন দিয়া এত রাইতে কি করবা ?'

'আছে কোনো দরকার।'

'কি দরকার ?'

'সাপের খোন্দলে আগুন লাগাইমু।'

'এত রাইতে সাপের কথা মনে অইল ক্যান ? সাপের ব্যথা দ্যাও নাই তো ?'

'সাপের জাত। ব্যথা না দিলেও তো কামড়াইতে পারে।'

'আইচ্ছা, রাইত পোয়াইলে যোগাড় কইর‍্যা দিমু। তুমি ঘুমাও এইবার।'

জরিনা উঠে গিয়ে মশারির চারপাশ গুঁজে দেয় হোগলার তলা দিয়ে। তারপর বলে, ভালো কইর‍্যা গুঁইজ্যা দিছি মশারি। সাপ-খোপ আর ঢুকতে পারব না। তুমি নির্ভাবনায় ঘুমাও এইবার।'

ফজল বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। জরিনা গিয়ে বসে তসবির নিরাপদ বেষ্টনীর মাঝে।

BanglaBook.org

॥ উনিশ ॥

জরিনার বাড়িতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। তার শাশুড়ি বা স্বামী যে কোনো সময়ে এসে যেতে পারে। চৌকিদার-দফাদার বা পুলিসও হঠাৎ হানা দিতে পারে হেকমতকে ধরবার জন্য।

নিরাপদ আশ্রয় আছে অনেক। কিন্তু এখানকার বাতাসে যে স্নেহ-প্রীতি, পরিবেশে যে অন্তরঙ্গতা, তা কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ? হয়তো পাওয়া যাবে কোথাও—ফজল ভাবে। কিন্তু সকলের স্নেহ-প্রীতিতে কি আন্তরিকতা আছে ? অন্তরঙ্গ পরিবেশও হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু সব অন্তরঙ্গতার অন্তকরণ নাও থাকতে পারে।

ফজলের হাতে অনেক কাজ। দূরের কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। আর ধারেকাছের কোনো বাড়িতে থাকতেও সাহস পায় না সে। কখন কে পুলিসের কাছে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেবে তার কি কোনো ঠিক আছে ? নিজের বউয়ের বাপই যখন এমন কাজটা করতে পারল, তখন আর সে কাকে বিশ্বাস করতে পারে ?

জরিনাদের বাড়ির পুবদিকে একটা ধানখেত। সেটা পেরিয়ে আরো পুবদিকে বহুদূর বিস্তৃত পাটখেত। এই পাটের অরণ্যে আস্তানা গাড়ে ফজল, লুকোবার একটা জায়গা করে নেয়। একটা ছোট চৌকির আয়তনের সমান জায়গার পাট সে উপড়ে ফেলে, বিছিয়ে দেয় সেগুলো মাটির ওপর। পাটগুলোর কয়েকটা নখ দিয়ে চিকিয়ে সে কোষ্টা বের করে! এ কোষ্টা দিয়ে দুপাশের পাটগুলোকে ধনুকের মতো বাঁকা করে জোড়ায় জোড়ায় বাঁধে। এভাবে ছই-এর একটা কাঠামো তৈরি করে ফেলে সে। এবার কাঠামোর ওপর কয়েকটা আস্ত কলার 'ডাউগ্‌গা' বিছিয়ে কোষ্টা দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। ছইটা মুষলধার বৃষ্টি ঠেকাতে না পারলেও দুপুরের রোদ আর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঠেকাতে পারবে বলেই মনে হয় ফজলের। সে বিছানার জন্য একটা ছেঁড়া মাদুর, শিথানের জন্য তুষভরা ছোট্ট একটা থলে আর একটা মাথাল নিয়ে এসেছিল জরিনার কাছ থেকে। প্রবর বর্ষণের সময় মাথালটা দরকার হবে। তখন মাদুরটা গুটিয়ে থলেটা বগলে নিয়ে, মাথালটা মাথায় চড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে বসলে ভিজতে হবে না তেমন, আর বিছানাটাও জবজবে হবে না ভিজে।

তুষের বালিশে মাথা রেখে মাদুরের ওপর শোয় ফজল। খুব একটা খারাপ লাগছে না। ছেঁড়া কলাপাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সাদা মেঘ, কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছে। মেঘ সরে গেলে উঁকি দেয় রোদ। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটায় ফেটে যাচ্ছে ছই-এর কলাপাতা।

দক্ষিণ দিক থেকে চিঁট-চিঁট-চিঁট পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। ফজল মাথা উঁচু করে। পাটগাছের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে তার। সে দেখতে পায়—কিছু দূরে পাটগাছের সাথে বাসা বুনছে বাবুই পাখি। এ পাটখেতের পরেই ধানখেত। আউশ ধান পাকার সময় হয়েছে—বুঝতে পারে ফজল।

আউশ ধান পাকার সময় হলে আসুলি এলাকার তাল-বাবলা গাছের বাসা ছেড়ে ঝাঁক বেঁধে এগুলো আসে। দূর থেকে আসা-যাওয়ার সময় নষ্ট হয়, ডানায় ব্যথা ধরে, পেটের দানাও যায় হজম হয়ে। তাই ধানখেতের কাছাকাছি কোনো পাটখেতে এরা অস্থায়ী বাসা তৈরি করে। শুধু চর অঞ্চলেই নয়, আসুলির বিল অঞ্চলেও এরা ধান পাকার সময় এ রকম অস্থায়ী বাসা তৈরি করে।

ফজল ভাবে, সময়ের মূল্য এ ছোট পাখিগুলোও বোঝে। তাই ওরা তাদের মতোই তৈরি করছে ভাওর ঘর।

BanglaBook.org

শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ ডুবে গেছে। ফজল পাটখেত থেকে বেরোয়। এগিয়ে যায় নদীর দিকে। নদীর পাড়ের ধানখেতে ডুবিয়ে রাখা ডিঙিটা তুলে সে চরাটের ওপর বৈঠা নিয়ে বসে। চারদিকটা ভালো করে দেখে নেয়। টহলদার কলের নৌকার সন্ধানী আলো দেখা যায় না কোথাও। এ কলের নৌকার ভয়ে রাতে নৌকা চলাচল প্রায় বন্ধ। জেলেরাও সন্ধ্যার আগেই জাল গুটিয়ে কোনো নিরাপদ ঘোঁজায় পাড়া গেড়ে বিশ্রাম নেয়।

ফজল নলতার খাঁড়ি ধরে বেয়ে নিয়ে যায় ডিঙিটাকে।

টুকরো টুকরো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। যেন ধোপার কাপড় শুকোবার মাঠ। মেঘের ফাঁক দিয়ে তারা উঁকি মারছে। দিনের দুপুর থেকে রাতের দুপুর পর্যন্ত দাপাদাপি করে বাতাসের ডানা এখন ক্লান্ত। ক্রান্তি নেই শুধু পানির। গা দুলিয়ে নেচে নেচে কুলকুল গান গেয়ে অবিরাম বয়ে যাচ্ছে পানি। রুপালি পানির আভাস পাওয়া যাচ্ছে অন্ধকারেও।

উজান ঠেলে ধীরগতিতে চলছে ডিঙি। নিজের বৈঠার শব্দের সাথে তাল রেখে চলছে ফজলের হৃদস্পন্দন।

যে কাজের জন্য সে বেরিয়েছে, তার পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এখন ডিঙিটাকে পেছনে ফেলে তার মন পৌঁছে গেছে ঘটনাস্থলে।...উত্তর ভিটির এ ঘরে থাকে আরশেদ মোল্লা। ব্যাটা জানোয়ার! কোনো দয়ামায়া নেই তোর জন্য। বাইরে থেকে দে শিকল এঁটে দুটো দরজায়। জানোয়ারটা বেরুতে পারবে না আর। চারদিকের বেড়ায় দে কেরোসিন ছিটিয়ে। ভয় কিসের ? ম্যাচবাতির কাঠি জ্বালিয়ে দে আগুন!

ফজলের মনে দাউদাউ করে জ্বলছে ক্রোধের আগুন।

আগুন! আগুন! বাঁচাও! বাঁচাও!!

হঠাৎ অনেক মানুষের আর্ত চিৎকার ফজল শুনতে পায় তার নিজের মনে।

বাঁচাও! বাঁচাও!!

এ চিৎকার শুধু আরশেদ মোল্লার নয়। রূপজানের চিৎকারও যে শোনা যাচ্ছে। আগুন কি ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমভিটি ঘরেও ? হ্যাঁ তাইতো! ঘরের লাগোয়া ঘর। শাঁ-শাঁ করে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন।

রূপজান!

একটা অস্ফুট চিৎকার দিয়ে চেতনা ফিরে পায় ফজল। তার বৈঠা টানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাল ছেড়ে দেয়ায় ঘুরে যাচ্ছিল ডিঙিটা।

ফজল ডিঙিটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে নেয়। কিছুদূর গিয়ে আরেকটা খাঁড়ির মধ্যে ঢোকে। ভাটির টানে এবার দ্রুত এগিয়ে যায় ডিঙি।

সব চক্রান্তের মূলে আছে পা-না-ধোয়া জানোয়ারটা। ওকেই খতম করতে হবে আগে। ওর সাথে পুড়ে মরবে ওর বউ-ছেলে-মেয়ে সব। যাক, পুড়ে ছাই হয়ে যাক, কালসাপের বংশ নির্বংশ হোক।

ডিঙিটাকে লটাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে সে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। চার ভিটিতে চারখানা ঘর। ঢেউটিনের চালা, পাতটিনের বেড়া। এ ঘরে আগুন লাগানো সহজ নয়। কপাট, চৌকাঠ, রুয়া-বাগা কাঠের। দরজা আর জানালার কপাটে লাগাতে হবে আগুন। গত বছর পাটের দাম কম ছিল। পাট নিশ্চয়ই বেচেনি জঙ্গুরুল্লা। ঘরে পাট থাকলে তো কথাই নেই। ফরফর করে জ্বলে উঠবে আগুন।

BanglaBook.org

জঙ্গুরুল্লা কোন ঘরে থাকে—ফজলের জানা নেই। ঘরগুলোর সবকটা দরজা বাইরে থেকে শিকল এঁটে বন্ধ করে দেয় সে। বোতল থেকে হাতের তেলোয় কেরোসিন ঢেলে ছিটিয়ে দেয় কপাট-চৌকাঠগুলোয়। তারপর ম্যাচবাতির কাঠি জ্বালায় সে। জ্বলন্ত কাঠি-ধরা হাতটা তার এগিয়ে যায় কপাটের দিকে।

'ওঁয়াঁ-ঁ—ওঁয়াঁ-ঁ-ঁ।'

শিশুর কান্না। ফজলের হাতটা থেমে যায়। বুকটা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে নিবিয়ে দেয় কাঠির আগুন।

'ওঁয়াঁ-ঁ—ওঁয়াঁ-ঁ-ঁ।'

অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুর কান্না প্রতিধ্বনি তোলে তার বুকের ভেতর। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই একটা জানালা।

ঘরের ভেতর হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। সে কুপির আলোয় দেখতে পায় একটি তরুণী মা শিশুর ভিজে কাঁথা বদলে দিচ্ছে।

'ওঁয়াঁ-ঁ—ওঁয়াঁ-ঁ-ঁ।'

আবার সেই কান্না। ফজলের অভিভূত দৃষ্টির সামনে মা ও শিশু। মা কোলে তুলে নিয়েছে শিশুকে। বুকের কাপড় সরিয়ে স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে দিতেই তার কান্না থেমে যায়। নিষ্পাপ শিশু নিশ্চিন্ত আরামে স্তন চুষছে আর হাত-পা নাড়ছে।

ফজল আর দেরি করে না। সে সব ক'টা দরজার শিকল খুলে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে যায় নদীর ধারে। তারপর লটা ঝোপের আড়াল থেকে ডিঙিটা বের করে সে বৈঠায় টান মারে।

আক্রোশের আগুন নিবে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। এবার সে আগুন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে তার মনে। প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে, কিন্তু কাপুরুষের মতো নয়।

জোরে বৈঠায় টান মারে ফজল। তাকে অনেক উজান পানি ভাঙতে হবে। সময়টা পূর্ণিমা-অমাবস্যার মাঝামাঝি। তাই স্রোতের বেগ এখন অনেক কম। তবুও উজান ঠেলে যেতে ফজলের কষ্ট হচ্ছে খুব। স্রোত কেটে ছলছল আওয়াজ তুলে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলছে ডিঙি।

নিঃসীম অন্ধকার। ইচাগ্রা খাঁড়ির মুখে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে।

ক্ষীণ ভট্‌ভট্‌ শব্দ আসছে পশ্চিম দিক থেকে। দূরের ফুলে ছাওয়া কাশবন আর নদীর রুপালি পানি মাঝে মাঝেই ঝলমলিয়ে উঠছে সার্চ লাইটের ফোয়ারায়।

ফজল বুঝতে পারে—টহলরত গোরা সৈন্যের লঞ্চ আসছে। সে প্রাণপণ বৈঠা টেনে চর বগাদিয়ার কিনারায় চলে যায়, লটা বনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় ডিঙিটা। ওটাকে লটাবনের আঁড়ালে বেঁধে সে নেমে পড়ে ডাঙায়।

তিন বছর আগের পয়স্তি চর এই বগাদিয়া। জঙ্গুরুল্লার বড় ছেলে জাফর ও তাদের কয়েক ঘর কোলশরিক ও বর্গাদারের বসত এ চরে। তারা টের পেলে জান-পরান হারিয়ে ভেসে যেতে হবে গাঙের স্রোতে।

ফজল চুইন্যা ঘাসের ঝোপের ভেতর গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকে।

ভট্‌ভট্‌ আওয়াজ এখন আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সার্চলাইটের আলোও এসে পড়ছে তার ডিঙি বরাবর নদীর মাঝখানে।

কিন্তু হঠাৎ ভট্‌ভট্‌ আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। সার্চলাইটের আলোও আর দেখা যায় না। ফজলের মনে বিস্ময় জাগে—বিকল হয়ে গেল নাকি কলের নৌকা!

BanglaBook.org

ফজল চুপচাপ বসে থাকে ঝোপের ভেতর। অনেকক্ষণ পরে সে দেখতে পায়—লঞ্চটা স্রোতের টানে ভেসে আসছে। বন্ধ কেবিনের জানালার খড়খড়ি গলে আলোর রশ্মি এসে পড়ছে বাইরে। সেই আবছা আলোয় দেখা যায় দু'জন গোরা সৈন্য বৈঠার খোঁচ মেরে লঞ্চটা পাড়ের দিকে ঠেলছে। তাদের একজন লঞ্চের ডানপাশে এসে বৈঠা দিয়ে পানির গভীরতা মেপে চলে যায় কেবিনের ভেতর। অল্পক্ষণ পরেই একটা মেয়েলোককে পাঁজাকোলা করে এনে সে নামিয়ে দেয় কোমর পানিতে। মেয়েলোকটি হুমড়ি খেয়ে পানির ওপর পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পানি ভেঙে কোনো মতে পা টেনে টেনে তীরে উঠে সে বসে পড়ে মাটিতে।

ফজল ফেরারি আসামি। আর এলাকাটাও শত্রু পক্ষের। তাই রাগে ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া ঐ বর্বরদের বিরুদ্ধে আর কিছুই করার কথা চিন্তা করতে পারে না সে।

লঞ্চটা বৈঠার ঠেলায় ও ভাটির টানে কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ চালু হয়ে যায়। ভট্‌ভট্‌ আওয়াজ তুলে সার্চলাইট জ্বেলে দ্রুতগতিতে চলে যায় পুব দিকে।

ফজল ঠায় বসে থাকে। ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করে। মেয়েলোকটা হয়তো কেঁদে চিৎকার দিয়ে উঠবে। আর সাথে সাথে বগাদিয়ার সব মানুষ হৈ-চৈ করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু অন্ধকারে তার নড়াচড়ার কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। সে বোধ হয় বসেই আছে মাটির ওপর।

ফজল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে ডিঙিটা লটা ঝোপ থেকে বের করে সে জোরে টান মারে বৈঠায়।

পাটখেতে যখন ফজল ফিরে আসে তখন রাত প্রায় শেষ।

আক্রোশের আগুনে যেন ঝলসে গেছে তার শরীর ও মন। সে মাদুরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শরীরটা ঢেলে দেয়। নির্ঘুম ক্লান্ত চোখ দুটো ঘুমের আক্রমণ রোধ করতে পারে না বেশিক্ষণ।

রাতের বেলা কেন এল না ফজল বুঝতে পারে না জরিনা। তার জন্য রান্না করে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল সে। একবার চেষ্টাও করেছিল তাকে খুঁজে বের করবার। বাড়ির পুবদিকে ধানখেত। ধান পাতার আঁচড় খেয়ে কিছুদূর গিয়েছিল সে। ফজলের অনুকরণে অপটু কণ্ঠে টিঁ-টিঁ-টিঁ—টিঁ-টিঁ-টি হট্‌ ডাকও দিয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে সে আর এগুতে সাহস করেনি অন্ধকারে।

ফজরের নামাজ পড়েই জরিনা রান্নাঘরে যায়। গত রাতের রান্না বেলেমাছের চচ্চড়ি গরম করে। হলুদ-লবণ দিয়ে সাঁতলানো আগুলু চিংড়ি ভর্‌তা করে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা ও সরষের তেল সহযোগে। তারপর একটা মেটে বাসনে পান্তা বাড়ে। তার ওপর চচ্চড়ি ও ভরতা বসিয়ে দিয়ে বাসনটাকে গামছায় বেঁধে নেয়।

ধানখেত পেরিয়ে পাটখেতের আলে গিয়ে দাঁড়ায় জরিনা।

গতকাল আকাশে ছিল টুকরো টুকরো মেঘের উড়ন্ত মিছিল। কখনো চোখ বুজে, কখনো চোখ মেলে সারাদিন কর্তব্য পালন করছিল সূর্য। রাতেও বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আজ ভোর থেকেই আকাশে জমতে শুরু করছে কালো মেঘ। উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার অস্পষ্ট গর্জন শোনা যায় কি যায় না। আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে সে এদিক ওদিক তাকায়। আলের পাশে খুঁজে পায় সে একটা মাথাভাঙা পাটগাছ। ওটায় বসান রয়েছে একটা ম্যাচবাতির খোসা—ফজলের রাখা নিশানা। নিশানা ধরে সোজা পুব দিকে এগিয়ে যায় সে। মাথা নুইয়ে যেতে হয়, কারণ পাটগাছ এখনো মাথাসমান লম্বা হয়নি। নল চারেক যেতেই পাটগাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ফজলের তৈরি ছই-টা।

BanglaBook.org

জরিনা কাছে গিয়ে দেখে ছই-এর নিচে মাদুরের ওপর খালি গায়ে পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে ফজল।

দিনের আলোয় জোয়ারে ভরা ফজলের জোয়ান শরীর দেখাবার সুযোগ পায় জরিনা এই প্রথম। গামছায় বাঁধা খাবার নামিয়ে রেখে সে নিঃশব্দে বসে পড়ে ফজলের পাশে।

ঈষৎ ফাঁক ঠোঁট দুটির আড়ালে ওপরের পাটির দুটি দাঁত দেখা যায়। আলুথালু চুলের এক গোছা কপালের ওপর এসে পড়েছে। দাড়ি-গোঁফ চাঁচা হয়নি অনেক দিন। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বিষণ্ন মুখকে বিষণ্নতর করে তুলেছে। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে জরিনা।

গভীর ঘুমে অচেতন ফজল। তার প্রশস্ত রোমশ বুক ওঠা-নামা করছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে। লুঙ্গির গেরো শিথিল হয়ে নেমে গেছে নাভির নিচে। দু'টি উরুর অনেকটা উদলা লুঙ্গি ওপরে উঠে যাওয়ায়। জরিনা লক্ষ্য করে—মুখের রঙের চেয়ে অনেক ফরসা উরুর রঙ। সর্বক্ষণ কাপড়ে ঢাকা থাকার ফলে রোদে পুড়ে উরুর রঙ তামাটে হতে পারেনি। ঢেঁকির কাতলার মতো মোটা মজবুত দুই উরু।

কপালের চুলের গোছাটি ঘুরিয়ে মাথার ওপর তুলবার জন্য জরিনার আঙুল নিশপিশ করে। কিন্তু সে সংযত করে নিজেকে।

জরিনা একটা কাঁপুনি অনুভব করে তার বুকের মধ্যে। কাঁপুনিটা ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে। তার মনের বন্য বাসনা পলিমাটির বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যেতে চায়।

জরিনা চোখ বোজে, মনে মনে কি যেন আওড়ায়। সে বুকে ফুঁ দেয়, ডানে বায়ে ফুঁ দেয়।

ঢেউ থামে। দিশেহারা বাসনা ধীরে ধীরে উৎসে ফিরে যায়।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে জরিনা। ফজল একই অবস্থায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

পাটগাছের আগায় আঁশ বাঁধিয়ে ঝুলছে একটা শুঁয়াপোকা। নিজের শরীর থেকে নির্গত আঁশের সাথে ওটা ঝুলছে, দুলছে বাতাসে আর নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

কি বিশ্রী কদাকার জীব। জরিনার শরীরের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। হলদে বিছাটা মাটিতে পড়েই শুঁয়াভরা শরীর দুলিয়ে চলতে শুরু করে ফজলের দিকে।

'ইস্! খুশির আর সীমা নাই!' জরিনা মনে মনে বলে। 'অমন সোন্দর শরীলে উঠতে দিমু তোমারে!'

তারই দেয়া কেরোসিন তেলের বোতলটা হাতের কাছেই রয়েছে। ওটার তলা দিয়ে সে পোকটাকে পিষে দেয় মাটির সাথে।

পাটগাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য শুঁয়াপোকা। প্রজাপতি ডিম পাড়ে পাটপাতার ওপর। ডিম থেকে ফুটে বেরোয় শুঁয়াপোকা। পাটের কচিপাতা খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে ওরা। কয়েকটা পোকা নিজের শরীর থেকে নিঃসৃত আঁশ দিয়ে পাটপাতা মুড়িয়ে গুটি তৈরি করছে।

স্বেচ্ছাবন্দি বয়োজ্যেষ্ঠ শুঁয়াপোকারা মুক্তির সাধনায় ধ্যানমগ্ন গুটির ভেতর। একটার মুক্তিলাভ ঘটে জরিনার চোখের সামনেই। গুটি ভেঙে একটা হলদে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। পাতা আঁকড়ে ধরে ওটা পাখা দোলাচ্ছে। জরিনা চেয়ে থাকে ওটার দিকে।

আহা কি সুন্দর!

এমনি হলদে রঙের একটা শাড়ি দেখেছিল সে রূপজানের পরনে। শাড়ির আঁচলটা বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছিল প্রজাপতির পাখার মতোই। তার মনে হয় এই হলদে প্রজাপতিটার মতোই সুন্দরী রূপজান।

BanglaBook.org

ফজলের দিকে আবার চোখ নেমে আসে জরিনার। ঘুম তার এত গভীর যে একবারও পাশ ফিরে শোয়নি সে এতক্ষণের মধ্যে।

তার মাথার কাছেই পিড়পিড়িয়ে হাঁটছে একটা কদাকার শুঁয়াপোকা।

জরিনা বোতলের তলা দিয়ে এটাকেও পিষে ফেলে।

এ পোকার শুঁয়ায় নাকি বিষ আছে। শুঁয়া শরীরের কোথাও লেগে গেলে ফুলে যায়, শেষে পেকে পুঁজ হয়।

জরিনা একটা পাটগাছের আগা ভাঙে। মাথার পাতাগুলো রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এবার এটাকে বোতলের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। কেরোসিন-ভেজা পাতাগুলো সে এবার বুলিয়ে দেয় মাদুরের কিনারায়। বারবার কেরোসিনে ডুবিয়ে সে মাদুরের চারপাশটা ভিজিয়ে দেয়। কেরোসিনের দুর্গন্ধে ফজলের কাছে এগুতে পারবে না কদাকার পোকাগুলো।

স্বস্তি বোধ করে জরিনা। কিন্তু নবজাত প্রজাপতির একটা উড়ে এসে বসে ফজলের উরুর ওপর। ওটাকে তাড়াবার জন্য সে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হয়, রূপজানই বুঝি প্রজাপতির রূপধরে এসে বসেছে ফজলের গায়ে। সে হাত টেনে নেয়, পলকহীন চোখ মেলে চেয়ে থাকে প্রজাপতিটার দিকে। কি সুন্দর! ওটার তুলনায় নিজেকে মনে হয় একটা শুঁয়াপোকা। ফজলের গায়ে বসবার অধিকার নেই শুঁয়াপোকার।

কদাকার শুঁয়াপোকা গুটির কবরে গিয়ে সুন্দর প্রজাপতির রূপ লাভ করে। সে যদি কবরে যায় তার কি দশা হবে? সে কি এমন সুন্দর রূপ নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে? আসতে পারবে এ সুন্দর পৃথিবীতে যেখানে চাঁদ আছে, সূর্য আছে, বাতাস আছে, পানি আছে, আর আছে ফজল?

অসম্ভব। কবর থেকে কোনো মানুষই ফিরে আসে না এ মাটির পৃথিবীতে। কবরে মাটিচাপা দেয়ার পরেই আসবে দুই ফেরেশতা *মনকির* আর *নকির*। গুনাগারের আজাব চলতে থাকবে কবরের ভেতর। তারপর আল্লার বিচার। বিচারের পর গুনাগারকে ফেলবে হাবিয়া দোজখে, জাহান্নামে।

জরিনা আরো ভাবে, সে সবচেয়ে বড় গুনাগার। শরীরের গুনা, মনের গুনা, চোখের গুনা সে করেছে। অন্য সব গুনা মাফ হলেও হতে পারে, কিন্তু শরীরের গুনা কবিরা গুনা। এ গুনার মাফ নেই। সে শুনেছে, সারা জীবনভর আল্লার নাম জপ করলেও শরীরের গুনার শাস্তি থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আর কি সাংঘাতিক সে শাস্তি। দুই সাপ এসে কামড়ে ধরবে দুই স্তন। ফেরেশতারা গুর্‌জু মারবে কুচকির ওপর।

জরিনা আর ভাবতে পারে না। সে ফজলের দিকে তাকায়। শরীরের গুনা করেছে ফজলও। তারও নিস্তার নেই। একই হাবিয়া দোজখে যেতে হবে দু'জনকে।

হঠাৎ জরিনার বেদনাভারাক্রান্ত মনটা হালকা মনে হয়। ফজল হবে তার দোজখের সাথী। রূপজান সতী-সাধ্বী, নিষ্পাপ। সে যাবে বেহেশতে। আখেরাতে সে সাথী হবে পারবে না ফজলের। এ দুনিয়াতেও ফজলকে আর সাথী হিসেবে পাবে না সে। তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

প্রজাপতিটা এখনো বসে আছে ফজলের উরুর ওপর।

নাহ, ওটার বসবার অধিকার নেই ফজলের গায়ে।

জরিনা আঙুলের টোকা দিতেই প্রজাপতিটা নরম অপটু পাখা নেড়ে টলতে টলতে উড়ে চলে যায়।

BanglaBook.org

জরিনার মনের মেঘে উষার অরুণিমা। ফজল হবে তার দোজখের সাথী। কিন্তু এ দুনিয়ায় ?

এ দুনিয়ায় ফজল একা। তার সাথী নেই। তার নিজেরও কি সাথী আছে ?

ফজলের জন্য তার মনে রয়েছে মমতার এক গভীর সরোবর। তাতে এবার জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। মমতা-সরোবর থেকে নির্গত হচ্ছে স্নেহগঙ্গা। সমস্ত বাঁধ-বাধা ভেঙে, ডিঙিয়ে দুর্বার স্রোতের অধঃপতন ঘটছে এক অন্ধকার কুহরে।

জরিনা চেয়ে থাকে ফজলের মুখের দিকে। সে মুখমণ্ডল জুড়ে থমথমে বিষাদের ছায়া। জরিনার চোখ ছলছল করে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ফজলের আরো কাছে গিয়ে বসে। তার কপালের ওপর থেকে সে চুলের গোছাটি আঙুল দিয়ে তুলে দেয় মাথার ওপর। কপালে হাত বুলায়।

ফজলের ঘুম ভেঙে যায়। সে চোখ মেলে। জরিনার মাথা ঈষৎ ঝুঁকে আছে তার মুখের ওপর। চেয়ে আছে নির্নিমেষ। মমতামাখা দুটি চোখ। চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

ফজলের চোখও ছলছল করে ওঠে। তার পিপাসাজর্জর মন মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। হঠাৎ সে দেখতে পায় স্নেহ-ভালোবাসার এক বিশাল সরোবর। তার পানি স্বচ্ছ কি পঙ্কিল যাচিয়ে দেখে না সে। দেখবার প্রয়োজনও বোধ করে না। সে হাত বাড়িয়ে জরিনাকে কাছে টেনে নেয়। জরিনা বাধা দেয় না।

॥ কুড়ি ॥

বগাদিয়ার কোলশরিক কোরবান ঢালীর পুতের বউ সবুরন মোরগের বাকেরও আগে নদীর ঘাটে গিয়েছিল ফরজ গোসল করতে। অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভেঙে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে তার স্বামী সোরমানও যায় গোসল করতে। এত সময়ের মধ্যেও সবুরন ঘরে ফিরে আসেনি আর নদীর ঘাটেও তাকে দেখতে পায় না সোরমান। গোসলের পর পরবার জন্য যে শাড়িটা সে নিয়ে গিয়েছিল সেটা পড়ে রয়েছে পাড়ে তুলে রাখা একটা ওচার ওপর। সোরমানের বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। সবুরনকে কুমিরে নিয়ে যায়নি তো!

তার ডাক-চিৎকারে বাড়ির ও আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। কয়েকজন লগি মেরে মেরে নদীর কিনারায় খোঁজ করে। কয়েকটা নৌকা নিয়ে কয়েকজন খোঁজ করে এ-চর ও-চর। কিন্তু সবুরনের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। সে কোথাও কারো সাথে পালিয়ে যায়নি—এ ব্যাপারে সবাই একমত। বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে। হেসে-খেলে দিব্যি ঘর-সংসার করছিল মেয়েটি।

পালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণও ঘটেনি। আর পালিয়ে গেলে শাড়িটা নিশ্চয়ই নিয়ে যেত। সে সাঁতার জানে। সুতরাং পানিতে ডুবে মরার কথাও নয়। তবে কি সত্যি সত্যি কুমিরেই নিয়ে গেছে ?

কিন্তু একদিন এক রাত পর ভোরবেলা যখন তাকে নদীর সেই একই ঘাটে পাওয়া গেল তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক। সবুরন কেমন যেন সম্মোহিত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তার মুখে কথা নেই। অনেক সময় ধরে ঘোমটা টেনে সে বসে থাকে এক জায়গায়। কারো প্রশ্নের উত্তর সে দেয় না। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটির ওপর জিনের দৃষ্টি পড়েছে এবং জিনই তাকে নিয়ে গিয়েছিল ?

BanglaBook.org

খবরটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সারা চর অঞ্চলে। লোকের মুখে এ-ও শোনা যায়—সবুরনের শরীরে, শাড়ি-ব্লাউজে মন-মাতানো খোশবু। সে নাকি জিন-পরীর দেশ কোহ্‌কাফ-এর খোশবুর নহরে ডুব দিয়ে এসেছে।

জরিনার কাছে খবরটা পায় ফজলও। সে মনে মনে হাসে আর এই ভেবে স্বস্তি বোধ করে যে নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে বউটির ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন রক্ষা পেয়ে গেল।

ফজলের মনে পড়ে যায় একদিনের কথা। মাস ছ'য়েক আগে সে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছিল তারপাশা, মাছের চালানদারদের কাছে। তারপাশা স্টেশনে অপেক্ষমান কয়েকজন স্টিমার-যাত্রীর মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। ফজল মনোযোগ দিয়ে শুনছিল পাশে দাঁড়িয়ে। একজন বলছিল, 'জিনের কথা কোরানশরিফে লেখা আছে।' আর একজন বলছিল, 'হ্যাঁ লেখা আছে ঠিকই। কিন্তু জিন কী, কেমন, কোথায় থাকে তার কোনো স্পষ্ট বর্ণনা নেই। কোরানশরিফের একজন অনুবাদক তাঁর টীকায় লিখেছেন—'কোরান শরিফের কোনো কোনো আয়াতে জিনের উল্লেখে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয়, 'সুচতুর বিদেশী' বোঝাবার জন্য জিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।'

ফজল মনে মনে বলে, 'ঠিকই, বউটারে জিনেই ধইর‍্যা লইয়া গেছিল।'

ফজল আরো খবর পায়—ফুলপুরী পীরবাবাকে নিয়ে জঙ্গুরুল্লা আগামী শনিবার বগাদিয়া যাচ্ছে। জিন চালান দিয়ে জিনের দৃষ্টি থেকে পীরবাবা সবুরনকে উদ্ধার করবেন।

কোনো সাক্ষী-সাবুদ পায়নি বলে ডাকাতি মামলাটা দাঁড় করাতে পারেনি পুলিস। তাই খারিজ হয়ে গেছে মামলা। কিন্তু জেলভাঙার অভিযোগ আছে ফজলের বিরুদ্ধে। তাকে ধরবার জন্য মাঝে মাঝে হানা দেয় পুলিস।

পালিয়ে পালিয়ে আর কতদিন থাকা যায়? পালাবার আর জায়গাও নেই। জরিনার শাশুড়ি ফিরে এসেছে। সে বাড়িতে যাওয়া যায় না আর। তাকে ধরবার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিস। এভাবে বেইজ্জত হওয়ায় অনেকেই বিরক্ত হয়ে গেছে তার ওপর। তাদের বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য আর যাওয়া যায় না। বর্ষার পানিতে ডুবে গেছে মাঠ-ঘাট। ঝপাঝপ বৃষ্টি নামে যখন তখন। এ দিনে পাটখেতে বা বনবাদাড়ে লুকিয়ে থাকবার উপায় নেই। শিকারির ভয়ে ভীত এ পশুর জীবন আর ভালো লাগে না ফজলের। জেল থেকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে পালিয়েছিল তার একটাও সফল হয়নি। না পারল সে প্রতিশোধ নিতে, না পারল চরটা আবার দখলে আনতে। এভাবে পালিয়ে বেড়ালে কোনো কাজই সমাধা হবে না—সে বুঝতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তে মেহের মুনশির সাথে পরামর্শ করে সে মহকুমার আদালতে আত্মসমর্পণ করাই সমীচীন মনে করে।

উকিল ধরে শেষে আদালতে আত্মসমর্পণই করে ফজল।

আবার হাজতবাস। তবে কিছু দিনের মধ্যে তার বিচার শুরু হয়। ডাকাতি মামলায় অনর্থক গ্রেফতার, বিনা অপরাধে দীর্ঘদিন হাজতবাস, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ইত্যাদি কারণগুলো তার জেলভাঙার অপরাধের গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়ে দেয়। এটাও প্রমাণিত হয়—সে জেল ভাঙেনি। জেল ভেঙেছিল বিপ্লবী রাজনৈতিক দল। সে শুধু সুযোগ বুঝে পালিয়েছিল। বিচারক এসব বিবেচনা করে তাঁর রায় দেন। মাত্র তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে তাকে।

ফজলের সাজা হয়েছে শুনে আরশেদ মোল্লা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তার।

BanglaBook.org

ফজল জেল থেকে পালিয়ে এসেছে শুনে সে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। রূপজানকে সে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই ছিল তার ভয়। মেয়ের মতিগতিও ভালো মনে হয়নি। পানি আনার নাম করে সে নদীর ঘাটে গিয়ে প্রায়ই চুপচাপ বসে থাকত। তাকে চোখে-চোখে রাখতে হতো সব সময়। ঐদিন পুলিস দিয়ে ধরিয়ে না দিলে ফজল তাকে নিশ্চিয় ভাগিয়ে নিয়ে যেত। রূপজানও তৈরি ছিল, ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টাও করেছিল। ভাগ্যিস উঠানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল সে, আর ঠিক সময়ে পুলিস এসে পড়েছিল।

রূপজান এখনো প্রায়ই নদীর ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। তবে পালিয়ে যাওয়ার ভয় আর নেই। এবার দিন-তারিখ ঠিক করে শুভ কাজটা সমাধা করতে পারলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

ফুলপুরী পীরবাবা আরো কিছুদিন থাকবেন এ অঞ্চলে। জঙ্গুরুল্লাও তাগিদ দিচ্ছে বারবার। কিন্তু রূপজানকে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না। সে তার মা-কে সোজা বলে দিয়েছে, 'আমারে বিয়া দিতে পারবা না। পারবা আমার লাশটারে বিয়া দিতে। বেশি জোরাজুরি করলে গলায় দড়ি দিমু।'

মহাভাবনায় পড়ে যায় আরশেদ মোল্লা। নিরুপায় হয়ে সে জঙ্গুরুল্লার কাছে গিয়ে সব খুলে বলে। জঙ্গুরুল্লা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, 'তুমিও যেমুন—! মাইয়া রাজি অয়না ক্যান্ ? পীরবাবার পাকনা দাড়ি দেইখ্যা বুঝিন পছন্দ অয়না মাইয়ার ?'

'হ ঠিকই ধরছেন।'

'আরে মিয়া, তুমি তো একটা জাহিল। রসুলে করিমের বয়স যখন পঞ্চাশের উপরে তখন তিনি হজরত আয়েশাকে বিয়া করেন। তুমি জানো, বিবি আয়েশার বয়স তখন কত ?'

'তেনারাতো আল্লার পিয়ারা। তেনাগো লগে আমাগো লগে তুলনা অয় ?'

'আরে রসুলে করিম যা কইর‍্যা গেছেন সেই মতন কাম করা তো সুন্নত—অনেক সওয়াবের কাম। পীরবাবা আল্লার পিয়ারা দোস্ত। তার লগে মাইয়া বিয়া দিলে গুষ্টিশুদ্ধ বেহেশতে যাইতে পারবা।'

'কিন্তুক মাইয়ারে যে রাজি করাইতে পারলাম না। সে কয়—আমার লাশটারে বিয়া দিতে পারবা।'

'সবুর করো। এট্টু বসো তুমি। আমি জিগাইয়া আসি পীরবাবারে। তিনার কাছে এই ব্যারামেরও ওষুধ আছে।'

কিছুক্ষণ পরে জঙ্গুরুল্লা ফিরে আসে। বলে, 'শোন, মোল্লা, তুমি বাজারে যাও। এক মূলের সোয়াসের জিলাফি আর এক শিশি সুবাসিত তেল নিয়া আসো। দরাদরি কইর‍্য না কিন্তুক। যা দাম চাইব তাই দিয়া কিনবা। তেলের নামডা যে কি কইল বাবা ? হ হ মনে পড়ছে, *রওগনে আম্বর*। ঐ ডা না পাইলে যে কোনো সুবাসিত তেল আনলেই চলব।'

পরের দিনই আরশেদ মোল্লা জিলাপি আর একশিশি কামিনীকুসুম কেশ তৈল নিয়ে আসে জঙ্গুরুল্লার বাড়ি।

জঙ্গুরুল্লা ওগুলো নিয়ে যায় পীরবাবার বজরায়। তিনি মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ওগুলোতে ফুঁ দিয়ে ফেরত দেন। উপদেশও দেন কিছু।

জঙ্গুরুল্লা জিনিসগুলো আরশেদ মোল্লার হাতে দিয়ে বলে, 'এই জিলাফি খাওয়াইবা মাইয়ারে। আর এই তেল সে মাথায় দিব। তারপর দ্যাখবা মিয়া, ক্যামনে নাচতে নাচতে তোমার মাইয়া আইয়া পড়ে পীরবাবার ঘরে।'

BanglaBook.org

'এতগুলা জিলাফি একলা মাইয়ারে দিলেতো সন্দ করব।'

'না মিয়া, খালি মাইয়ারে দিবা ক্যান্ ? তোমার বউ-পোলা-মাইয়া বেবাকগুলারে খাওয়াইবা।'

'এইডা কি কতা কইলেন চদরীসাব ? হেষে আমার কবিলার উপরেও যদি টোনার আছর অয় ?'

জঙ্গুরুল্লা খিক্‌খিক্ করে হেসে ওঠে। কোনো রকমে হাসি চেপে সে বলে, 'ও তোমার বুঝিন ডর লাগছে ? তুমি মনে করছ তোমার কবিলা নাচতে নাচতে আইয়া পড়ব মন্তরের ঠেলায়। উঁহু, হেইডা চিন্তা কইর‍্য না। তোমার মাইয়ার নাম লইয়া মন্তর পড়া অইছে এই জিলাফি আর তেলের উপরে। আর কোনো মাইনষের উপরে আচর অইব না।'

'ঠিক কইলেন তো ?'

'আরে হ হ। হুগনা ওলানের তন দুধ দোয়ানের কারো এমুন আহেঙ্কাত নাই। এইবার যাও। বিছমিল্লাহ বুইল্লা—থুরি না-না, বিছমিল্লাহ কওনের দরকার নাই। বিছমিল্লাহ কইয়া মোখে দিলে বেবাক বিষ পানি অইয়া যায়। জাদু-টোনার মন্তর-তন্তর ফুক্কা অইয়া যাইতে পারে, বোঝ্‌লা মিয়া ?'

আরশেদ মোল্লা জিলিপির পুটলি ও তেলের শিশি হাতে নেয়।

'আর শোন, পীরবাবা আর একটা কথা কইয়া দিছেন। জিলাফি খাওয়ানের তিনদিন পর যখন জিলাফির মন্তর গিয়া ঢুকব শরীলের মইদ্যে তখন মাইয়ারে টোনার কথা জানাইতে অইব। তোমার বিবিরে তালিম দিয়া দিও। এমুন কইর‍্যা কইতে অইব 'পীরবাবা তোরে টোনা করছে, রাইতে খোয়াবে পীরবাবার কাছে চইল্যা যাবি। তুই ঘুমাইলে তোর রুহু চইল্যা যাইব পীরবাবার কাছে। এই কথাগুলা দিনে তিনবার—ফজর, জহর আর এশার নামাজের পর কওন লাগব। মনে থাকব তো ?'

'হ থাকব। এহন যাই।'

জঙ্গুরুল্লাকে 'আসলামালেকুম' দিয়ে আরশেদ মোল্লা বাড়ির দিকে রওনা হয়।

জঙ্গুরুল্লার নির্দেশমত জিলিপি খাওয়ানো হয়েছে রূপজানকে। সুবাসিত তেল মাখিয়ে রোজ চুল বেঁধে দিচ্ছে তার মা। দিনে তিনবার টোনার কথা বেশ জোর গলায় বলা হচ্ছে তার কাছে। কিন্তু তার মনের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। সে আগের মতোই অচল অটল।

রাতে বিছানায় শুয়ে রূপজান ঘুমের ভান করে থাকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে উঠে বসে থাকে। ঘুমিয়ে পড়লেই স্বপ্ন দেখার ভয় আছে। আত্মাটা দেহ ছেড়ে চলে যাবে পীরের কাছে।

সে সারারাত জেগে থাকে। রাতের ঘুম সে পুষিয়ে নেয় দিনের বেলা ঘুমিয়ে।

রাতের নিঃসীম অন্ধকারে রূপজানের ব্যাকুল মন খুঁজে বেড়ায় ফজলকে। জেলের ভেতর সে এখন নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে। সে কি তাকে স্বপ্নে দেখে এখন। টোনা করে সে যদি আনতে পারত ফজলের আত্মাটাকে। আত্মাটা পাহারা দিতে পারত তার নিজের আত্মাটাকে।

বাড়ির সবাই তাকে বুঝিয়েছিল, ফজল ডাকাত। ডাকাতির মামলায় তার চৌদ্দ বছর জেল হবে। কেন সে তার জন্য নিজের জীবনটা নষ্ট করবে ?

রূপজান তাদের কথা বিশ্বাস করেনি। ফজল ডাকাতি করতে পারে না—সে জানত। সেটাই এখন প্রমাণিত হয়েছে। সে ওভাবে জেল থেকে না পালালেই ভালো করত। জেল-পালানোর অপরাধে সাজা খাটতে হতো না। যাক, মাত্র তিন মাসেরই তো ব্যাপার। দেখতে দেখতে জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। ফিরে আসবে ফজল।

BanglaBook.org

কিন্তু ফিরে এলে তার কি লাভ ? সে-তো তাকে তালাক দিয়ে গেছে। আর তো সে তাকে ঘরে নিতে পারবে না।

তবুও ফজল জেল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক—মনে মনে সে এ প্রার্থনা করে দিনরাত।

আরশেদ মোল্লার প্রার্থনা কিন্তু তা নয়। ফজলের জেলের ভাত যত দেরিতে ফুরোয় এই তার কামনা। মাত্র কয়েক দিন হলো রূপজানকে জিলিপি খাওয়ানো হয়েছে। এর আছর হতে সময় লাগবে। কিন্তু বেশি সময় নিলে তো মহামুশকিল হয়ে যাবে। ফজল ফিরে এলে একটা কিছু গোলমাল বাঁধিয়ে দিতে পারে—এই তার ভয়।

পদ্মার স্রোতের মতো সময় বয়ে যাচ্ছে। একমাস পার হয়ে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু একটুকুও পরিবর্তন হয়নি রূপজানের। তার মা টোনার প্ররোচন-বাক্য উচ্চারণ করলেই সে কানে আঙুল দেয়, পা উঁচিয়ে মেঝের ওপর লাথি মারে আর বলে, 'টোনার কপালে লাথি, টোনার মুখে লাথি।'

'ছি মা, অমুন করিস না। আল্লাহ্ গুনা লেখব, চুপ কর। তোর বা'জান হুনলে কাইট্যা ফালাইব।' সোনাইবিবির কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

রূপজান চুপ করে না। সে এবার বাঁ পা দিয়ে বারবার লাথি মারে মেঝের ওপর। আর দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'টোনার মাজায় বাঁইয়া ঠ্যাঙ্গের লাথি। একশো একটা লাথি।'

সোনাইবিবিও চায়না জাদু-টোনার আছর পড়ুক রূপজানের ওপর। কিন্তু স্বামীর আদেশ অমান্য করার সাহস নেই তার। তাই দিনে তিনবার সে টোনার কথা শোনায় রূপজানকে। প্রত্যেক বারই কানে আঙুল দেয় রূপজান। থুক ফেলে, লাথি মারে মেঝেতে। সোনাইবিবির চোখ থেকে ধারা নামে। বুক ভেঙে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

পীরবাবার তুকতাকে কাজ হচ্ছে না কেন বুঝতে পারে না আরশেদ মোল্লা। এদিকে দিন যে আর বেশি বাকি নেই। কার্তিক মাস শেষ হওয়ার কয়েক দিন পরেই বেরিয়ে যাবে ষণ্ডাটা। এখন উপায় ?

আরশেদ মোল্লা পরামর্শের জন্য ছোটে জঙ্গুরুল্লার বাড়ি।

পীরবাবার তুকতাকে রূপজানের মন টলেনি শুনে ভাবনায় পড়ে জঙ্গুরুল্লাও। আরো কড়া, আরো তেজালো বশীকরণমন্ত্র নিশ্চয়ই জানা আছে পীরবাবার। কিন্তু আর যে বেশি সময় নেই। ফজল জেল থেকে বেরিয়ে এসে গোলমাল বাঁধাবে, তার জন্য মোটেও ভাবে না সে। ফজলতো একটা পিঁপড়ে তার কাছে। খালি একটু চোখের ইশারা ব্যস এক ডলায় খতম। তার ভাবনা শুধু পীরবাবার জন্য। এই চান্দের মাসের পনেরো তারিখে তাঁর মেয়ের শাদি-মোবারক। আর মাত্র তেরো দিন বাকি আছে। পাঁচ দিন পরে তিনি নিজের *'ওয়াতন'* ফুলপুর চলে যাবেন। সুতরাং তিন-চার দিনের মধ্যেই শুভ কাজটা সমাধা করা দরকার।

'শোন মোল্লা, মাইয়ার মনের দিগে চাইয়া থাকলে কোনো কাম অইব না।' জঙ্গুরুল্লা বলে। 'বিয়ার কলমা পড়লে আর পুরুষ মাইনষের হাত লাগলে সব ঠিক অইয়া যাইব।'

'আমার মনে অয় চদরী সাব, মাইয়ারে কবুল করান যাইব না। আপনে জুয়ান দেইখ্যা একটা পোলা ঠিক করেন।'

'দ্যাখো মোল্লা, আমার যেমুন কথা তেমুন কাম। পীরবাবারে তোমার মাইয়া দিমু বুইল্লা নিয়াত কইর‍্যা রাখছি। এই নিয়াত ভাঙতে পারমু না।'

'কিন্তু চদরীসাব, মাইয়া কবুল না করলে কি করবেন ?'

BanglaBook.org

'কবুল করাইতে অইব। যদি এই শাদি না অয় তবে আর জমির ধারে কাছে যাইতে পারবা না। কইয়া দিলাম।'

আরশেদ মোল্লা কুঁকড়ে যায়। সে হাতজোড় করে বলে, 'এট্টু রহম করেন, চদরীসাব। বেঢকচরের অর্ধেক জমি গাঙে খাইয়া ফালাইছে। আপনের জমিই এখন ভরসা। জমি লইয়া গেলে খাইমু কী ?'

'কী খাইবা, আমি কী জানি। জমি খাইতে অইলে আমার কথা মতন কাম করণ লাগব।'

'হ, আপনে যা শুকুম দিবেন সেই মতন কাম করমু।'

জঙ্গুরুল্লা হেসে বলে, 'তুমি হুকুমরে শুর্দু কইর‍্যা শুকুম কইলা বুঝিন ? আসলে হুকুম কথাডাই শুর্দু, বোঝলা মিয়া ? ভর্দ লোকেরা শুকুম কয় না, হুকুম কয়। আমার এই হুকুমের কথা মনে রাইখ্য সব সময়।'

একটু থেমে আবার বলে জঙ্গুরুল্লা, 'পীরবাবার গায়ের রং দ্যাখছো ? এক্কেরে হবরী ক্যালার মতন। তিনার লগে কি আন্‌দুরা-বানদুরা কালাকষ্টি মাইয়ার শাদি দেওন যায় ? তিনার রঙের লগে মিশ খাইব তোমার মাইয়ার রং। এহন বোঝতে পারছ—কিয়ের লেইগ্যা আমি এত তেলামাখি করতে লাগছি তোমারে ?'

'পীর বাবাতো বুড়া মানুষ। ওনার আবার শাদি করণের খায়েশ অইল ক্যান্ ?'

'আরে পীরবাবার খায়েশ থাকুক আর না থাকুক, আসলে খায়েশটা অইছে আমার। পীরবাবা বুজুর্গ মানুষ। আল্লার পিয়ারা দোস্ত। তিনারে যদি আমাগ চরে রাখন যায়, তয় বালা-মসিবত আইতে পারব না। দ্যাখো না ক্যান্, রাক্কইস্যা গাঙ ক্যামনে ভাইঙ্গা রসাতল কইর‍্যা লইয়া যায় আমাগ চরগুলা। উনি যদি আমাগ লগে আমাগ চরে বসত করেন তয় কোনোদিন চর ভাঙতে পারব না। আমাগ চরডা অনেক পুরান আর বড়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিগ দিয়া এট্টু-এট্টু ভাঙতে শুরু করছে। পীরবাবারে আইন্যা এই ভাঙন ঠেকাইতে অইব। তারপর তোমার কানে কানে কই একটা কথা। কারো কাছে ভাঙবা না কিন্তুক।' জঙ্গুরুল্লা আরশেদ মোল্লার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'পীরবাবা যখন ইন্তিকাল করবেন তখন ওনারে কবর দিমু আমাগ চরে। তারপর আল্লার মকসুদ পুরা করলে কবরডারে পোস্তা কইর‍্যা দিমু। তখন আল্লায়ই হেফাজত করব তার পিয়ারা দোস্তের কবর। এর পর গাঙ ক্যান্, গাঙ্গের বাপেরও *'পাওর'* থাকব না এই চর ভাঙনের।'

একটু দম নিয়ে আবার বলে সে, 'যেই মতন মনে মনে ঠিক কইর‍্যা রাখছি, হেই মতন ঠিক ঠিক যদি কামডা অইয়া যায়, তা অইলে আরো ফয়দা অইব। তোমার মাইয়ারও কপাল খুইল্যা যাইব তখন, হুঁহ্ হুঁহ্!'

'মাইয়ার কপাল খুলব!' আরশেদ মোল্লার কণ্ঠে বিস্ময়। 'ক্যামনে খুলব ?'

'হেইডাও এহনই জানতে চাও ? কইবা না তো কাওর কাছে ?'

'না—না, কইমু না। আপনি কইয়া ফেলেন।'

'তুমি পীর-দরবেশের মাজার দ্যাখছো ?'

'দেখছি।'

'কত দ্যাশ-বিদ্যাশের মানুষ যায় মাজারশরিফে। কত সর্মান! কত পয়সার আমদানি! পীরবাবারে আমাগ চরে কবর দিতে পারলে আমারও মাজারশরিফ বানাইতে পারমু। তখন মিয়া তোমার মাইয়া ছালা ভইর‍্যা ফালাইব টাকা দিয়া।'

BanglaBook.org

আরশেদ মোল্লার চোখে-মুখে খুশি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

'এখন তুমি কও, পীরবাবারে ক্যামনে ভুলাইয়া রাখন যায় ? ক্যামনে আটকাইয়া রাখন যায় আমাগ চরে ?'

'সোন্দর দেইখ্যা একটা শাদি করাইয়া দিলে—'

'এইতো এইবার বুইঝ্যা ফালাইছ। যেমুন-তেমুন আনদুরা-বানদুরা মাইয়ার লগে শাদি দিলে কাম অইব না। তার লেইগ্যা মাইয়া চাই বেহেশতের হুরির মতন সোন্দর, খবসুরত। এইডা চিন্তা কইর‍্যা আমি তোমার মাইয়া ঠিক করছি। তোমার মাইয়ার মতন সোন্দর ঢক-চেহারার মাইয়া আমাগ এই চরে-চঞ্চালে আর একটাও নাই। তোমার মাইয়ারে দ্যাখছে পীরবাবা, বজরা দিয়া যাইতে আছিল, হেই সময় একদিন আমারে কয়, অ্যায়ছা খবসুরত লারকি হামি কোনোদিন দেখে নাই। হামার মুল্লুকেও এমুন ছুন্দর লাড়কি নাই। এহন বোঝতে পারছ তো ? তোমারে বুঝানের লেইগ্যা অনেক কথা খরচ করলাম।'

'আমিতো বেবাক বোঝলাম। মাইয়াতো বোঝতে চায় না।'

'বোঝতে চাইব একশত্‌বার। ছালা-ছালা টাকার কথা শোনলে এক কথায় কবুল কইর‍্যা ফালাইব। তুমি তোমার বিবিরে বুঝাইয়া কইও বেবাক কথা। সে যেন্ মাইয়ার কানে কানে কয় সব।'

'আইচ্ছা কইমু।'

'এইবার তা অইলে তুমি শাদির ইন্তিজাম করো।'

'কবে, দিন-তারিখ কইয়্যা দ্যান।'

'আইজ রবিবার। তারপর সোম, মঙ্গল, বুধ। হ্যাঁ বুধবারই বিয়ার তারিখ ধার্য করলাম। আরে দ্যাখো তো কি কারবার। যার বিয়া তার দ্যাখতে মানা। আরে আসল কথাডাই ভুইল্যা গেছিলাম। যার শাদি তারে না জিগাইয়া তারিখ ধার্য করণ ঠিক না। আমি পীরবাবার লগে কথা কইয়া দেখি।'

বাড়ির ঘাটে বাঁধ আছে ফুলপুরী পীরের বজরা। জঙ্গুরুল্লা বজরার কক্ষে ঢুকে দেখা করে তাঁর সাথে। অনেকক্ষণ পরে সে বেরিয়ে আসে। চোখে-মুখে উৎসাহের যে দীপ্তি নিয়ে সে গিয়েছিল, তা আর নেই এখন। আরশেদ মোল্লা তার অন্ধকার মুখের দিকে চেয়ে থাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

জঙ্গুরুল্লা তার কাঁঠাল কাঠের খাস চেয়ারটায় বসে বলে, 'জবর একটা ভুল কইর‍্যা ফালাইছি। মাইয়ার মন এহনো নরম অয় নাই, এইডা কওনে সব্বনাশ অইয়া গেছে। পীরবাবা কয়—তব শাদি নেহি হোগা। তারে অনেক বুঝাইলাম—সব ঠিক অইয়া যাইব। কিন্তু কিছুতেই সে রাজি অইতে চায় না। হেষে অনেক কষ্টে রাজি করাইছি। কিন্তুক শাদি এহন অইব না। উনি যহন শীতকালে আবার তশরিফ নিব, তহন তোমার মাইয়ারে উডাইয়া দিমু তিনার আতে।'

'কিন্তু মাইয়া যদি ঐ সময়েও রাজি না অয় ?'

'রাজি করান লাগব। রাজি করানের দাওয়াই দিব পীরবাবা। ওনার ছিনার মধ্যে অনেক এলেম, বেশুমার মারফতি-কেরামতি, মন্তর-তন্তর। অনেক জিন তিনার হুকুমের গোলাম। তোমার মাইয়া বশ করতে জিন চালান দিব এইবার।'

'ওরে ডাক্‌কুসরে। না চদরীসাব, জিন-পেরেতের দরকার নাই।'

'আরে ওনারাতো পীরবাবার পোষা জিন। কোনো লোসকান করব না। এইবার মাইয়া ঠিক অইয়া যাইব। তুমি কোনো চিন্তা কইর‍্য না। কোনো ডর নাই তোমার। বাজারের বেইল অইয়া গেছে। এইবার বাড়িত যাও।'

BanglaBook.org

আরশেদ মোল্লা তার ডিঙি বেয়ে বাড়ি রওনা হয়।

কোনো ডর নাই, কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু যার ডরে সে অস্থির সে জেল থেকে বেরিয়ে আসছে কিছুদিনের মধ্যেই। ফজল বেরিয়ে যদি শুনতে পায়—রূপজান তার জন্য সব সময়ে কাঁদে, জাদু-টোনা করেও তাকে ভোলানো যায়নি তার কথা, তবে তো সে তুফান ছুটিয়ে দেবে। লোক-লশকর নিয়ে হাজির হবে তার বাড়ি। ধরে নিয়ে যাবে রূপজানকে।

আরশেদ মোল্লার মাথার মধ্যে কেমন একটা দপদপানি শুরু হয়।

ফজল নিশ্চয়ই খবর পেয়ে যাবে। রূপজান নিজেও গোপনে চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে পারে।

আরশেদ মোল্লা ভেবে কূল পায় না কেমন করে এ তুফান থেকে রক্ষা পাবে সে। রক্ষা করবে মান-ইজ্জত।

ঘর-দোর, গরু-বাছুর নিয়ে খুনের চরে গেলে কেমন হয়? সেখানে অনেক মানুষ আছে চরের পাহারায়। কিন্তু ফজলের দল যদি চর দখলের জন্য হামলা করে? না, অত হিম্মত হবে না। কিন্তু খুনের চরে সবাই থাকে ভাওর ঘরে। এখনো বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে কেউ যায়নি সেখানে।

রূপজানকে কোথাও লুকিয়ে রাখলে কেমন হয়? উঁহু, তাকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। রূপজান নিজেই হয়তো পালিয়ে যাবে কোনো ব্যবস্থা করে। এক কাজ করা যায়—জঙ্গুরুল্লার বাড়ি রেখে দিলে আর কোনো ভয় থাকে না। জঙ্গুরুল্লার বাড়িতে অনেক মানুষজন। তারাই চোখে চোখে রাখবে আর ফজলেরও সাহস হবে না সে বাড়িতে হামলা করার।

আরশেদ মোল্লা স্বস্তি বোধ করে। এতক্ষণ সে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। হাতদুটো বৈঠা টানছিল যন্ত্রচালিতের মতো। আকাশের মেঘ, নদীর ঢেউ, ইলিশ ধরার ডিঙি, নানা রঙের বাদাম, সবুজ ধানখেত, লটা আর কাশবন—কিছুই তার নজরে পড়েনি। হালবৈঠার কেড়োত-কোড়োত—দাঁড়ের ঝপ্‌পত্‌ঝপ, জেলেদের হাঁক-ডাক, কিছুই কানে যায়নি তার। এবার চারদিকে তাকায় আরশেদ মোল্লা। দূরে, ডিঙির মাথি বরাবর দেখা যাচ্ছে খুনের চর। নদীতে এখন ভাটা। চরের ঢালু তট জেগে উঠেছে অনেক দূর পর্যন্ত। ফজলদের ফেলে-যাওয়া বানার বেড় থেকে মাছ ধরছে জঙ্গুরুল্লার কোলশরিকেরা। চরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক সারি ভাওর ঘর—কোলশরিক আর বর্গাদারদের থাকবার ঝুপড়ি।

পীরবাবাকে চর পাঙাশিয়ায় কবর দেয়া হবে। মাজার হবে তাঁর।

আরশেদ মোল্লা নূরপুর আহসান ফকিরের মাজারে গিয়েছিল কয়েকবার। প্রতি বছর মাঘ মাসে 'উরস' হয় সেখানে। সেই দৃশ্য এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মনের চোখে।

বিরাট মেলা। হাজার হাজার মানুষের ভিড়। দূর-দূরান্তরের মানুষের সমাগম। দোকানপাট, ম্যাজিক, সার্কাস, ঘোড়াচক্কর, রাধাচক্কর। বিপুল বিশাল ডেগের মধ্যে রাতদিন রান্না হচ্ছে। পাশেই চালাঘরের নিচে কয়েকটা ডিঙি। রান্না করা ডাল-ভাত-তরকারি ঢেলে দিচ্ছে ডিঙির ডওরায়। মানুষ তুলে নিয়ে খেয়ে যাচ্ছে যার যার ইচ্ছে মতো।

ফকিরের রওজা। লাল মখমলের গেলাপে ঢাকা কবর। রওজার চারপাশে কয়েকটা তালা দেয়া বাক্স। দর্শনার্থীরা বাক্সের ওপরের কাটা ছিদ্রপথে ফেলছে টাকা, আধুলি, সিকি।

এ ছাড়া আরো টাকা আমদানি হয় নিশ্চয়। দোকানপাটের খাজনা আদায় হয়। চাল, ডাল, নগদ টাকা আসে মুরিদানের কাছ থেকে। মানতের গরু, খাসি, মুরগি আসে।

জাহাজের সিটি যবনিকা টেনে দেয় তার মনে-জাত চলচ্ছবির।

দুটো গাধাবোট টেনে নিয়ে ভাটির দিকে যাচ্ছে একটা লঞ্চ। কিছুক্ষণ পরেই গুড়গুড় আওয়াজ শোনা যায়। শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। পশ্চিম থেকে উড়ে আসছে সাতটা উড়োজাহাজ। পুব দিকে যাচ্ছে।

বাড়ির কাছে এসে পড়েছে আরশেদ মোল্লা ডিঙিটাকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে সে নলতার খাঁড়ির মধ্যে ঢোকে।

ভাটির টান খুব জোর। সে শুধু হাল ধরে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বাড়ির ঘাটে পৌঁছে যায়।

ঘরে গিয়েই সে সোনাইবিবিকে বলে, 'রূপজানরে বাড়িত্ রাখন ঠিক না। ষণ্ডাডা জেলেরতন আইলে কোন কাণ্ড কইর‍্যা ফালায় ঠিক নাই। ওরে জঙ্গুরুল্লার বাড়ি পাডাইয়া দিতে চাই। হেইখানে থাকব কয়ডা মাস।'

'ওনারে কি শয়তানে পাইছে নি ? এমুন জুয়ান মাইয়াডা মাইনষের বাড়ি রাখনের কথা ক্যামনে কইতে পারল ? আর জঙ্গুরুল্লার স্বভাবও হুনছি ভালো না। পোলা জহিরডাও হুনছি লুচ্চা।'

আরশেদ মোল্লা চুপ করে থাকে।

সোনাইবিবি আবার বলে, 'এমুন কথা আর কোনোদিন যেন মোখ দিয়া বাইর না করে।'

॥ একুশ ॥

জেল থেকে খালাস পেয়ে ফজল বাড়ি আসে। তাকে নিয়ে এক মাল্লাই বেয়ায়া নৌকা যখন বাড়ির ঘাটে পৌঁছে তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই।

নৌকা থেকে নেমেই সে পিতার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নূরু ও আমিনা তাকে নৌকা থেকে নামতে দেখে ছুটে এসে তার পেছনে দাঁড়ায়। খবর পেয়ে বরুবিবি বিলাপ করতে শুরু করে। ফজল বাপের মরণ দেখতে পায়নি আবার বাপও মরণকালে ছেলেকে দেখতে পায়নি—এ দুঃখ এখনো তার বুকের ভেতর আছাড়ি-পিছাড়ি খায়।

ফজল কবর জিয়ারত শেষ করে মৃত পিতার উদ্দেশে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'বা'জান, আপনের অকালে মরার জন্য জঙ্গুরুল্লা আর আরশেদ মোল্লা দায়ী। আমাগ চর, আমাগ হক-হালালের জমি জঙ্গুরুল্লা অন্যায়ভাবে দখল করছে। এই চর আমি দখল করমুই করমু। আপনে দোয়া কইর‍্যেন। আরশেদ মোল্লা মিথ্যা মামলায় আমারে পুলিস দিয়া ধরাইয়া দিছে। এর উপযুক্ত শাস্তি তারে দিমুই দিমু। আপনে দোয়া কইর‍্যেন।'

নূরুর দিকে তাকিয়ে ফজল বলে, 'নূরু, তুই মেহের মুনশির কানে কানে কইয়া আয়—আমি আইছি। সে যেন রমিজ মিরধা ও কোলশরিকগ লইয়া মাগরেবের পর চুপচাপ আইসা পড়ে।'

সন্ধ্যার পর পুলকি-মাতব্বর মেহের মুনশি, রমিজ মিরধা, কদম শিকারি ও কোলশরিক আহাদালী, ধনু শিকদার ও আরো কয়েকজন আসে ফজলের সাথে দেখা করতে। তারা চরের অনেক খবর দেয় ফজলকে জঙ্গুরুল্লার কোলশরিক আর বর্গাদাররা নতুন ভাওর ঘর তৈরি করেনি একটাও। তাদের তৈরি উনষাটটা ভাওর ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে বসত করছে ওরা। হালের গরু নিয়ে গেছে চরে। সেগুলোর জন্য একচালা বানিয়েছে ষোলটা। তাদের রোপা ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছিল। ধানের অর্ধেকটা নিয়েছে জঙ্গুরুল্লা। বাকিটা ভাগ করে দিয়েছে কোলশরিকদের মধ্যে। জমি ভাগ করে এরফান মাতব্বরের কোলশরিকরা যেভাবে আল বেঁধেছিল সে সব আল ঠিক রেখে কোলশরিকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দিয়েছে

BanglaBook.org

জঙ্গুরুল্লা। প্রতি নল জমির জন্য সেলামি নিয়েছে চল্লিশ টাকা করে। শ্রাবণ মাসে রোপা আমন লাগিয়েছে সারাটা চর জুড়ে। ফসলের খুব জোর দেখা যায়।

চাকরিয়া প্রথমদিকে ছিল পঞ্চাশজন। ফজলকে পুলিস দিয়ে ধরিয়ে দেয়ার পরও ছিল জনতিরিশেক। এরফান মাতব্বরের মৃত্যুর পর সব চাকরিয়া বিদায় করে দিয়েছিল জঙ্গুরুল্লা। ফজল জেল থেকে পালিয়ে আসার পর তিরিশ জনকে এনে রেখেছিল কিছুদিন। ফজলের জেল হওয়ার পর আবার তাদের বিদায় দিয়েছে। ফজল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে শুনলে আবার চাকরিয়াদের ডাক পড়বে।

ফজলদের তৈরি বানার বেড় দিয়ে মাছ ধরছে জঙ্গুরুল্লার কোলশরিকরা। অনেক মাছ। সেগুলো নিকারির টেঁকে নিয়ে বিক্রি করে রোজ কমসে কম কুড়ি টাকা পায়। ঐ টাকার চার আনা ভাগ দিতে হয় জঙ্গুরুল্লাকে।

টাকা আয়ের একটা নতুন পথ বার করেছে জঙ্গুরুল্লা। খুনের চরের উত্তর-পুব কোণে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে যে ঘোঁজাটা, সেখানে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন জায়গার ছোট, বড়, খালি, মালবোঝাই নৌকা এসে পাড়া গাড়ে বিশ্রাম ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। জঙ্গুরুল্লা খুঁটিগাড়ি আদায়ের জন্য সে ঘোঁজা বন্দোবস্ত দিয়েছে রউজ্যা ডাকাতের কাছে। সে একশ থেকে দুশ-মনি নৌকার জন্য আটআনা, দুশ থেকে চারশ-মনি নৌকার জন্য এক টাকা, চারশ-মনির ওপর হলে দুটাকা করে খুঁটিগাড়ি আদায় করে। জঙ্গুরুল্লাকে সে প্রতিমাসে দেয় তিনশ টাকা।

'এত পয়সার আমদানি! এত নৌকা আসে কইতন? নৌকাতো বেশিভাগ আটক করছে সরকার।' ফজল অবাক হয়ে বলে।

'কিছু কিছু নৌকা লম্বর দিয়া ছাইড়্যা দিছে।' রমিজ মিরধা বলে।

'সে আর কয়ডা? ধান-চাউলের নৌকাও তো চলে না। নতুন আইন অইছে—এক জেলার ধান-চাউল অন্য জেলায় যাইতে পারব না।'

'ধান-চাউলের নৌকা ছাড়া আরো তো নৌকা আছে।' মেহের মুনশি বলে। 'বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস ভইর‍্যা চলছে আমের নাও আর কাঁঠালের নাও। বাজে মালের নাও চলে বারোমাস। মওসুমের কতকত জিনিস—রশুন, পেঁয়াজ, হলদি, মরিচ, তেজপাতা, নারকেল, সুপারি, হাজারো মাল এক জেলারতন আরেক জেলায় যায় এই নদী দিয়া।'

'আগের দিন অইলেতো টাকা দিয়া সিন্দুক বোঝাই কইর‍্যা ফেলাইত জঙ্গুরুল্লা।'

'হ ঠিক কথাই কইছ।' রমিজ মিরধা বলে। 'আগের দিন অইলে রোজ আদায় অইত কমসে কম একশ ট্যাহা।'

'কিন্তু নৌকাওয়ালারা ঐ ঘোঁজায় নৌকা বান্দে ক্যান্। আরো তো কত ঘোঁজা আছে। সেখানে বিনে পয়সায় নৌকা রাখতে পারে।'

'অন্য ঘোঁজায় গেলে ডাকাতি অইতে পারে।' কদম শিকারি বলে। 'এই আট-নয় মাসের মইদ্যে ছয়-সাতটা নৌকায় ডাকাতি অইছে! তারা পয়সা বাঁচাইতে গিয়া নাও রাখছিল অন্য ঘোঁজায়।'

'আসলে রউজ্যাই ডাকাতি করায় ওর লোকজন দিয়া।' রমিজ মিরধা বলে। 'ডাকাতির ভয়ে বেবাক নৌকা খুনের চরের ঘোঁজায় আইস্যা খুঁটগাড়ি দিয়া খুঁডা গাড়ে।'

'ধান-চাউলের দাম কি বাজারে?'

'দাম অনেক বাইড়্যা গেছে। সোয়া দুই ট্যাহা মনের ধানের দাম চাইর ট্যাহা আর তিন ট্যাহা মনের চাউল ছয় ট্যাহা।'

'এই বছর বাঁচন কষ্ট আছে।' কদম শিকারি বলে।

BanglaBook.org

'ধান বেশি অয় ভাটি অঞ্চল খুলনা বরিশালে আর উজান দেশ সিলেট ময়মনসিংয়ে। উত্তর বঙ্গের দিনাজপুরেও ধান বেশি অয়। ঐ সব জেলারতন ধান-চাউল আইতে দেয় না বুইল্যাইতো দাম এত বাড়তে আছে।'

'ধান-চাউল আইতে দেয় না ক্যান ?'

'কি জানি, ব্রিটিশ সরকারের কি মতলব। জাপান বর্মা মুল্লুক দখল করছে। আসামের দিগে আগাইয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ এইবার যুদ্ধের ঘাঁটি বানাইব এই দেশে। তারা সৈন্য আর যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়া আসছে। আরো অনেক আসব। এই সব লক্ষ লক্ষ সৈন্যদের খাওয়ান লাগব তো! তাই মিলিটারির জন্য ধান-চাউল মজুত করতেছে ব্রিটিশ সরকার।

'হ আমিও হুনছি।' মেহের মুনশি বলে। 'দিঘিরপাড়ের কেরাসিন তেলের পাইকার বলাই কুণ্ডু মাল আনতে গেছিল নারায়ণগঞ্জ। মাল পায় নাই। কেরাসিন তেল বোলে আর পাওয়া যাইব না। সে দেইখ্যা আইছে—শীতলক্ষাপাড়ের আর চাড়ারগোপের পাটের গুদাম—ডেভিড কোম্পানীর ঐ সব বড় বড় পাটের গুদাম মিলিটারি দখল করছে। গাধাবোট, সুলুপ, ফেলাট, মাড়ুয়া নাও বোঝাই অইয়া ধান-চাউল আইতে আছে বিভিন্ন জেলারতন। মালগাড়ি ভইর‍্যা চাউল আহে দিনাজপুরতন। ওইগুলা জমা করতে আছে ঐ সব গুদামে।'

'বিদেশতন গমও নাকি আসতেছে জাহাজ বোঝাই কইর‍্যা।' ফজল বলে। 'এইবার যে মাইনষের কপালে কি আছে, বলা যায় না। বর্মা মুল্লুকতন আগে চাউল আসতো মোটা পেগু চাউল। বর্মা এখন জাপানের দখলে। তাই ওইখানতন আর চাউল আসব না। সাংঘাতিক মুসিবত সামনে।'

'একটা কতা জিগাই মাত্‌বরের পো।' ধনু শিকদার বলে। 'আমরা হগল বচ্ছর ভাটি মুল্লুকে না অয় উজান দ্যাশে যাই ধান দাইতে। এইবারও মহাজন ঠিক করছি। কাতি মাসের এই কয়দিন পর ভাটি মুল্লুকে যাত্রা করতে চাই। দাওয়ালি নাও যাইতে দিব তো ?'

'খালি নাও লইয়া যাইতে পারবেন। কিন্তু আসার সময় ধান লইয়া আইতে পারবেন না।'

'কষ্ট কইর‍্যা ধান কাটমু, মাড়াই করমু। হেই মিন্নতের ধানের ভাগ যদি না আনতে পারি, তয় মিন্নত কইর‍্যা লাভ কি ?' ক্ষোভ ও হতাশা ধনু শিকদারের কণ্ঠে।

'আমরা ঢাকা-ফরিদপুরের দাওয়ালরা যদি না যাই তয়তো ভাটি আর উজান মুল্লুকের খেতের ধান খেতেই নষ্ট অইব।' বলে আহাদালী।

'তাতো অইবই। ব্রিটিশ সরকারের কি এখন এই দিগে খেয়াল আছে ? তারা এখন যুদ্ধ লইয়া পেরেশান। ক্যামনে জাপানরে হটাইয়া নিজেগ রাজ্য উদ্ধার করব। *'ভারত ছাড়'* আন্দোলনের অনেক নেতা এখন জেলে। তারা আলোচনা করতে আছিল আমাগ প্রধানমন্ত্রী হক সায়েবরে না জিগাইয়া ছোট লাট মিলিটারিগ লগে যুক্তি কইর‍্যা কয়েকটা জেলার ধান-চাউল সরাইয়া দিছে বাংলার বাইরে, জাপান আইয়া পড়লে খাদ্যের অভাবে যাতে মুশকিলে পড়ে, লড়াই করতে না পারে। এই নিয়া হক সায়েবের সাথে ছোট লাটের বিরোধ চলতে আছে। রাজবন্দিরা আরো কইতেছিল—গুদামে গুদামে মিলিটারিরা ধান-চাউল জমা করতে আছে খালি তাগ খাওয়ার লেইগ্যা না। জাপান আইয়া পড়লে ওনারা বেবাক পোড়াইয়া দিয়া ভাইগ্যা যাইব। জাপানিরা খাদ্যের অভাবে আর লড়াই করতে পারব না।'

'কিন্তু হেই লগে আমরাও তো খাওন না পাইয়া মইর‍্যা যাইমু। আমাগ তিন-চাইর মাসের খোরাক আছে ভাটি না অয় উজান মুল্লুকতন। আমাগো তো বাঁচনের কোনো পথ দ্যাখতে আছি না।'

BanglaBook.org

'হ, বড় খারাপ দিন আইতে আছে। এখন যদি আমন ধান পাকার আগে চরটা দখল করা যায়, তয় কিছুটা বাঁচার আশা আছে।'

'হ ঠিকই কইছ।' রমিজ মিরধা বলে। 'কিন্তু জঙ্গুরুল্লার দলরে ক্যামনে হটান যায়?'

'আপনেরাই বুদ্ধি দ্যান, কেমন কইর‍্যা—'

'আমরা তো কোনো কূলকিনারা পাইতেছি না।' বলে মেহের মুনশি।

'শোনেন, আমারে মুনশিগঞ্জ জেলেরতন পাঠাইছিল ঢাকা জেলে। আমি ঢাকা জেলেরতন খালাস পাইয়া আইছি। জঙ্গুরুল্লার দল আমার ছাড়া পাওয়ার কথা তাড়াতাড়ি জানতে পারব না। সেই জন্যই আপনেগ চুপে-চাপে আইতে কইছি। তারা তো তিনমাস হিসাব কইর‍্যা রাখছে। তাগ হিসাব মতন অগ্রাণ মাসের পাঁচ-ছয় তারিখে আমি ছাড়া পাইমু। কিন্তু আমি চব্বিশদিন আগেই ছাড়া পাইয়া আইছি। জেলখানায় ভালো মতন চললে, হুকুম মতন কাম করলে জেল মাফ পাওয়া যায়। জঙ্গুরুল্লারা তো এই খবর রাখে না। তাই চাকইর‍্যা এখন একটাও নাই চরে।'

'হ, তোমার ছাড়া পাওয়ার খবর পাইলে আবার চাকইর‍্যা আইন্যা রাখব চরে।'

'তখন কিন্তু চর দখল করা মুশকিল অইয়া পড়ব। আমি কাইল একটা দিন বাড়িতে আছি। পরশু দূরে একখানে চইল্যা যাইমু। জেলখানায় পালং থানার একজনের কাছে ভালো চাকইর‍্যার সন্ধান পাইছি। মেঘু আর আলেফের মতো চাকইর‍্যা দিয়া কাম ফতে অইব না। আমি দুই-তিন দিনের মইদ্য ঐ চাকইর‍্যা লইয়া আইমু। আমি যে ছাড়া পাইয়া আইছি এই কথা যেন একটা কাউয়ায়ও জানতে না পারে।'

'ও মিয়ারা হোনলা নি? খবরদার! এই কথা জানাজানি অইলে কিন্তু কোনো কাম অইব না।'

'বোঝলা তো মিয়ারা?' রমিজ মিরধা বলে। 'নিজের কপালের লগে বেবাকের কপাল পোড়াইও না। যার মোখ দিয়া এই কতা বাইর অইব সে তার বাপের জর্মের না। সে একটা জারুয়া। এই কইয়া দিলাম।'

'শোনেন, অনেক টাকার দরকার।' ফজল বলে। 'আমি আমাগ বেবাক গয়না বন্ধক দিমু। আপনারা নিজেগ সাধ্যমত টাকা জোগাড় কইর‍্যা কাইলই নিয়া আসেন। নগদ টাকা না থাকলে গয়না বন্ধক দেওন লাগব। চর ফতে অইলে সব আবার ফিরত পাইবেন।'

'হ, চরের জমি খাইতে অইলে টাকা খরচ করন লাগব।' মেহের মুনশি বলে। 'আপনারা সবাই রাজি তো?'

ফজল তার কাজে-কর্মে, ব্যবহারে এদের আস্থা অর্জন করেছে। সকলের অগাধ বিশ্বাস তার ওপর। মাছ ধরার ব্যবস্থা করে গরিব কোলশরিকদের যেভাবে সে সাহায্য করেছিল তা কেউ ভোলেনি। তাই তার প্রস্তাবে সবাই রাজি হয়।

ফজল বলে, 'আপনারা বাড়ি যান। মুনশি ভাই, আর মিরধা ভাই এই রাত্রের মইদ্যে টাকা অথবা গয়না যোগাড় করেন। ঐগুলা লইয়া কাইল ভোরে আমার এইখানে চইল্যা আসবেন।'

একে একে সবাই নিজ নিজ বাড়ির দিকে রওনা হয়।

পরের দিন। ভোরবেলা বরুবিবি রসুইঘরে চালের গুঁড়োয় পানি মিশিয়ে চিতই পিঠার গোলা তৈরি করছিল।

ফজল দরজার মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি করতে আছ, মা।'

'কয়ডা চিতই পিডা বানাইমু। তুই আবার বাইরে চইল্যা যাইস না।'

BanglaBook.org

'না, যাইমু না। তুমি আত ধুইয়া গয়নার পোটলাডা নামাইয়া দ্যাও তো মা।'

'গয়নার পোটলা! বউর গয়নার ?'

'হ।'

'ঐ পোটলা দিয়া তুই কি করবি ?'

'কাম আছে। অনেক টাকার দরকার।'

'উঁহু! এই গয়নাতো রূপজানের। উনি মরার সময় কইয়া গেছেন—ঐ গয়না রূপজানের মহরানার হক।'

'শোন মা, আমারতন জবরদস্তি কইর‍্যা তালাক নিছে। ঐ সময় আরশেদ মোল্লা মহরানার দাবি ছাইড়্যা দিছে।'

'আরশেদ মোল্লা দাবি ছাইড়্যা দেউক। কিন্তুক উনি তো কইয়া গেছেন—গয়নাগুলা রূপজানের মহরানার হক।'

'ঠিক আছে, ঐগুলো রূপজানেরই থাকব। এখন টাকার বড় দরকার। ঐগুলা বন্ধক দিয়া কিছু টাকা আনতে অইব।'

'না রে বা'জান, হেষে যদি ছাড়াইতে না পারস ?'

'ছাড়াইতে পারমু না ক্যান্ ? তোমারে কথা দিলাম, চাইর মাসের মইদ্যে ওগুলা ছাড়াইয়া আইন্যা যারডা তারে ফিরাইয়া দিমু।'

অনেক পীড়াপীড়ির পর বরুবিবি রাজি হয়। সে হাত ধুয়ে ঘরে যায়। সিন্দুক খুলে গয়নার পুটলি বের করে। ফজলের হাতে ওটা দিয়ে সে বলে, 'দ্যাখরে বাজান, এইগুলা খুয়াইয়া ফেলাইলে কিন্তুক দায়িকের তলে থাকবি। মহরানার দেনা আর শোধ করতে পারবি না।'

গয়নার পুটলি নিয়ে ফজল নিজের ঘরে যায়। চৌকির ওপর বসে সে পুটলি খোলে, একটা-একটা করে দেখে গয়নাগুলো। ওগুলো নাড়াচাড়া করার সময় গয়না পরিহিতা রূপজানের ছবি বারবার ভেসে ওঠে তার মনে।

ফজলের মনে প্রশ্ন জাগে, রূপজান গয়নাগুলো কেন ফেরত দিয়েছিল ? তবে কি সে জোর-জবরদস্তির তালাক মেনে নিয়েছে ? না, অসম্ভব। এ তালাক সে মেনে নিতে পারে না। গয়না বিক্রি করে তার মামলার তদবির করার জন্য সে কাদিরকে দিয়ে ওগুলো ফেরত পাঠিয়েছিল। কাদির তো তাই বলেছিল ওগুলো ফেরত দেয়ার সময়। সে তো বানিয়ে বলেনি কিছু। রূপজান যা বলে দিয়েছিল তা-ই সে বলেছে।

গয়নাগুলোয় হাত বুলাতে বুলাতে সে মনে মনে বলে, 'হায় রে অভাব! এই অভাবের তাড়নায় রূপজানের শরীল খালি কইর‍্যা একবার বন্ধক দিতে অইছিল এই গয়নাগুলা। এখন আবার বন্ধক দিতে অইব।'

কেমনে যেন সর্বস্ব হারানোর আশঙ্কায় ব্যথিয়ে ওঠে তার বুকের ভেতরটা।

'মিয়া ভাই।'

আমিনার ডাকে সংবিৎ ফিরে পায় ফজল, 'কে রে আমিনা ? আয়।'

একটা থালায় করে চিতই পিঠা, নারকেল কোরা ও ঝোলা গুড় নিয়ে আসে আমিনা।

'কিরে, তাল নাই ? তালের মওসুম কি শেষ ?'

'এইডাতো কাতি মাস। এহন কি আর তাল পাওয়া যাইব ? হাশাইলের হাটে পাওয়া যাইতে পারে দুই একটা।'

BanglaBook.org

'এই বচ্ছর তাল চোখে দেখি নাই।' গুড় ও নারকেল সহযোগে চিতই পিঠায় এক কামড় দিয়ে ফজল বলে, 'চিতই পিঠার লগে তালের পায়েস! ওহ্ যা মজা!'

'ভাবি তো নাই। তাল গোলাইব কে ?'

'ক্যান্ তুই ? পারবিনা গোলাইতে ?'

'উঁহু। তাল গোলান কি যেমুন-তেমুন কষ্ট।' আমিনা গান গাইত গাইতে রসুই-ঘরের দিকে চলে যায়—

'তাল গোলাগোল যেমুন তেমুন,
আঁইট্যা দ্যাখলে ভয় করে,
তার চুল-দাড়িরে ভয় করে,
'অ ভাইজান, আমি তাল খাইনা ডরে।'

ফজলের মনের চোখে ভেসে ওঠে, রূপজান সবল সুডৌল হাত দিয়ে তালের আঁটি দলাইমলাই করে ঘন গোলা বের করছে আর গুনগুন করে গান গাইছে—

তাল গোলাগোল যেমুন তেমুন,
আঁইট্যা দ্যাখলে ভয় করে,
তার চুল-দাড়িরে ভয় করে,
অ বু'জান, আমি তাল খাইনা ডরে গো,
তাল খাইনা ডরে।

তালের আঁইট্যায় চুল-দাড়ি
খামচা দ্যাও আর দ্যাও বাড়ি
ডলা দিয়া বাইর করগো রস,
অ বউ, বেতাইল্লারে এমনে করো বশ গো,
এমনে করো বশ।

BanglaBook.org

হাতে-ধরা চিতই পিঠা মুখে দিতে ভুলে যায় ফজল। তার কল্পনা রূপজানকে নিয়ে আসে তার চোখের সামনে। তাল গোলাতে গোলাতে রূপজান তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে আর গান গাইছে—

তালের গোলা বেতাল করে,
জ্বাল দিলে যে উতরে পড়ে,
অ বু'জান, হইল কি কারবার গো,
হইল কি কারবার।
তাল পড়লে উত্‌রাইয়া,
পড়িস না গো চিত্‌তরাইয়া,
অ বউ, নিভু জ্বালে তালে তালে
নাড়া দে বারবার গো,
নাড়া দে বারবার।

'অ দুদু।'

নূরুর ডাকে কল্পনার ছবি মুছে যায় হঠাৎ।

'কি রে নূরু, ডাক দিলি ক্যান্ ?'

'রমিজ মিরধা আর মেহের মুনশি আইছে।'

'কাছারি ঘরে বইতে দে। পান-তামুক দে। আমি আইতে আছি।'

পিঠা খাওয়া শেষ করে গয়নার পুঁটলি নিয়ে ফজল কাছারি ঘরে যায়।

সালাম বিনিময়ের পর মেহের মুনশি বলে 'নগদ টাকা অনেকেই দিতে পারে নাই। বারোজনের কাছে পাইছি দুইশ' পঞ্চাশ টাকা। পনেরো জন দিছে গয়না। বাকি কোলশরিকরা কিচ্ছু দিতে পারে নাই।'

'দিব কইতন?' রমিজ মিরধা বলে। 'বউ-পোলাপান লইয়া ওরা বড় কষ্টে আছে।'

'তাত্তো বুঝলাম।' ফজল বলে, 'কিন্তু অনেক টাকার দরকার। গয়না বন্ধক দিয়া কি অত টাকা জোগাড় করন যাইব?'

'কত টাকা লাগব, আন্দাজ করছনি?' মেহের মুনশি জিজ্ঞেস করে।

'তা প্রায় দুই হাজার টাকা লাগব।'

'তা বেবাক গয়না বন্দক দিলে অইয়া যাইব মনে অয়।' বলে রমিজ মিরধা।

'কি কি গয়না আনছেন, দেখি? কারতন কোন কোন গয়না আনছেন, তার ফর্দ বানাইছেন তো?'

'হ বানাইছি।' মেহের মুনশি বলে।

মেহের মুনশি নগদ দুশ' পঞ্চাশ টাকা দেয় ফজলের হাতে। তারপর পুটলিবাঁধা গয়না ও ফর্দ রাখে ফজলের সামনে।

ফজল পুটলি খুলে গয়নাগুলো ফর্দের সাথে মিলিয়ে নেয়। গয়নার মধ্যে রয়েছে করণফুল, কানপাশা, মাকড়ি, মুড়কি, চুড়ি, বাজু, দানাকবচ। সবগুলো গয়না ও রূপজানের গয়নার পুটলি মেহের মুনশির হাতে তুলে দিয়ে ফজল বলে, 'এইগুলা লইয়া আপনারা দুইজন হাশাইল বাজারে চইল্যা যান। জগু পোদ্দারের দোকানে বন্ধক রাইখ্যা টাকা লইয়া আসেন। আমিই যাইতাম, কিন্তু জঙ্গুরুল্লার কোনো লোক দেইখ্যা ফেলাইলে বেবাক গোলমাল অইয়া যাইব।'

'ঠিক আছে। তোমার যাওনের দরকার নাই। রমিজ মিরধা বলে। 'আমরাই ঠিকঠাক মত ওজন করাইয়া ট্যাহা লইয়া আইতে আছি।'

'হ, ঠিক মতন আলাদা আলাদা ওজন করাইয়া কার গয়নার কত ওজন তা ফর্দে লেইখ্যা রাইখেন। দেড় হাজার টাকা কমে রাজি অইবেন না।'

'গয়না অইব চল্লিশ ভরির কাছাকাছি।' মেহের মুনশি বলে। 'দেড় হাজার টাকা দিব না ক্যান্?'

'না দিলে বিষ্টু পাল আছে, ছিদাম কুণ্ডু আছে। ওনাদের কাছে যাইবেন।'

'ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কইর‍্য না।'

'আইজ সন্ধ্যার পর আপনাগ দুইজনরে লইয়া একটু বসতে অইব। মাইরটা কেমনে কি ভাবে চালাইতে অইব তা আপনাগ সাথে পরামিশ কইর‍্যা ঠিক করণ লাগব।'

'সের দশেক মরিচের গুঁড়া লইয়া আইমু, কি কও?' রমিজ মিরধা বলে। 'ছাইয়ের লগে মিশাইয়া—'

'এখনতো কার্তিক মাস। বাতাসের জোর নাই। এখন ছাই উড়াইয়া কাম অইব না।'

'হ, ঠিকই।' মেহের মুনশি বলে। 'মরিচের গুঁড়ায় পয়সা নষ্ট করণের দরকার নাই।'

BanglaBook.org

তাদের বিদায় দিয়ে ফজল নিজের ঘরে যায়। নূরুর হাতের-লেখার খাতা থেকে এক টুকরা সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সে খুনের চরের নক্সা আঁকে। কোন দিক থেকে কখন কিভাবে আক্রমণ করলে জঙ্গুরুল্লার দলকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে তার পরিকল্পনা ঘুরতে থাকে তার মগজের মধ্যে।

॥ বাইশ ॥

জোর যার মুল্লুক তার—সর্বজনবিদিত এ প্রবচনটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে চর অঞ্চলে যে রূপ নিয়েছে তা হচ্ছে—

জোর যার চর তার।
জোর কার, চর কার?
হাতিয়ার সাথী যার।

ঢাল, কাতরা, লাঠি, শড়কি, লেজা, চ্যাঙ্গা, গুলের বাঁশ ইত্যাদি হাতিয়ারগুলো চরবাসীদের সাথী। পুলিসের ভয়ে চর ছেড়ে পালাবার সময় ফজলদের দলের অনেকেই তাদের সাথী হারিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল। হাতিয়ার ছাড়া চরে বসত করা যায় না। তাই কয়েক মাসের মধ্যে কষ্টেসৃষ্টে তারা তাদের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে আবার।

ফজলও জানে দলের সবাই হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সে ছিল ফেরার, তারপর আবার জেলে। তাই হাতিয়ারগুলো দেখার সুযোগ পায়নি সে এতদিন। প্রত্যেকের হাতিয়ার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তার নির্দেশ মতো বিকেল বেলা নৌকার ডওরায় লুকিয়ে সবাই নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে আসে ফজলের কাছে। হাতিয়ারগুলো মোটামুটি ভালোই বানিয়েছে বলে মনে হয় ফজলের। তবে কয়েকটা শড়কি ও লেজার হাতলে এর মধ্যেই ঘুণ লেগে গেছে। বাবাত্তি বাঁশ দিয়ে বানিয়েছে বলেই এ অবস্থা। হাতলগুলো বদলাতে হবে। দুটো গুলেল বাঁশের টঙ্কার কানে বাজে না ভেমন। এগুলো বাতিল করে তিন দিনের মধ্যে নতুন বানিয়ে নিতে হবে। ঢাল অতি আবশ্যকীয় বস্তু। আস্ত বেত দিয়ে প্রত্যেকেই তৈরি করেছে নিজ নিজ ঢাল। ছোট বড় মিলিয়ে সংখ্যায় একশ' চৌত্রিশটা। বারোটা বাদে সবগুলোয় কষ-কুঁড়োর মাজন লাগানো হয়েছে ঠিক মত। গাব বা উইর‍্যাম গোটার কষের সাথে পরিমাণ মতো চালের কুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি হয় এ মাজন। এ মাজন কয়েক পোঁচ দিতে পারলে ঢাল খুব শক্ত-পোক্ত হয়, ঘুণ বাসা বাঁধতে পারে না। মাজন লাগাবার জন্য বারোটা ঢালের মালিকদের তিনদিনের সময় দেয় ফজল। ঘন গিঁঠযুক্ত চিকন পাকাপোক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি করতে হয় যার যার নিজের হাতের পাঁচ-হাতি লাঠি। ফজল এক একটা লাঠির দু'দিক ধরে হাঁটুর সাথে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করে। চারটে লাঠি মট্‌মটাৎ করে ভেঙেই গেল পরীক্ষার সময়। এ লাঠিয়ালদের নতুন লাঠি বানাবার জন্য সময় দেয়া হয় দুদিন। রামদা পাওয়া গেল মাত্র ছয়খানা। রামদা নিয়ে ডাকাতি করে ডাকাতরা। তাই পরিচিত লোহারু ছাড়া কেউ এ অস্ত্র বানিয়ে দিতে রাজি হয় না। ফজল বুড়ো আঙুলের মাথা দিয়ে ধার পরীক্ষা করে রামদাগুলোর। সবগুলোতেই পাইন দেয়া দরকার। কিন্তু দিঘিরপাড় বা হাশাইলের লোহারুর দোকানে এগুলো নিয়ে যাওয়া যাবে না। গেলেই সাথে সাথে রটে যাবে তাদের প্রস্তুতির খবর। এগুলো বালিগচার ওপর *'করাইত্যা'* বালিতে ঘষে ধার উঠাবার চেষ্টা করতে হবে। ধার না উঠলেও চিন্তা নেই। কারণ রামদা দিয়ে তো মানুষ কাটতে যাচ্ছে না তারা। দাগুলোকে ঘষে চকচকে ঝকঝকে বানাতে হবে। দেখলেই যেন বিপক্ষীয় লড়িয়েদের পিলে

BanglaBook.org

চমকে যায়। রামদা কম থাকলেও ফজলের ভাবনার কিছু নেই। সে তো রামদাওয়ালা চাকরিয়া আনতেই যাচ্ছে দক্ষিণপাড়।

গুলেল বাঁশের জন্য প্রচুর গুলির প্রয়োজন। হিসেব করে দেখা যায় পয়তাল্লিশটা গুলেল বাঁশের জন্য মাত্র আটশ' মাটির গুলি তৈরি আছে। রোদে শুকানো গুলিগুলো পুড়িয়ে নিতে হবে। আরো অন্ততঃ দেড় হাজার গুলির দরকার। দশসের টাডি সুপারি আর দশসের ঝাঁকিজালের কাঁঠি কিনে নিলেই দেড় হাজার গুলির অভাব পূরণ হবে।

ফজল এবার কাগজ-কলম নিয়ে লড়াইয়ের লায়েক মানুষের হিসেব করতে শুরু করে। কোলশরিকের সংখ্যা ছাপ্পান্ন। এদের মধ্যে দু'জন বুড়োকে বাদ দিলে থাকে চুয়ান্ন জন। তাদের জোয়ান মরদ ছেলের সংখ্যা বিয়াল্লিশ। উঠতি বয়সের কিশোরের সংখ্যা ছত্রিশ। চাকরিয়া অন্তত পঁচিশ জন। মোট একশ' সাতান্ন জন।

এবার নৌকার হিসেব। এগারো-হাতি ডিঙি আঠারোটা। প্রত্যেকটায় চারজন করে চার-আঠারং বাহাত্তর জনের জায়গা হবে। তেরোহাতি ডিঙি পাঁচখানা। প্রত্যেকটায় পাঁচজন করে পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ। দু'খানা বড় ঢুশা নৌকা। কুড়ি জন করে কুড়ি দ্বিগুণে চল্লিশ। একটা ধূরী। এতে জায়গা হবে পনেরো জনের। ফজলের ঘাসি নৌকায় ধরবে কমপক্ষে তিরশি জন।

ছোট বড় মিলিয়ে মোট নৌকার সংখ্যা সাতাশ। তাতে লোক ধরবে কমপক্ষে একশ' বিরাশি জন।

'যথেষ্ট! যথেষ্ট!' ফজল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা তুলে তাকায় তার লোকজনের দিকে।

'কি মিয়া, কি যথেষ্ট?' জিজ্ঞেস করে কদম শিকারি।

'নাও যা আছে, যথেষ্ট। সাতাশটা নাও আছে। আমাগ বেবাক মানুষ ফারাগত মতন বসতে পারব নায়। শোনেন শিকারির পো। সামনের ভোর রাত্রে ঘাসিটা লইয়া রওনা দিমু দক্ষিণপাড়া। চাকইর‍্যা আনতে যাইমু পালং থানার বাসুদেবপুর। ঘাসি বাইতে পাঁচজন বাইছা ঠিক করেন।'

কদম শিকারি জোয়ান দেখে পাঁচ জনকে বাচাই করে। অনেকেই ফজলের সাথে যাওয়ার জন্য বায়না ধরে। কিন্তু ফেয়ার সময় চাকরিয়া বোঝাই করে আনতে হবে বলে তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে নিরস্ত করতে হয়।

বেলা ডোবার আর বেশি দেরি নেই। সবাইকে চুপেচাপে হাতিয়ার ঠিকঠাক করতে হবে, তাদের প্রস্তুতির ব্যাপারটা কাকপক্ষীও জানতে পারবে না। ফজলের এসব নির্দেশ নিয়ে কদম শিকারি ও জাবেদ লশকর ছাড়া সবাই যার যার বাড়ি চলে যায়।

কদম শিকারি ও জাবেদ লশকরকে কাছারি ঘরে বসিয়ে ফজল ভেতর বাড়ি যায়। উঠানে পা দিয়েই দেখে তার মা উত্তরভিটি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ থমথমে, মেঘাচ্ছন্ন।

'অ্যাই ফজু, এই দিগে আয়।' বরুবিবি ডাকে।

'কি মা?'

'কি হুনতে আছি অ্যাঁ? তোরা আবার কাইজ্যা করণের লেইগ্যা হাজাহাজি করতে আছস?'

'আমাগ হকের চর অন্যে দখল কইর‍্যা লইয়া গেছে। সেই চর রাহেলিল্লাহ ছাইড়্যা দিমু?'

'ছাইড়্যা দে বা'জান। চর বড়, না জান বড়? জানে বাঁইচ্যা থাকলে—'

'মা তুমি চুপ করো দেহি। বা'জান মনে এত কষ্ট লইয়া মরছে। আমারে ওরা জেলের ভাত খাওয়াইছে। ওগ এমনে এমনে ছাইড়্যা দিমু।'

BanglaBook.org

'কি করবি বা'জান ? অদিষ্টে যা আছিল তা অইছে। আর মারামারি কাডাকাডির মইদ্যে যাইস না।'

'মা এতগুলা মানুষ, এতগুলা কোলশরিক আমারে মাতবর বানাইছে। আমার মুখের দিকে চাইয়া আছে। হকের জমি যদি এমনে এমনে ছাইড়্যা দেই তয়তো চরে আর বসত করণ যাইব না।'

'চরে আর বসত করণের কাম নাই, বা'জান। তোর বা'জানের আগে তোর বড় চাচা আছিল মাতবর। আমাগ ঘর-বাড়ি আছিল লটাবইন্যায়। এই খুনের চরেরই নাম আছিল লটাবইন্যা। এই লটাবইন্যা ভাঙ্গনের পর বউ-পোলা-মাইয়া লইয়া হেই যে ছাব্বিশ সনের বন্যার পরের বচ্ছর আসুলিতে চইল্যা গেল, হউর বাড়িতে গিয়া ওঠল, আর চরের মাড়িতে ফির‍্যা আইল না। উনিতো কত শান্তির মইদ্যে দিয়া গুজাইর‍্যা গেছে। তুই জেলে থাকতে তোর চাচি আইছিল তার ছোড পোলা লইয়া। তাগো কাছে হুনছি, তাগো ঐ জা'গায় মারামারি নাই, কাডাকাডি নাই। কত শান্তি! বা'জান ফজু, চল আমরাও আসুলিতে চইল্যা যাই।'

'আসুলিতে কই যাইমু ? সেইখানে কি আমাগ মামুর বাড়ি আছে নি ? তোমার বাপের বাড়িতো আছিল ভূকৈলাশ। সেই চরও ভাইঙ্গা গেছে। মামুরা এখন পাতনা দিয়া আছে মিত্রের চরে। যাইবা সেইখানে ?'

'বেবাক বেইচ্যা কিন্যা চল পাইকপাড়া যাই। তোর চাচাতো ভাইরা তো আছে।'

'বা'জান বাঁইচ্যা থাকতে চাচায়ই কোনো দিন জিগায় নাই। এহন চাচাতো ভাইরা কি আর জিগাইব ? শোন মা, এই চর ছাইড়্যা আর যাওনের কোনো জায়গা নাই আমাগো।'

বরুবিবির চোখের কোলে পানি চকচক করছিল এতক্ষণ। এবার দু'গাল বেয়ে দরদর ধারায় শুরু হয় অশ্রুর প্লাবন।

ফজল শঙ্কিত হয়। মা হয়তো এখনি বিলাপ করতে শুরু করবে। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সে বলে, 'মা তুমি চিন্তা কইর‍্য না। আমিতো মাতবর। আমিতো মারামারি করতে যাইতে আছি না। চাকইর‍্যা আনতে যাইতে আছি। চাকইর‍্যারাই মাইর করব। তুমি একটুও চিন্তা কইর‍্য না।'

বরুবিবি আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘরের ভেতর চলে যায়। ফজল ফিরে আসে কাছারি ঘরে।

সন্ধ্যার পর মেহের মুনশি ও রমিজ মিরধা আসে।

মেহের মুনশি তার কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধা খুতি বের করে। ফজলের সামনে সেটা উপুড় করে ঢালতে ঢালতে বলে, 'অনেক কইয়া-বুইল্লা দেড় হাজার টাকাই আনছি। পোদ্দারের পো কি রাজি অইতে চায়!'

'সুদ কি হারে নিব।' ফজর জিজ্ঞেস করে।

'শ' তে মাসিক পাঁচটাকা।'

'তার মানে পনেরোশ' টাকার সুদ এক মাসে পঁচাত্তর টাকা! ওরে আল্লারে!'

'সুদের হার তো বড় বেশি!' কদম শিকারি বলে।

'হ সুদের হার বেশিই।' রজিম মিরধা বলে। 'শোন ফজল মিয়া, ত্বরাত্বরিই ট্যাহা শোধ দিতে অইব। সুদের পোলা-মাইয়া নাতি-পুতি বিয়ানের সময় দেওন যাইব না। ওগুলা বিয়াইতে শুরু করলে কিন্তুক উফায় নাই। তহন গয়নাগুলা বেবাক খুয়াইতে অইব।'

BanglaBook.org

'হ তাড়াতাড়িই টাকা শোধ দিয়া গয়না ছাড়াইয়া আনতে অইব। দেরি করণ যাইব না।'

মেহের মুনশির কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা গুনে নিয়ে ফজল অন্দরে যায়। সিন্দুকে টাকাগুলো রেখে আবার কাছারি ঘরে ফিরে আসে।

অনেকক্ষণ ধরে তারা সলা-পরামর্শ করে। মেহের মুনশি, রমিজ মিরধা ও কদম শিকারি হামলা করার যে সব কায়দা-কৌশলের কথা বলে তা সবই পুরানো, বহুল ব্যবহৃত দাদা-পরদাদার আমলের পদ্ধতি। ওতে খুন-জখম এড়ানো সম্ভব নয়। খুন-জখম না করে বিপক্ষ দলকে কিভাবে নাস্তানাবুদ করে চর থেকে হটিয়ে দেয়া যায় তার ফন্দি-ফিকিরের জন্য ফজল অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে। জেলে থাকতে অনেকের সাথে আলোচনা করেছে। অনেক ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা একটা করে রেখেছে সে, গেঁথে রেখেছে মনের মধ্যে। কিন্তু এখনি, এত আগে তা প্রকাশ করা সমীচীন নয়। কারণ সে মনে করে, এদের কানাকানি থেকে বাইরে জানাজানি হবে আর জানাজানি হলেই সব আয়োজন হবে বিলকুল বরবাদ। সে শুধু বলে 'দুইজন বুড়া বাদে সবাইকে হাতিয়ার হাতে নিতে অইব। আমাগ মোট মানুষের সংখ্যা উঠন্তি চ্যাংড়া লইয়া একশ বত্রিশ জন। এই সব মানুষের লিস্টি তৈরি করতে অইব। পয়লা পরথম বাছাই করেন ল্যাগবেগা হ্যাংম্যাইঙ্গা গুলারে। তারপর বাছাই করেন চ্যাংড়া লেদুফেদু গুলারে। ঢাল-কাতরা, লাঠি-শড়কি লইয়া ওরা মুখামুখি লড়তে পারব না। ওগ হাতে দিতে অইব গুলাইল বাঁশ। দূরের তন ওরা গুলাইল মারব। যারা গুলাইল মারতে জানে না, এই কয় দিনের মইদ্যে তাগো শিখাইয়া লইতে অইব। কলাগাছের মাজায় চান্দের মতো গোল দাগ দিয়া চানমারির ব্যবস্থা করবেন। মাটির গুলি মাইর‍্যা মাইর‍্যা ওরা মারতে শিখব।'

একটু থেমে ফজল আবার বলে, 'তুরফানের কাছে যারা লাঠি খেলা শিখছিল, আলেফ সরদার আর মেঘু পালোয়ানের কাছে যারা শড়কি চালান শিখছিল, তারা এই কয়দিন খুব কইর‍্যা অভ্যাস করব। চাকইর‍্যা আইলে চাকইর‍্যাগ লগে পরামিশ কইর‍্যা ঠিক করণ লাগব কোন ভাবে হামলা করলে কাম ফতে অইব। আপনারা—'

'ক্যাডারে?' বাইরে মানুষের চলাফেরার শব্দ পেয়ে হাঁক দেয় মেহের মুনশি।

'আমরা।'

'আমরা ক্যাডা?'

'চান্দু, বক্কর—আমরা ঘাসি লইয়া ফজল ভাইর লগে যাইমু।'

'তোমরা এই রাইতে আইয়া পড়ছ?' ফজল জিজ্ঞেস করে।

'হ, ঘুমাইয়া গেলে যদি জাগন না পাই।'

'ভালো করছ। দাঁড়, বাদাম, গুন, লগি সব ঠিকঠাক মতো নায়ে উডাও। তোমরাও নায়ের মইদ্যে ঘুমাইয়া থাক গিয়া। পোয়াত্যা তারা ওডনের আগে রওনা দিতে অইব। আর তিনজন কই?'

'তারা এহনই আইয়া পড়ব।'

'আইচ্ছা যাও।'

ফজল তার আগের কথার জের টেনে বলে, 'আপনারা লিস্টিগুলা কইর‍্যা রাইখেন। আইজ আর আলোচনার দরকার নাই। চাকইর‍্যারা আইলেই 'ফাইনাল' আলোচনা অইব।'

সবাইকে বিদায় দিয়ে ফজল অন্দরে গিয়ে দেখে তার মা বারান্দায় তার জন্য খাবার সাজিয়ে বসে বসে তসবি গুনছে।

BanglaBook.org

॥ তেইশ ॥

ভোর রাত্রেই পাঁচজন বাইছা নিয়ে নৌকায় চড়ে রওনা হয়েছিল ফজল। বাদাম উড়িয়ে, দাঁড় মেরে, গুন টেনে, পদ্মা উজিয়ে, কীর্তিনাশা ভাটিয়ে তারা যখন পালং পৌঁছে তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। লোকের কাছ থেকে বাসুদেবপুরের পথের খবর নিয়ে তারা নৌকাটাকে একটা বড় খালের ভেতর দিয়ে বেয়ে নিয়ে যায়। মাইল দু'য়েক গিয়ে একটা শুকনো সরু খালের মুখে নৌকাটাকে বাঁধে।

চলতি নৌকায় রান্নার ঝামেলা অনেক। তাই গুড় আর কলা দিয়ে মুড়ি খেয়ে কোনো রকমে পেটকে বুঝ দিয়ে এতদূর এসেছে তারা। এসব চাকুমচুকুম আর গছানো যাবে না পেটকে। চাল, ডাল, মুরগি আলু, তেল, নুন, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল ফজল। তিনজনের ওপর রান্নার ভার দিয়ে বক্কর আর টিটুকে নিয়ে ফজল নৌকা থেকে নামে। ফজলের হাতে রশির ঝুলনায় একটা সন্দেশের হাঁড়ি।

ফজল জেল থেকেই শুনে এসেছিল রামদয়াল সরদার খুব মেজাজি লোক। তাই তাকে খুশি করার জন্য পথে নৌকা থামিয়ে সে নড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ সন্দেশ কিনে নিয়ে এসেছে।

লোকের কাছ জিজ্ঞেস করে খাল পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা রামদয়াল সরদারের বাড়ি পৌঁছে।

লুঙ্গি-পরা অপরিচিত লোক এসেছে শুনে বিরক্তির সাথে রামদয়াল ঘর থেকে উঠানে নামে। আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে তার বিরক্তিভরা গম্ভীর দৃষ্টি হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ফজলের হাত থেকে সন্দেশের হাঁড়িটা নিতে নিতে সে বলে, 'এগুলা আবার ক্যান্ আনছ, বাবা ? হাঁড়িটা পর্শ করো নাই তো ?'

'না, না দড়ির ঝুলনা ধইর‍্যা আনছি।'

উঠানে মাদুর বিছিয়ে তাদের বসতে দেয়া হয়।

রামদয়াল সরদারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। তার দোহারা পেশিবহুল মজবুত শরীরে ভাটার টান লাগলেও গায়ের কুচকুচে কষ্টিকালো রংয়ের জন্যই বোধ হয় তা চোখে পড়ে না।

রামদয়াল সরদার তার আসল নাম নয়। তার আসল নাম পাঁচকড়ি মণ্ডল। জমি দখলের 'কাইজ্যায়' তার দল রামদা নিয়ে লড়াই করত। রামদাওয়ালা সরদারই লোকের মুখে মুখে বিবর্তিত হয়ে রামদয়াল সরদার হয়েছে। এই নামেই সে পরিচিত আজকাল। আসল নামে আর কেউ চিনে না তাকে। সে নিজেও বোধ হয় ভুলে গেছে তার আসল নাম।

খুনের চরের বৃত্তান্ত শেষ করে ফজল তার এখানে আসার উদ্দেশ্য রামদয়ালকে জানায়। রামদয়ালের মুখ সমবেদনায় বিষণ্ন। আফসোসসূচক শ-শ শব্দ করে সে বলে, 'বড় অদিনে আইছ বাবা। আমার দল তো আর নাই। দল তো কবে ভাইঙ্গা গেছে।'

ফজলের মাথায় যেন হঠাৎ বাজ পড়ে। সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে রামদয়ালের মুখের দিকে।

ফজলের অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করে রামদয়াল আবার বলে, 'আমাগ আর কেও জিগায় না আইজকাইল। আগে বরিশাল, ভোলা, চানপুর, মেন্দীগঞ্জে, হিজলা আরো কত জায়গা থিকা লইয়া যাইত আমাগ। আড়িয়াল খাঁ আর মেঘনার কত কত চর দখল কইর‍্যা দিয়া আইছি। তোমাগ পদ্মার চরে যাই নাই কোনোদিন। এহন চরুয়ারা নিজেরা নিজেরাই

BanglaBook.org

লড়াই করে, দশ-পাঁচটা খুন-জখম অয়, হাজতে যায়, জেল খাডে। আমাগ আতে খুন-জখম বড় একটা অইত না।'

একটু থেমে আবার বলে, 'আগে আশ্বিন-কাতি মাসে বাড়ির ভাত খাইতে পারতাম না। আইজ এই চর, কাইল অই চর দখলের লেইগ্যা মাইনষে আতে-পায়ে ধরত। গেল কয়েক বচ্ছর ধইর‍্যা আর কেও নিতে আহে না। দুই একটা যা আইত, উচিত পয়সা দিত না। এমনে কি আর সংসার চলে? আমাগ অনেকেরই জমাজমি নাই। দলের মানুষ প্যাডের ধান্দায় নানান জা'গায়, নানান কাজে চইল্যা গেছে। বারো-তেরো জন তো বউ-পোলা-মাইয়া লইয়া গেছে আসাম মুল্লুকে। ওরা আর ফির‍্যা আইব না কোনো দিন। চার-পাঁচ জন গেছে করাত কামে। তিনজন সইন কইর‍্যা যুদ্দে গেছে। কয়েকজন হাটে হাটে তরি-তরকারি বেচে। দুইজন এক মাল্লাই বায়। কয়েকজন করে কুড়ালের কাম। তারা গাছ কাডে, চলা ফাড়ে। কয়েকজন ওড়া-কোদাল লইয়া কই যে গেছে ভগমান জানে।'

'দশ-বারো জন তো পাওয়া যাইব?' হতাশার ধকল কাটিয়ে ফজল বলে।

'নারে বাপু, তাও নাই। দুই-তিনজন যারাও আছে, তারা কেও জ্বরে কাহিল, কেও বদনা লইয়া দৌড়াদৌড়ি করে।'

ফজল হেসে ওঠে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সে হাসি। সে বলে, 'দলের মানুষ তো নাই, কিন্তু রামদাওগুলাতো আছে?'

'রামদাও দিয়া কি করবা?'

'আমাগ রামদাও নাই। আপনাগ রামদাওগুলা বেইচ্যা ফালান আমার কাছে।'

'রামদাও লইয়া পারবা না বাপু তোমরা লাড়াই করতে। খামাখা—'

'আপনে যদি দেখাইয়া দ্যান, এট্টু শিখাইয়া দ্যান তব পারমু আপনের আশীর্বাদে।'

রামদয়াল বিস্মিত চোখে তাকায় ফজলের দিকে। তার চোখ খুঁটে খুঁটে দেখে ফজলের সিনা, বাহু, আঙুল। সে ফজলের সাথী দুজনকেও দেখে খুঁটে খুঁটে। তারাও হাতে-পায়ে গায়ে-গতরে প্রায় ফজলের মতই বলিষ্ঠ।

রামদয়াল হঠাৎ খপ করে ফজলের ডান হাত ধরে ফেলে বলে, 'আসো দেখি পাঞ্জা লড়ি। দেখি কেমুন জোর আছে শরীলে।'

দু'জনে দু'জনের কব্জী ধরে মাটিতে কবজি রেখে পাঞ্জার লড়াই শুরু করে। যদিও শেষ পর্যন্ত রামদয়ালই জিতে, তবুও ফজলের হাত মাটিতে নোয়াতে তাকে গায়েব সব কুয়ত ঢালতে হয়।

'আপনেরে ওস্তাদ মানলাম, গুরু মানলাম।' ফজল অনুনয় করে বলে। 'শিখাইয়া দ্যান আমাগো।'

'গুরু মানলে দক্ষিণা দিতে অয়। দক্ষিণা কই?'

ফজল জামার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে দেয় রামদয়ালের দিকে।

দশ টাকা! দেড় মণ চালের দাম! যুদ্ধের জন্য হঠাৎ দাম না বাড়লে তো তিন মণই পাওয়া যেত।

রামদয়াল নোটটা ট্যাঁকে গুঁজে উঠে দাঁড়ায়। উত্তর দিকে কিছুদূর গিয়ে সে একটা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে রামদয়াল জঙ্গল থেকে ফিরে আসে। তার একহাতে একটা লম্বা রামদা, অন্যহাতে সদ্য-কাটা একটা তল্লা বাঁশ।

BanglaBook.org

'এই জুয়ান, কি যেন নাম তোমার ?' রামদয়াল জিজ্ঞেস করে।

'ফজল।'

রামদয়াল রামদাটা ফজলের হাতে দিয়ে বলে, 'এই বাঁশটা এক কোপে দুইখণ্ড করতে অইব।'

ফজল রামদাটা নিয়ে ওটার ধার পরীক্ষা করে বলে, 'ধার তো তেমন নাই।'

'ঠিক আছে, তুমি কোপ মারো। আমি ঠিকই বোঝতে পারব।'

রামদয়াল বাঁশটার গোড়ার দিক এগিয়ে দেয় ফজলের দিকে।

সে লাফ মেরে *'ইয়া আলী'* হুঙ্কার দিয়ে কোপ মারে। বাঁশটা দু'টুকরো হয়ে যায়। রামদয়ালের চোখে-মুখে বিস্ময়। সে বলে, 'সাবাস, তুমি পারবা হে। গুরুর নাম রাখতে পারবা।'

রামদয়াল ফজলের সাথী বকর আর টিটুরও পরীক্ষা নেয়। তারা এক কোপে বাঁশটার বারো আনারও বেশি কাটতে সক্ষম হয়।

রামদয়াল বলে, 'তোমরাও চেষ্টা করলে পারবা।'

সে ঘরে গিয়ে দুটো ঢাল ও একটা শড়কি নামিয়ে নিয়ে আসে।

একটা ঢাল ও শড়কি ফজলের হাতে দিয়ে বলে, 'তুমি ঢাল ও শড়কি লইয়া আমারে আক্রমণ করবা। আমি ঢাল আর রামদা দিয়া তোমারে ফিরাইমু।

রামদয়াল ও ফজল যার যার হাতিয়ার নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

রামদয়াল ইশারা দিতেই ফজল শড়কি নিয়ে আক্রমণ করে। রামদয়াল ঢাল দিয়ে শড়কির আঘাত প্রতিহত করেই ডান দিকে সরে বাঁদিকে সামান্য ঘুরে লাফ দিয়ে *'জয় মা কালী'* বলে কোপ মারে শড়কির হাতলে। বাঁশের শুকনো হাতল পুরোপুরি দু'টুকরো হয় না। কোপ খাওয়া হাতলের নিচের অংশের সাথে শড়কির ফলাটা লল্লড় করে। এতেই বেশি অসুবিধেয় পড়ে ফজল। তার হাতের অস্ত্রটা এখন না-শড়কি, না-লাঠি। কোনো ভাবেই সে ওটাকে চালাতে পারে না। ওদিকে রামদয়াল রামদা উঁচিয়ে মার মার করে তেড়ে আসে। ফজল পিছু হটে দৌড় দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

রামদয়াল হাসতে হাসতে বলে, 'এইডা অইল রামদার লাড়াই। শড়কির আতল পুরাপুরি না কাটলেই বেশি ভালো। শড়কিডা দিয়া তহন শড়কির কাম তো না-ই, লাডির কামও চলব না।'

এবার রামদয়াল ঢাল আর শড়কি এবং ফজল ঢাল আর রামদা নিয়ে মহড়া শুরু করে।

ফজলের সাহস শক্তি ও ক্ষিপ্রতায় মুগ্ধ হয় রামদয়াল। এমন ভালো শাগরেদ সে কখনো পায়নি। সে মনে মনে খুশি হয় এই ভেবে যে সে বুড়ো হয়ে গেছে। মরে যাবে আর ক'দিন পর। ফজল তার গুরুর নাম রাখতে পারবে।

ফজলের সাথী দু'জন—বক্কর আর টিটুও একে একে যোগ দেয় মহড়ায়। তারাও মোটামুটি ভালোই দেখিয়েছে রামদা'র লড়াই। রামদয়াল লড়াইয়ের আরো কিছু কায়দা-কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলে, 'তোমরা মাংস বেশি খাও, তাই শক্তি আছে তোমাগ গায়ে, পেঁয়াজ-রশুন খাও, তার তেজ আছে শরীলে। তোমরা অভ্যাস করলে আমাগতন ভালো লাড়াই করতে পারবা।'

'কয়টা রামদাও দিতে পারবেন ?' জিজ্ঞেস করে ফজল। 'ঢালও লাগব ঐ কয়টা। আপনাগ ঢালগুলা বড় আর মজবুত।'

BanglaBook.org

'রামদাও কুড়ি খানেকের বেশি দেওয়ন যাইব না। ঢালও কুড়িডা দেওয়ন যাইব। কিন্তু কত টাকা দিবা ?'

'আপনে কইয়া দ্যান ?'

'কুড়িখান রামদা'র দাম চাইর টাকা কইর‍্যা আশি টাকা আর কুড়িখান ঢাল তিন টাকা কইর‍্যা ষাট টাকা।'

'গুরুজি, এট্টু কমাইয়া ধরেন। একটা রামদাও দুই টাকায় বানান যায়।'

'হেই জিনিস আর এই জিনিসে তফাত আছে। এই জিনিস চাইর টাকার কমে বানাইতে পারবা না।'

'ঠিক আছে, আপনার কথাই রাখলাম। তয় সব মিলাইয়া একশ কুড়ি টাকা দিমু।'

রামদয়ালের দল ভেঙে গেছে। রামদা'র প্রয়োজন তাই শেষ হয়ে গেছে। তার বিশেষ প্রয়োজন এখন টাকার। সে একশ কুড়ি টাকায় জিনিসগুলো দিতে রাজি হয়ে যায়। এ টাকায় মহাজনের কাছে বন্ধক দেয়া দেড় বিঘা জমি ছাড়িয়ে নেয়া যাবে।

ফজল আর তার সাথী দুজনকে নিয়ে রামদয়াল উত্তর দিকের জঙ্গলে ঢোকে। একটা বাঁশঝাড়ের পাশে এলোমেলো করে রাখা কঞ্চির স্তূপ। রামদয়াল কঞ্চিগুলোকে সরিয়ে একটা আয়তাকার গর্ত থেকে কাঠের একটা বাক্স উঠিয়ে আনে। বাক্সের ডালা খুলতে খুলতে সে বলে, 'এগুলা ঘরে রাখলে বিপদ। পুলিস খানাতল্লাশি কইর‍্যা এগুলা পাইলে কি আর বাঁচনের উপায় আছে ? মাজায় দড়ি লাগাইয়া হান্‌দাইয়া দিব জেলে। ঐ ডরে কব্বরের মইদ্যে গুঁজাইয়া রাখছি। নেও, গইন্যা দ্যাহো কয়ডা আছে।'

ফজল গুনে দেখে কুড়িটা আছে রামদা।

'বাক্সডা শুদ্দা লইয়া যাও। বাক্সডা দিয়া আর কি করমু ? বাক্সের দাম দশটাকা দিও।'

'ঠিক আছে। দিমু দশ টাকা।'

'দাওগুলায় পাইন দেওয়া আছে। বালিগচার উপরে বালি দিয়া ধারাইয়া লইও।'

সন্ধ্যার পর বাক্সটা নিয়ে নৌকায় ওঠে ফজল ও তার সাথীরা।

রামদয়াল এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে কুড়িটা ঢাল যোগাড় করে নৌকায় দিয়ে যায়। ফজল একশ' তিরিশ টাকা তার হাতে দিয়ে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

রামদয়াল তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুক, তোমার জয় হোক।'

রামদয়াল চলে যাওয়ার পর বাক্সটা ও ঢালগুলো তারা ধানখেতের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আসে। চৌকিদার-দফাদার বা পুলিস খবর পেয়ে বা বিদেশী নৌকা দেখে সন্দেহ করে নৌকায় তল্লাশি চালালে মুসিবতে পড়তে হবে। সুতরাং সাবধান হওয়া ভালো।

রান্না অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। সবাই খেতে শুয়ে পড়ে। ভোর হওয়ার আগে রওনা দিলেই চলবে।

শুয়ে শুয়ে ফজর চিন্তার জাল বুনতে শুরু করে। যাদের জন্য এত পরিশ্রম করে তারা এই দূর দেশে এসেছিল তাদের পাওয়া গেল না। তাদের হাতিয়ার নিয়ে কাম ফতে করা কি সম্ভব হবে ? কেন হবে না ? নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

সন্দেহের দোলায় নুয়ে পড়া সংকল্প তার আত্মবিশ্বাসের মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

খুনের চর বেদখল হওয়ার পর থেকে, বিশেষ করে জেলে থাকতে ফজল শুধু ভেবেছে আর ভেবেছে। চর দখলের নতুন কায়দা-কৌশল ফন্দি-ফিকির মনে আসতেই তার চোখে ভাসে দুই দলের মারামারির দৃশ্য। অনেকগুলোর মধ্যে তিনটা কৌশল তার মনে সাফল্যের আশা জাগায়। এগুলো নিয়ে সে বাদল আর আক্‌লাসের সাথে আলোচনাও করেছিল। তারাও কৌশলগুলোর প্রশংসা করে বলেছিল, ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে জয় নিশ্চিত।

চাকরিয়া যোগাড়ের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তার উদ্ভাবিত কায়দা-কৌশলগুলো এবার তার মাথার ভেতর জটলা পাকাতে শুরু করে। শুয়ে শুয়ে সে স্থির করে, ফিরে যাওয়ার পথে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো অবশ্যই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে।

ফজলের মনের ভাবনা ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে। সে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়ে।

একদল লোক লাঠি-শড়কি নিয়ে তাড়া করছে রূপজানকে। সে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে নদীর পাড় ধরে। এক পাশ থেকে সে নিজেও দৌড়াচ্ছে শড়কি হাতে। কিন্তু এগুতে পারছে না। হঠাৎ পাড় ভেঙে রূপজান নদীতে পড়ে গেল আর অমনি ঘুমটা ভেঙে গেল তার। সে কাঁপতে থাকে থরথর করে।

একটু পরেই মোরগ বাক দিয়ে ওঠে, কুউ-ক্কুরু-ঁঁ-ৎ-কু-ঁঁ।

ফজল উঠে সবাইকে জাগিয়ে দেয়। তারা তাড়াতাড়ি ধানখেত থেকে রামদা'র বাক্স ও ঢালগুলো নিয়ে আসে, রেখে দেয় ডওরায় পাটাতনের নিচে।

আর একটুও দেরি না করে তারা পাড়া উঠিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়।

খাল উজিয়ে কীর্তিনাশায় পৌঁছতে ভোর হয়ে যায়। উজান পানি ও বাতাসও নেই যে পাল তুলে দেবে। দু'জন গুন নিয়ে নেমে যায় ডাঙায়। কাঁধে বেরুয়া ঠেকিয়ে তারা গুন টেনে এগিয়ে যায় নদীর পাড় ধরে।

একটা বাঁক ঘুরতেই ফজল উত্তর দিকে তাকায়। একটা ছোট স্টিমার আসছে উত্তর দিক থেকে। ওটার পেছনে চাক্কি। পানি কমে গেছে, তাই পেছনে চাক্কিওয়ালা জাহাজ চালু হয়েছে।

অনেক দূরে দেখা যায় একটা উঁচু তালগাছ। আশপাশের উঁচু গাছগুলোর মাথা তালগাছটার হাঁটু-বরাবর।

'এই বক্কর, এই টিটু, ঐ চাইয়া দ্যাখ ভোজেশ্বরের আসমাইন্যা তালগাছটা। এমুন উঁচা তালগাছ আর দেখি নাই কোনো মুল্লুকে। দুফরের আগে কিন্তু ঐখানে যাওন লাগব। আইজ সোমবার, ভোজেশ্বরের হাট।'

'হাটেরতন কিছু কিনবেন নি ?' জিজ্ঞেস করে বক্কর।

'হ, অনেক কিছু কিনতে অইব।'

পথে চান্দনী গ্রাম বরাবর নদীর ঢোনে নৌকা বাঁধে তারা। তিনজনকে নিয়ে ফজল নৌকা থেকে নামে। একটা কাটারি, একটা চাঙারি ও কিছু রশি নেয় সাথে।

গ্রামের সরু পথ ধরে তারা হাঁটে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ফজল বলে, 'তোরা চোত্‌রা গাছ চিনস ? গুড়িচোত্‌রা ? রামচোত্‌রা ?

তিনজনের কেউ চেনে না চোত্‌রা গাছ।

'চিনবি কইতন ? চরে এই গাছ অয়না। তোরা নামও শোনস নাই কোনো দিন ?'

'হ, হুনছি।' টিটু বলে। 'ঐ পাতা গায়ে লাগলে চুটমুট করে, জ্বালা করে, খাউজ্যায়।'

'হ, বইয়ের ভাষায় এগুলার নাম বিছুটি।'

BanglaBook.org

গ্রামের দুটো বেতঝোপ থেকে গুনে গুনে দুইশ আঁকড়ি যোগাড় করে ফজল। বেতঝোপের মালিককে আঁকড়ি পিছু এক পয়সা করে দিতে হয়। ওগুলোকে একখানে সাজিয়ে তারা রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধে।

খুঁজতে খুঁজতে রাস্তার পাশের এক জঙ্গলে রামচোত্‌রাও পাওয়া যায়। হাতে রুমাল বেঁধে ফজল অনেকগুলো গাছ উপড়ে তোলে শিকড়ের মাটিসহ। চাঙারির ভেতর ওগুলো খাড়া করে সাজিয়ে চাঙাড়িটা তুলে দেয় একজনের মাথায়।

নদীর ঢোনে ফিরে এসেই তারা নৌকা ছেড়ে দেয়। ভোজেশ্বর পৌঁছে তারা নদীর পাড়ের বাঁশহাটা থেকে সরু লম্বা ও শুকনো দেখে পঁচিশটা তল্লা বাঁশ কেনে। বাঁশগুলোকে নৌকার দুধারে পানিতরাশ বরাবর তারা রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়। তারপর টিটুকে নৌকায় রেখে ফজল বাকি চারজনকে নিয়ে হাটের বিভিন্ন পট্টিতে ঘোরে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য। তিন ব্যাটারীর চারটে টর্চলাইট; দশসের টাডি সুপারি; দশসের ঝাঁকিজালের কাঁঠি; তিনসের মাথা তামাক, কুড়ি প্যাকেট বিড়ি ও একসের সুতলি কিনে হাটের ভিড় ঠেলে তারা তাড়াতাড়ি নৌকায় ফিরে আসে। টিটুকে নৌকায় না দেখে ফজল হাঁক দেয়, 'টিটু গেলি কইরে ?'

টিটুর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

চান্দু থলে-ভরা জালের কাঁঠি নিয়ে নৌকায় ওঠে সকলের আগে।

'ও মাগো!'

থলে ফেলে লাফ দিয়ে নেমে যায় চান্দু।

ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে হাসতে দৈত্যের মুখোশ-পরা টিটু ছই-এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

সবাই এবার জোরে হেসে ওঠে—কেউ খলখলিয়ে কেউ ফ্যাকফেঁকিয়ে। ভয়ঙ্কর বিকট চেহারার দৈত্য ভেঙচি দিয়ে রয়েছে। দাঁতাল শুয়োরের দাঁতের মতো দুটো বড় দাঁত বেরিয়ে আছে। রক্ত লেগে আছে সে দাঁতে। নওল ষাড়ের শিংএরের মতো দুটো খাড়া শিং-এও রক্তের দাগ।

মুখোশটা দেখেই ফজলের মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি খেলে যায়। সে বলে, 'মোখাডা পালি কই, এই টিটু ?'

টিটু মুখ থেকে শক্ত কাগজে তৈরি মুখোশটা খুলে বলে, 'অ্যাক ব্যাডা বেচতে আনছিল। অ্যাক আনা দিয়া কিনছি।'

'ও ব্যাডা গেল কই ?'

'হাটের কোন দিগে গেছে কে জানে ?'

'অ্যাই, তোরা পাঁচজনে পাঁচ দিকে যা ব্যাডারে হাঁটের তন বিচরাইয়া আনন চাই। ওরে কইস, পঞ্চাশটা কিনমু।'

ফজল ভাবে, মুখোশটা খুবই কাজের জিনিস। হঠাৎ দেখলে ভয় পাওয়ার কথা। মুখোশ দেখে ভয় না পেলেও মুখোশের আড়ালের মানুষকে নিশ্চয়ই ভয় পাবে। চিনতে না পেরে মনে করবে ওস্তাদ লাঠিয়ালরাই মুখোশ পরেছে তাদের পরিচয় গোপন করার জন্য। মুখোশ না থাকলে বিপক্ষদল দেখবে পাকা লাঠিয়াল একজনও নেই। সব হাঙাল-বাঙাল আর চ্যাংড়ার দল। ওদের মনের জোর বেড়ে যাবে। তখন লড়াই জেতা মুশকিল হয়ে যেতে পারে।

কিছুক্ষণ পর মুখোশ-পরা ফেরিওয়ালাকে ওরা নিয়ে আসে। দর কষাকষি করে ফজল পাইকারী দরে ভয়াল চেহারার দৈত্য-দানবের পঞ্চাশটা মুখোশ কেনে আড়াই টাকায়।

BanglaBook.org

আর কোনো কাজ বাকি নেই পথে। তারা পাল তুলে নৌকা ছেড়ে দেয়। হাল ধরে বসে থাকে বক্কর।

দূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে ফজলের কানে। গানের কথা কিছুই বোঝা যায় না। তবুও সুরের স্পর্শে বিহ্বল হয় তার মন।

তাদের সামনে অনেক দূরে একটা দো-মাল্লাই নৌকা। নৌকাটা ভাটিয়ে তাদের দিকে আসছে। মনে হয়, ওটাতেই বাজছে কলের গান। দুটো নৌকার মাঝের দূরত্ব কমে আসতেই গানের কথা স্পষ্ট শোনা যায় ঃ

'ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে,
কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে,
দেখা যায় যে ঘরখানি
সেথায় বধূ থাকে গো,
সেথায় বধূ থাকে।'

গানের কথা ও সুর গুঞ্জরণ তোলে তার মনে। তার চোখ বুঁজে আসে। কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে তার মন উড়ে চলে যায় ভরা নদীর বাঁকে। মনের চোখ খুঁজে বেড়ায় তার প্রিয় মুখ।

নৌকাটা তাদের পাশ দিয়ে ভাটির টানে অনেক দূর চলে গেছে। গান আর শোনা যায় না এখন। কিন্তু ফজলের মনে গানটা তখনো বেজে চলেছে। তার মনের চোখ তখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে—কখনো রূপজানের, কখনো জরিনার মুখ।

'ও মিয়াভাই, বড় গাঙ্গে আইয়া পড়ছি।'

বক্করের ডাকে সংবিৎ ফিরে পায় ফজল। সে চোখ খোলে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সামনের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'আল্লার নাম লইয়া পাড়ি দে।'

সন্ধ্যার মৃতপ্রায় আলোর দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, খুব ভালো সময়েই পৌঁছেছে তারা। রাতের অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না, আর দেখলেও চিনতে পারবে না তাদের।

'আল্লা-রসুল বলে ভাইরে মোমিন। আল্লা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। বক্কর ও অন্যান্য বাইছারা জাক্কইর দেয়।

অনুকূল স্রোত। ভাটির টানে নৌকাটা যাতে পুবদিকে জঙ্গুরুল্লার এলাকায় চলে না যায় সেজন্য পালটাকে একই অবস্থায় রেখে তারা উত্তরমুখি পাড়ি ধরে।

পাল আর দাঁড়ের টানে উত্তর দিকে চলতে চলতে, ভাটির টানে পুবদিকে সরতে সরতে নৌকাটা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফজলদের বাড়ির ঘাটে পৌঁছে যায়।

॥ চব্বিশ ॥

পরের দিন ভোরে ফজল ঘুম থেকে উঠেই ঘাসিতে ঘুমিয়ে থাকা বক্কর ও চান্দুকে ডেকে তুলে পাঠিয়ে দেয় পুলকি মাতব্বরদের ডেকে আনতে। সে নিজে চাঙারিসহ রামচোত্‌রা গাছগুলো কলাগাছের ঝোপের মধ্যে ছায়ায় রেখে আসে। মাঝে মাঝে পানির ছিটে দিলে গাছগুলো তাজা থাকবে।

ফজল এবার হাট থেকে কিনে আনা তল্লা বাঁশগুলোর আইক্কা ছাড়ায় দা দিয়ে, গিঁঠগুলো চেঁচে পরিষ্কার করে। ফজলের বাঁশ চাঁচা শেষ না হতেই মেহের মুনশি, রমিজ মিরধা, জাবেদ লশকর ও কদম শিকারি চলে আসে।

BanglaBook.org

খবরিয়াদের কাছেই তারা শুনেছিল, চাকরিয়া একজনও আসেনি ২ তারা বিষণ্ন মুখে জানতে চায় চাকরিয়া না আসার কারণ।

'দলটা ভাইঙ্গা গেছে।' ফজল বলে। 'দলের সরদার আছে। সে-ও বুড়া। দলের লোকজন এদিগে ওদিগে নানান কাজে চইল্যা গেছে।'

'এহন কি করতে চাও ?' মেহের মুনশি জিজ্ঞেস করে। 'মেঘু আর আলেফ সরদারের লেইগ্যা খবরিয়া পাঠান দরকার।'

'কোনো দরকার নাই। আমরাই পারমু কাম ফতে করতে।'

চারজন পুলকি-মাতব্বর হাঁ করে চেয়ে থাকে ফজলের দিকে।

'আপনারা ঘাবড়াইয়েন না। ওগ খবর নিছেন ? ওরা আমাগ সাজাসাজির খবর পায় নাই তো ?'

'না।

'ওরা চাকইর‍্যা আনে নাই তো ?'

'না। ওরা জানেই না, তুমি জেলেরতন খালাস পাইয়া আইছ।' রমিজ মিরধা বলে। 'তোমার অবর্তমানে আমরা চরদখলের হামতাম করতে যাইমু না, ওরা জানে। তার লেইগ্যা, ওরা খুব নির্ভাবনায় আছে। চাকইর‍্যা অ্যাকটাও নাই ওগ দলে।'

'শোনেন। কাইলই হামলা করণ লাগব। আর বেশি দেরি করলে ওরা সব জাইন্যা ফালাইব। লিস্টি করছেন ?'

'হ।' মেহের মুনশি নিমার পকেট থেকে কাগজ বের করে ফজলের হাতে দেয়।

উত্তম, ভালো, মধ্যম, ল্যাগবেগা, চ্যাংড়া—এই পাঁচ শ্রেণীর ভাগ করা হয়েছে দলের একশ বত্রিশ জনকে।

'উত্তম' শ্রেণীতে আছে আঠারো জন। ফজলের সাথে ফাঁসি বেয়ে গিয়েছিল যে পাঁচজন তারাও আছে এ তালিকায়।

ফজল 'ভালো'দের তালিকা থেকে বেছে দু'জনকে তুলে নেয় 'উত্তম'দের তালিকায়। এই কুড়ি জনকে সে ডাকতে পাঠিয়ে দেয়।

ভালো তেইশ জন আর মধ্যম চৌত্রিশ জন যাবে মেহের মুনশির বাড়ি। সেখানে তারা শড়কি আর লাঠি চালাবার কসরত করবে মেহের মুনশি আর জাবেদ লস্করের পরিচালনায়। গুলেল বাঁশের চাঁদমারির জন্য যাবে কদম শিকারির বাড়ি।

পুলকি-মাতব্বরদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে ফজল বলে, 'কাইল ভোরে সবাই—একশ বত্রিশ জন যার যার হাতিয়ার লইয়া এইখানে হাজির অইব। দ্যাখবেন কেও যেন্ ভয়ে না পলায়। আমাগ লাল বড় দামড়াডা জবাই করমু। বেলা এগারোটার মইদ্যে এইখানে খাওয়া-দাওয়া সইর‍্যা তৈরি অইব। ঘড়ি লাগব দুইটা। একটা তো আছে বা'জানের পকেট ঘড়ি। আর একটা পাই কই ?'

'আমার পোলার আছে একটা টেবিল ঘড়ি।' রমিজ মিরধা বলে।

'ঠিক আছে। এইটা দিয়াই কাম চালান যাইব।'

'এই চিক্কন লম্বা বাঁশগুলান দিয়া কি করবা ?' মেহের মুনশি জিজ্ঞেস করে।

'এখন আর কইমু না। কাইলই দ্যাখতে পাইবেন।'

পুলকি মাতব্বররা চলে যাওয়ার পর ফজল নাশতা খেয়ে বাঁশের গিঁঠ চাঁচতে লেগে যায় আবার। তার হাতের কাজ শেষ হওয়ার আগেই উত্তম কুড়ি জন এসে হাজির হয়।

BanglaBook.org

ফজলের নির্দেশে নৌকার ডওরা থেকে রামদার বাক্স আর ঢাল নিয়ে আসে চান্দু, বক্কর আর টিটু। ফজল কয়েকটা পুরানো লগি যোগাড় করে। চান্দুর হাতে লগি আর ঢাল দিয়ে বলে, 'মনে কর এই লগিটা একটা শড়কি। আমি ইশারা দিলেই এইটা লইয়া তুই আমারে আক্রমণ করবি। আর সব্বাই তোরা মনোযোগ দিয়া দেখবি। তোগ সব্বাইর কিন্তু শিখতে অইব রামদার লড়াই।'

ফজল বাঁ হাতে ঢাল আর ডান হাতে রামদা নিয়ে চান্দুকে ইশারা করে আক্রমণের জন্য। চান্দু আক্রমণ করে। ফজল লগিটাকে ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে রামদয়ালের কায়দায় লাফ দিয়ে 'ইয়া আলী' বলে কোপ মারে লগির ওপর। লগিটা দু'টুকরো হয়ে যায়।

ফজল বলে, 'এইডা অইল রামদার লড়াই। শড়কির হাতল দুই টুকরো না অইলেও ক্ষতি নাই। বারো আনা কাটলেই বরং ভালো। কোপ খাওয়া শড়কির হাতল দিয়া তখন শড়কির কামও চলব না, লাঠির কামও চলব না।'

দুপুর পর্যন্ত কুড়ি জনকে তালিম দেয় ফজল। তারা ঢাল দিয়ে কল্পিত শড়কির কোপ ফিরিয়ে রামদা দিয়ে হাওয়ায় কোপ মেরে মেরে অভ্যাস করে।

দুপুরের খাওয়া খেয়ে কিছুক্ষণ জিরোবার পর আবার শুরু হয় মহড়া। চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ফজল পরীক্ষা নেয় সকলের। তার মূল্যায়ন অনুসারে ছয়জন প্রথম বিভাগে, দশ জন দ্বিতীয় বিভাগে, আর চারজন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তাদের প্রত্যেককে একটা করে রামদা বুঝিয়ে দেয় সে। সেই সাথে ঢালও দেয় একটা করে। রামদা বালিগচার ওপর কিভাবে ধার করে নিতে হবে, তাও সে বুঝিয়ে দেয়।

'কাইল বেলা ওঠার আগে তোমরা সবাই চইল্যা আসবা।' ফজল নির্দেশ দেয়। 'বড় দামড়াটা জবাই কইর‍্যা, কুইট্যা-কাইট্যা তাড়াতাড়ি রান্নার ব্যবস্থা করতে অইব।'

পরের দিন ভোর বেলা। রোদ ওঠার আগেই লোকজন নৌকা আর হাতিয়ার নিয়ে হাজির হয় মাতব্বর বাড়ি। ফজলের নির্দেশে তারা বিভিন্ন কাজে লেগে যায়।

বাড়ির পুব পাশে গরু জবাই করে দশ-বারো জন গোশ্‌ত কাটাকুটি করে। তিন জন পেঁয়াজ-রশুনের চোকলা ছাড়ায়। দু'জন পালা করে মসলা বাটে। কয়েকজন মাটিতে গর্ত করে চুলো বানায়।

কাছারি ঘরের সামনে একজন একজন করে বালিগচার ওপর বালি ছড়িয়ে যার যার রামদা ঘষছে ধার তোলার জন্য। একসাথে তিনজন একটা বড় পাথরের ওপর শড়কি, লেজা, কাতরা ঘষে চক্‌চকে ঝকমকে করে নিচ্ছে।

নূরু ও হাশমত লগির মাথায় কাস্তে বেঁধে কলার ডাউগ্‌গা কাটে। থালা বাসনের অভাবে আর ধোয়া-পাখলার ঝকমারি এড়াতে বড়-ছোট সবাইকে কলার পাতে খাবার পরিবেশন করতে হবে। পশ্চিম পাশে তিনজন হাতে গামছা জড়িয়ে লম্বা ও সরু তল্লা বাঁশের আগায় রামচোত্‌রা গাছ বাঁধছে সুতলি দিয়ে। ফজল দাঁড়িয়ে তদারক করছে।

'এগুলা বড়শি গিট্টু দিয়া শক্ত কইর‍্যা বাইন্দা ফ্যাল।' ফজল নির্দেশ দেয়। 'এগুলার উপরে আবার গইন্যা গইন্যা পাঁচটা কইর‍্যা আঁউকড়া বানতে অইব একেকটা বাঁশের লগে। আঁউকড়াগুলা কিন্তু একটু আলগা কইর‍্যা বানতে অইব। টান লাগলেই যেন খুইল্যা যায়।'

আঁকড়ির মসৃণ গোড়ার দিক বাঁশের আগায় রামচোত্‌রার ওপর আলগা করে বেঁধে দেয়া হয়।

BanglaBook.org

রমিজ মিরধা ও জাবেদ লশকর দাঁড়িয়ে দেখছিল। জাবেদ লশকর হাসতে হাসতে বলে, 'যত সব পোলাপাইন্যা কাণ্ড-কারখানা! তোমাগ এই চ্যাংড়ামি বুদ্ধিতে কি কাম অইব ?'

'আপনারা ঠাট্টা করেন আর যাই করেন, আপনাগ দাদার আমলের গোঁয়ারকিতে, সামনা-সামনি লড়াইয়ে বিপক্ষ দলেরে কাহিল করণ যাইব না। খুন-জখম অইয়া যাইতে পারে। দেখি, আমাগ চ্যাংড়ামি কায়দা-কৌশলে ওগ কাবু করতে পারি কিনা। বইতে পড়ছি—*মারি অরি পারি যে কৌশলে*। অরি মানে শত্রু। শত্রুরে যে কোনো কৌশলে নাস্তানাবুদ করা দরকার।'

একটু থেমে ফজল আবার বলে, 'পঁয়তাল্লিশটা গুলাইল বাঁশ আছে। আপনারা মাটির গুলি, টাডি সুপারি আর জালের কাঁঠি গুলারে পঁয়তাল্লিশটা ভাগ কইর‍্যা ফেলেন। একেক ভাগ বুঝাইয়া দিতে অইব একেক জন গুলাইলওলার হাতে।'

সকলের খাওয়া শেষ হয়েছে। ফজল জামার পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখে, সোয়া এগারোটা বাজে। সে সবাইকে বলে, 'তোমরা পান-বিড়ি-তামুক খাইয়া জিরাইয়া লও কতক্ষণ।'

সাড়ে বারোটার সময় ফজলের ডাকে নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে লাইন করে দাঁড়ায় সবাই। ফজল তালিকা অনুযায়ী পাঁচ দলে ভাগ করে সবাইকে।

ল্যাগবেগা উনিশজন আর চ্যাংড়া কিশোর ছত্রিশ জনের সবারই ঢাল আছে। ল্যাগবেগা সবার হাতে লেজা বা শড়কি আর চ্যাংড়াদের হাতে কোচের কুতু।

ফজলের নির্দেশে রমিজ মিরধা ও কদম শিকারি ওদের ভেতর থেকে কুড়িজনকে বাছাই করে কুড়িটা গুলেল বাঁশ ওদের হাতে দিয়ে দেয়। একেক জনের জন্য ভাগ করে রাখা গুলি ঢেলে দেয় প্রত্যেকের কোঁচড়ে।

এগারো-হাতি ডিঙি বারোখানা আর তেরো-হাতি ডিঙি দু'খানায় ওদের পঞ্চান্ন জনকে ভালো-মন্দয় মিলিয়ে চারজন পাঁচজন করে তুলে দেয়া হয়। ওদের পরিচালনার জন্য ঢাল-শড়কি নিয়ে কদম শিকারি, আহাদালী ও ধলাই সর্দার ওঠে ভিন্ন ভিন্ন নৌকায়।

কদম শিকারির হাতে পকেট ঘড়িটা দিয়ে ফজল নৌকার লোকদের উদ্দেশ্যে বলে, 'তোমরা মনোযোগ দিয়া শোন। পুবদিক তন তোমরা উজাইয়া যাইবা চরের দিকে। দূরে থাকতেই ঠিক দুইটার সময় মাইর ডাক দিবা। ওরা তখন চরের পুব কিনারে গিয়া গুলাইল মারব। তোমরাও গুলাইল মারবা। একবার উজাইয়া কিছু দূর আউগ্‌গাইবা, ঢাল দিয়া ওগ গুলি ফিরাইবা। আবার ভাইট্‌টাইয়া পাউছ্‌ছাইবা। এম্বায় আউগ্‌গাইবা আর পাউছ্‌ছাইবা—এই তোমাগ কাম। তোমরা বেশি গুলি খরচ করবা না। কিন্তু ওগ গুলি খরচ করাইবা। আমরা ঠিক তিনটার সময় পশ্চিম দিক দিয়া চরে নাইম্যা পড়মু। আমাগ মাইর ডাক হামাহামি শুইন্যা ওরা পশ্চিম দিগে ঘুরতেই ওগ পিঠে আর পাছার উপরে ফটাফট গুলি মারবা। ওরা যখন আমাগ মুখামুখি আউগ্‌গাইতে থাকব তখন তোমরা নাও লইয়া চরের উত্তর দিকে গিয়া নাইম্যা পড়বা। কিছু দূর আউগ্‌গাইয়া দূরেরতন ওগ সই কইর‍্যা গুলাইল মারবা। যা কইলাম মনে থাকে যেন। আর শোন, তোমাগ সব্বাইরে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—বা'জান কি কইত, মনে আছে তো ? এইডা কিন্তু রাজা-বাদশাগ লড়াই না যে যারে পাইলাম তারে খতম করলাম। এই লড়াই অইল বিপক্ষেরে খেদানের লেইগ্যা। নিজেরে বাঁচাইয়া চলবা। সুযোগ পাইলে আতে পায়ে বাড়ি দিবা, খোঁচা দিবা। প্যাট, বুক, আর মাথায় কিন্তু মারবা না, খবরদার! ব্যস এই কথা! যাও, বিছমিল্লা বুইল্যা, আল্লা-রাসুলের নাম লইয়া নাও ছাড়।'

BanglaBook.org

চোদ্দখানা ডিঙি পাড়া উঠিয়ে রওনা হয়ে যায়।

উত্তম, ভালো ও মধ্যমদের নিয়ে ফজল ঘাসি, ঢুশা ও বাকি ডিঙিগুলোতে ওঠে। অনেক ঘুরে তারা নাগরার চর আর আটং-এর দক্ষিণ দিক দিয়ে বেশ কিছু দূর উজিয়ে খুনের চরের দিকে নৌকার মাথি ঘোরায়। ঘাসির হালমাচার সাথে বাঁধা টেবিল ঘড়িটা বারবার দেখছে ফজল।

ঠিক দুটোর সময় মাইর ডাক শোনা যায়—

'ওয়া-হ্বা-হ্বা-হ্বা-হ্বা।'

বিপক্ষের শোরগোলও শোনা যায়—

'আউগ্‌গারে, আউগ্‌গা। আইয়া পড়ছে। আউগ্‌গা, আউগ্‌গা।'

কিছুক্ষণ পর বিপক্ষ দলের মাইর ডাক শোনা যায়।

'ওয়া-হ্বা-হ্বা-হ্বা-হ্বা—'

কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় ফজল দলবল ও হাতিয়ার-সরঞ্জাম নিয়ে চরের পশ্চিম কিনারায় নামে। নামার আগে বাঁশের আগায় বাঁধা বিছুটি পাতা পানিতে ভিজিয়ে নেয়। কোনো শব্দ না করে ধানখেতের ভেতর দিয়ে পা চালিয়ে তারা পুবদিকে এগিয়ে যায় অনেক দূর।

প্রচণ্ড রোদ। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। বিপক্ষের লোকজন সবাই পুব কিনারায়। তারা গুলেল বাঁশ থেকে হরদম গুলি ছুঁড়ছে পুব দিকে। পশ্চিম দিকে ওদের একটা লোকও নেই।

ফজল দশ-বারো জনকে অর্ধেক করে কাটা কতকগুলো আঁকড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দেয় গরুর বাথানে। তারা গরুর লেজের আগায় পশমের সাথে দু'তিনটে করে আঁকড়ি আটকে দিয়ে গরুগুলোকে ছেড়ে দেয়। তাড়া খেয়ে সেগুলো পুবদিকে দৌড়াতে থাকে। পেছনের দু'পায়ে আঁকড়ির খোঁচা আর ফজলদের দাবড় খেয়ে সন্ত্রস্ত গরুগুলো লেজ উঁচিয়ে 'ওম্‌বা—ওম্‌বা' রব তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

ফজলের লোকজন তিন-চার হাত পরপর পাশাপাশি দাঁড়ায় এক সারিতে। তারা সবাই মাটির দিকে মুখ করে মুখের ওপর ডান হাত নেড়ে ডাক দেয়—'ওয়া-হ্বা-হ্বা-হ্বা-হ্বা-হ্বা—।'

ফজলের নির্দেশে এবার সবাই মুখোশ পরে নেয়।

এরফান মাতব্বর মারা গেছে, আর জঙ্গুরুল্লার দল জানে ফজল জেলে আছে। তাই তারা বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিন গুনছিল। আচম্বিতে এরকম হামলা করবে, তারা কল্পনাও করতে পারে নি। আজ তারা সংখ্যায় মাত্র উনসত্তর জন। পশ্চিম দিকের মাইর ডাক শুনে তাদের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। শিউরে ওঠে শরীর, কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়ের রোম।

তারা পশ্চিম দিকে ঘোরে। চোখ-ধাঁধানো রোদ। কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করে তারা দেখে তাদের গরুগুলো লেজ উঁচিয়ে ছুটে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। 'উহ, উহ!' করে ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে কয়েক জন। তাদের অনেকের পিঠে, পাছায়, পায়ে এসে লাগছে গুলেল বাঁশের গুলি। ধাবমান মত্ত গরুগুলোর পদদলন থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে তারা দৌড়ে গুলির পাল্লা পেরিয়ে এক জায়গায় থামে। দাঁড়িয়ে দম নেয় কিছুক্ষণ। তারপর ঢাল, কাতলা, লাঠি, শড়কি নিয়ে মাইর ডাক দিয়ে তারা এগিয়ে যায় পশ্চিম দিকে।

সূর্যের কড়া আলো পড়ছে তাদের চোখে, কপালে। ভালো করে তারা দেখতে পায়না হামলাকারীদের। তবুও তারা ধানখেতের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি এক সারিতে এগিয়ে যায়।

'বাঁশগুলা আউগ্‌গাইয়া রাখ্।' ফজল হুকুম দেয়। জঙ্গুরুল্লার দল আরো এগিয়ে আসে। নাগালের মধ্যে এসে পড়ার সাথে সাথে ফজল হুকুম দেয়, 'মা-র আঁউক্‌ড়া।'

BanglaBook.org

বিপক্ষীয় লোকদের দু'পায়ের ফাঁকে রামচোত্‌রা আর আঁকড়ি বাঁধা বাঁশের আগা ঢুকিয়ে টান মারে ফজলের দল। আলগা করে বাঁধা আঁকড়ি ওদের কয়েকজনের কাছামারা লুঙ্গির সাথে আটকে যায়, কারো কাছা খুলেও যায়। ফজলের দল বিছুটিপাতা সমেত বাঁশের আগা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের রানে, হাতে, শরীরে ঝাপটা মারে। দু-একটা বাঁশের আগায় আঁকড়ি শক্ত করে বাঁধা ছিল বলেই বোধ হয় আঁকড়ির টানে দু'জনের লুঙ্গি কোমর থেকে খসে যায়। তারা শড়কি-ধরা হাত দিয়ে লুঙ্গি সামলায়, দিশে না পেয়ে পিছু হটে। শেষে হাতিয়ার ফেলে আঁকড়ি জড়ানো লুঙ্গি ধরে দৌড় দেয়।

যাদের লুঙ্গিতে আঁকড়ি আটকে গেছে তারা এগুবার চেষ্টা করে। কিন্তু আঁকড়ির আঁচড়ে ছড়ে যাচ্ছে দু'দিকের রান। ভীষণ জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে বিছুটিপাতার ঘষায়। এ সব অসুবিধে সত্ত্বেও কয়েকজন ঢাল-শড়কি নিয়ে এগিয়ে যায়। ফজলের রামদাওয়ালারা তাদের মুখোমুখি হয়। ওরা শড়কির কোপ মারতেই ফজলের দল ঢাল দিয়ে সে কোপ ফিরিয়ে রামদা দিয়ে কোপ মারে শড়কির হাতলে। দু'একটা হাতল দু'টুকরো হয়ে যায়। বেশির ভাগ হাতল বারো আনা চৌদ্দ আনা কেটে গেছে। ওসব শড়কি দিয়ে আবার কোপ মারতেই ঢালের সাথে লেগে ফলাসহ হাতলের নিচের অংশ ভেঙে ওপরের অংশের সাথে দুলতে থাকে লল্লড় করে। ফজলের দল এবার সারিবদ্ধভাবে কেউ রামদা উঁচিয়ে, কেউ শড়কি বাগিয়ে ধরে, কেউ গুলেল মারতে মারতে 'মা-র—মা-র' করে এগিয়ে যায়। বিপক্ষ দলের সবাই এবার পিছু হটে দৌড় দেয়। কারো কারো কাছামারা লুঙ্গিতে জড়ান আঁকড়ি লেজের মতো দুলছে, যেন লেজ নিচু করে তারা পালাচ্ছে। ফজলের পূবদিকের দল উত্তর দিক দিয়ে এসে গেছে। তারা জঙ্গুরুল্লার পলায়মান লোকদের লক্ষ্য করে গুলি মারে গুলেল বাঁশ থেকে।

জঙ্গুরুল্লার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে কেউ ঢাল ফেলে, কেউ শড়কি ফেলে, কেউ-বা সব হাতিয়ার ফেলে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে। ছুটতে ছুটতে কেউ লুঙ্গি থেকে আঁকড়ি ছাড়াবার চেষ্টা করছে, কেউ আঁকড়ির সামনের মাথা এক হাত দিয়ে, পেছনের মাথা আর এক হাত দিয়ে ধরে পাল্লাচ্ছে। ফজলের দল 'মা-র—মা-র' ছুটছে তাদের পিছু পিছু। জঙ্গুরুল্লার অধিকাংশ লোক দৌড়ে যাচ্ছে ঘোঁজার দিকে। তাদের নৌকাগুলো সেখানেই বাঁধা আছে। ফজলের দল ওদের পালাবার সুযোগ দেয়ার জন্য নিজেদের গতি কমিয়ে দেয়।

জঙ্গুরুল্লার লোক হুড়মুড় করে নৌকায় ওঠে—যে যেটা সামনে পায়। কয়েকজনের হুড়োহুড়ি-ঠেলাঠেলির চোটে একটা ডিঙি ডুবেই যায়। সেটা ছেড়ে পানি ভেঙে তারা উঠে পড়ে আরেকটায়। একেকটায় চার-পাঁচজন করে উঠে আর কারো জন্য দেরি না করে নৌকা ছেড়ে দেয়। লগির খোঁচ মেরে, বৈটা টেনে তারা চলে যায় নিরাপদ দূরত্বে। যারা ঘোঁজার দিকে যেতে পারেনি তারা পুবদিকে নদীর ধারে দৌড়ে চলে যায়। সেখানে তাদের গরুগুলো ছটফট করছে, কোনোটা লাফালাফি করছে। তারা পশ্চিমদিকে চেয়ে দেখে হামলাকারীরা অনেক পেছনে। কেউ কেউ নিজেদের লুঙ্গিতে আটকানো আঁকড়ি খোলে। কেউ গরুর লেজে জড়ানো আঁকড়ি ছাড়িয়ে নেয়।

'মা-র—মা-র' করে এগিয়ে আসছে ফজলের দল। জঙ্গুরুল্লার পলায়মান কিছু লোক গরুগুলোকে তাড়া দিয়ে নদীতে নামায়। গরুগুলো সাঁতার দিলে ওগুলোর লেজ ধরে একেক জন ভাটির টানে ভেসে যায় চরমান্দ্রার দিকে।

ফজলের একটা দল ঘোঁজার কিনারায় এসে বিপক্ষ দলের নৌকা লক্ষ্য করে গুলের বাঁশ থেকে কয়েকটা গুলি মারে। আর একদল পুব কিনারায় গিয়ে দুয়েকটা গুলি মারে গরুর লেজ-ধরা লোকগুলোর দিকে।

BanglaBook.org

গুলি মারার উদ্দেশ্য ভয় দেখানো। তারা বোঝে, পরাজিত পলায়মান শত্রুর পেছনে বেশি গুলি খরচ করা নিরর্থক।

ফজলের দলের সবাই ঘোঁজার কাছে এসে জমায়েত হয়। ফজল হাঁক দেয়, *'আল্লাহু আকবর।'*

দলের সবাই গলা ফাটিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার দেয়, *'আল্লাহু আকবর।'*

ফজল দলের চল্লিশ জনকে পাহারার জন্য চরের চার কিনারায় পাঠিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ শোনা যায়, 'ঐ গেল—গেল—গেল, ধর্—ধর্—ধর্।'

সবাই তাকিয়ে দেখে দক্ষিণ দিকে যারা পাহারা দিতে যাচ্ছিল তারা ধাওয়া করছে দুটো লোকের পেছনে। প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে লোক দুটো পুবদিকে।

জাবেদ লশকর প্রকৃতির তাগিদ সেরে ঐ দিক থেকেই আসছিল। সে দেখে, দু'জনের একজন আরশেদ মোল্লা। সে মোল্লাকে তাড়া করে দৌড়ে যায় তার পিছু পিছু। নদীতে নেমে কিছুটা পানি ভেঙে মোল্লা সাঁতার দেয়। লশকরও সাঁতার দিয়ে গলা.পানিতে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। সে মোল্লাকে চুব দিয়ে আবার টেনে তোলে।

আরশেদ মোল্লা কাঁপছে থরথর করে। অন্য লোকটা সাঁতার কেটে ভাটি পানিতে ভেসে যাচ্ছে চরমান্দ্রার দিকে।

'হালা, আমাগ বউ আটকাইছস। তোরে চুবাইয়া মাইর‍্যা ফালাইমু।' জাবেদ লশকর আবার চুব দেয় আরশেদ মোল্লাকে। তাকে টেনে তুলে সে আবার বলে, 'ফজলরে পুলিস দিয়ে ধরাইয়া দিছিলি, হা-লা। এহন দ্যাখ কেমুন মজা।'

'ও চাচা।' ফজলের গলা। সে তাকায় ফজলের দিকে। ফজল দূর থেকে হাত নেড়ে মানা করছে আর চুব দিতে, ছেড়ে দিতে বলছে হাতের ইশারায়।

ফজল ধরতে গেলে তার ছেলের বয়সী। সে তাকে চাচা বলে ডাকে। তবুও ফজল মাতব্বর। সে তার আদেশ অমান্য করতে সাহস করে না। সে বিরক্তির সাথে মনে মনে বলে, 'যেই না হালার বউর বাপ! তার লেইগ্যা দরদ একেরে বাইয়া পড়ে। এমুন হউররে একশ একটা চুব দেওন দরকার।'

আরশেদ মোল্লাকে টেনে তুলে সে বলে, 'অ্যাই হালার ভাই হালা। দিমুনি আরেকটা চুব?'

অনেকক্ষণ চুব দিয়ে ঠেসে ধরায় দম ফাঁপড় হয়ে আসছে আরশেদ মোল্লার। হাঁসফাঁস করতে করতে সে বলে, 'আপনের আতে ধরি। আর চুব দিয়েন না?'

'তোর মাইয়াখান কানে আঁইট্যা দিয়া যাইতে পারবি? ক, শিগগির। নাইলে আবার চুব দিলাম।'

আরশেদ মোল্লা কাঁদো-কাঁদো স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'হ, দিয়া যাইমু।'

'ওয়াদা করলি তো?'

'হ, ওয়াদা করলাম।'

'দ্যাখ ওয়াদা যদি খেলাপ করসরে, তয় তোর পেডের ঝুলি বাইর কইর‍্যা দিমু যেইখানে পাই।'

'ওয়াদা ঠিক থাকব বিয়াইসাব।'

'ওরে আমার বিয়াইরে! হালা কমজাত কমিন। তোরে বিয়াই কইতেও ঘিন্না লাগে।'

'আপনের দুইডা আতে ধরি। আমারে ছাইড়্যা দ্যান।'

'ছাইড়্যা দিলে হাঁতরাইয়া যাইতে পারবি?'

BanglaBook.org

ফজলের লোকজন নদীর কিনারায় এসে জড় হয়।

কদম শিকারি বলে, 'হালারে লইয়া আহো। গর্দানডার উপরে দুইডা চটকানা দিয়া জিগাই, হালায় এমুন আকামের কাম ক্যান্ করছিল ? ক্যান্ মাইয়া আটকাইছিল ? ক্যান্ পা-না ধোয়ার লাগে দোস্তালি পাতাইছিল ? ক্যান্ ফজলরে পুলিস দিয়া ধরাইয়া দিছিল ?'

জাবেদ লশকর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় আরশেদ মোল্লাকে।

'হালার লুঙ্গিতে বুঝিন আঁউকড়া লাগে নাই।' বলে কদম শিকারি। 'মনে অয় চোত্‌রার ঘষাও লাগে নাই। এই বক্কর, দ্যাখতো চোত্‌রা পাতা আছেনি। হালার লুঙ্গি উড়াইয়া পাছায় আর কুচকিতে ঘইষ্যা দেই।'

একজন বলে, 'মনে অয় এই দুই ব্যাডা আঁউকড়া লাগনে দৌড় দিয়া পলাইতে পারে নাই। ধানখেতের মইদ্যে হুতি দিয়া পলাইয়া আঁউকড়া ছাড়াইতে আছিল।'

'হ, ওরা যেইখানে পলাইছিল, হেইখানে ধানখেতের মইদ্যে তিন-চাইড্‌ডা আঁউকড়া দেখছি আমি।' আর একজন বলে।

আরশেদ মোল্লার রান পরীক্ষা করে দেখে কদম শিকারি ও জাবেদ লশকর। সত্যি রানটা আঁকড়ির আঁচড়ে সাংঘাতিকভাবে ছড়ে গেছে।

ফজল ছেড়ে দিতে বলেছে। সুতরাং আরশেদ মোল্লাকে আর আটকে রাখা ঠিক নয়। ওদের দলের যে নৌকাটা ডুবে গিয়েছিল সেটাকে পানি থেকে তুলে তাতে উঠিয়ে দেয়া হয় আরশেদ মোল্লাকে। নৌকার মাথি ধরে ধাক্কা দিতে দিতে জাবেদ লশকর বলে, 'মাইয়া দিয়া যাবি, ওয়াদা করছস। ওয়াদা যেন ঠিক থাকে। নাইলে কিন্তু চউখ দুইডা ঘুইট্যা দিমু যেইহানে পাই।'

॥ পঁচিশ ॥

কদম শিকারি পকেট ঘড়িটা বুঝিয়ে দেয় ফজলের হাতে। সে দেখে পৌনে পাঁচটা বাজে। বেলা ডুবতে দেরি আছে এখনো।

পাহারারত চল্লিশজন ছাড়া আর সবাই জড় হয় ফজলের চারপাশে। তারা মাটিতে গামছা বিছিয়ে বসে। সবার মনে খুশির প্লাবন। হাসিতে ঝলমল করছে সবার চোখ-মুখ।

'কই চাচা লস্করের পো ? আমাগ পোলাপাইন্যা কাণ্ড-কারখানা কেমুন দ্যাখলেন ?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে ফজল।

'হ মিয়া, একখান খেইল দেহাইছ।' জাবেদ লশকর বলে।

'আমাগ শরীলে একটা আঁচড়ও লাগে নাই। বিপক্ষের কোনো মানুষও খুন-জখম অয় নাই।'

'রক্তারক্তি ছাড়া এমুন মারামারি আমার জীবনে কোনোদিন দেহি নাই।' রজিম মিরধা বলে।

'শোনেন, আঁউকড়াগুলা বেবাক টোকাইয়া রাখেন। চোত্‌রাগাছ গুলারে লাগাইয়া দ্যান এক জায়গায়। ভবিষ্যতে এগুলা কামে লাগব।'

'আমাগ নায়ের মইদ্যে ওগ বিস্তর গুলি পইড়্যা রইছে।' কদম শিকারি বলে।

'হ, ওগুলা টোকাইয়া একখানে করেন। আরো কিছু গুলি যোগাড় করতে অইব। ওরা কিন্তু দখলে আসার চেষ্টা করব। চাকইর‍্যা লইয়া হামলা করব। ওগ নাও দ্যাখলেই আমাগ নৌকার দল গুলাইল লইয়া ওগ এক পাশে গিয়া গুলি মারতে শুরু করব। আমরাও চরেরতন

BanglaBook.org

গুলি ছাড়মু। দুই দিগের গুলি ওরা ঢাল দিয়া ফিরাইতে পারব না। চাকইর‍্যারা কিন্তু বেশির ভাগ বইস্যা বইস্যা আউগ্‌গায়, হাতিয়ার চালায়। ওগ কাবু করণের লেইগ্যা আঁউকড়ার ঝাপটা মারতে অইব ওগ মাথায় আর পিঠে।'

'আমাগ কিছু চাকইর‍্যা আইন্যা রাখন দরকার।' রমিজ মিরধা বলে। 'ট্যাহাতো আছেই।'

'না। আর চাকইর‍্যা আননের দরকার নাই।' ফজল বলে 'খামাখা টাকা খরচ করতে যাইমু কোন দুকখে? আমরা নিজেরাই ওগ হটাইয়া দিতে পারমু। কি কও জুয়ানরা পারবা না?'

'হ, পারমু।' সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কিশোর ও জোয়ানরা। জয়ের জোশে তারা উদ্দীপ্ত।

'আপনারা আগে চাকইর‍্যার পিছে বেশুমার টাকা ঢালছেন। আর আমরা? আমরা অল্প খরচে কাম ফতে করছি।'

'কত ট্যাহা খরচ অইছে?' জাবেদ লশকর জিজ্ঞেস করে।

'খুব অল্প। রামদাও, ঢাল, টর্চলাইট আর এইডা ওইডা কিনতেই যা খরচ অইছে। কাইলই জগু পোদ্দারের দোকানে যাইবেন। গয়নাগুলা বেবাক ছাড়াইয়া লইয়া আইবেন।'

'হ, এইডা একটা কামের কাম অইব।' মেহের মুনশি বলে।

'হ, সুদ বড় জোর এক মাসের নিতে পারে।' রমিজ মিরধা বলে।

'এক মাসের সুদ আর আসল দিয়া গয়নাগুলা ফর্দের লগে মিলাইয়া ওজন কইর‍্যা লইয়্যা আইবেন।' ফজল বলে।

'হ, কাইলই গিয়া লইয়া আইমু।' মেহের মুনশি বলে। 'বউ-ঝিগ দায়-দাবির তলে আর থাকন লাগব না।'

'কিন্তু মিয়া, এই চরে থাকতে গেলে খরচ লাগব না? ট্যাহা পাইবা কই?' রমিজ মিরধা বলে।

'টাকার লেইগ্যা ভাবনা নাই। ফজল বলে। আমাগ বানাগুলাতো আছেই। সবাইরে লাগাইয়া দ্যান মাছ ধরতে। বেড়ের মাছ বেইচ্যা খরচ চালাইতে অইব। আমাগ চাঁই, দোয়াইর, খাদইন, পারন, ঝাঁকিজাল, ধর্মজাল, ইলশাজাল, মইজাল—মাছ ধরনের যত সরঞ্জাম ঐবার থুইয়া গেছিলাম, ওগুলা ওরা এই চরেই থুইয়া গেছে। বেবাক বিচরাইয়া বাইর করেন। এগুলা দিয়া মাছ ধরনের ব্যবস্থা করেন?'

'তুমি কি আমাগ বেবাকটিরে জাউল্যা বানাইয়া দিতে চাওনি?' শ্লেষ-মেশানো কণ্ঠে জাবেদ লশকর বলে।

'কি যে কথা কন! পা-না-ধোয়ার কোলশরিকরা মাছ বেচে নাই? ওরাও তো বেড়ের মাছ বেইচ্যা সংসার চালাইছে। জঙ্গুরুল্লাও তো ঐ টাকার ভাগ নিছে। জাইত যাওনের ভয় খালি আপনাগ!'

ফজলের সমর্থনে প্রায় সবাই গুঞ্জন করে ওঠে।

ফজল আবার বলে, 'আর শোনেন, ওরা কি কি জিনিস থুইয়া গেছে তার লিস্টি করেন। ঐগুলার মধ্যে আমাগ জিনিস, আমাগ হাতিয়ারও পাওয়া যাইব—যেগুলা আমরা ঐবার ফালাইয়া গেছিলাম। ঐগুলা আর ওগ তামাম হাতিয়ার আমরা রাইখ্যা দিমু। থালা-বাসন, লোটা-বদনা যা কিছু থুইয়া গেছে, সেগুলা কিন্তু রাখন যাইব না।'

'ক্যান্? ওরাতো আমাগ জিনিস ফিরত দেয় নাই।' কোলশরিকদের কয়েকজন প্রতিবাদ করে।

BanglaBook.org

'ঐগুলার মালিকতো আপনাগ মতন গরিব কোলশরিকরা। ঐগুলা যদি জঙ্গুরুল্লার অইত, তয় ফিরত দেওনের কথা কইতাম না। আমরা খুদ খাইয়া পেট নষ্ট করতে যাইমু ক্যান্? ঐগুলা একখানে কইর‍্যা রাইতের আন্ধারে ওগ চরে ফালাইয়া দিয়া আইবেন। আপনারা কয়েকজন চইল্যা যান। আন্ধার হওয়ার আগে সবগুলা ভাওর ঘর তালাশ কইর‍্যা দেখেন, কোন ঘরে কি আছে। পোলাপানরা তালাশ করুক ধানখেতে। ওগ হাতিয়ার, আমাগ আঁউকড়া—বেবাক বিচরাইয়া লইয়া আসুক। মারামারির সময় ধানের গাছ কিছু নষ্ট অইছে। আর যেন নষ্ট না হয়।'

মাগরেবের নামাজের পর আবার সবাই জড় হয় ফজলের ভাওর ঘরের সামনে। তারা বিপক্ষ দলের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র নিয়ে আসে।

হারিকেনের আলোয় ফজল ও আরো কয়েকজন মিলে ফেরতযোগ্য জিনিসগুলো বেছে বেছে আলাদা করে। চাল-ডাল ইত্যাদি খাবার জিনিস ফেরত দেয়ার প্রয়োজন বোধ করে না তারা। কারণ তারাও পুলিসের ভয়ে পালাবার সময় অনেক খাবার জিনিস ফেলে গিয়েছিল এ চরে। চাল-ডাল-মশলাদি—যা ওরা রেখে গেছে তাতে বেশ কয়েকদিন চলে যাবে সকলের।

চর দখলের আনন্দে সবাই মেতে ছিল এতক্ষণ। খাবার কথা কারো মনেই হয়নি। চাল-ডাল দেখে হঠাৎ খিদের তাড়না অনুভব করে সবাই। এক সাথে এত লোকের রান্না করার মতো বড় ডেগ নেই এখানে। ফজল দশটা চুলোয় দশ পাতিল খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা করে দিয়ে আবার এসে আলোচনায় বসে।

জাবেদ লশকর বলে, 'জঙ্গুরুল্লার মতন খুঁটগাড়ি আদায় করুণ লাগব।'

'হ, ঘোঁজায় নানা মুল্লুকের নাও আইস্যা পাড়া গাড়ে।' বলেই সরদার বলে। 'খুঁটগাড়ি আদায় করতে পারলে অনেক ট্যাহা আমদানি অইব।'

'উঁহু। আমরা খুঁটগাড়ি আদায় করমু না।' ফজল বলে।

'ক্যান্। এত বড় একখান আয়ের সুযোগ—'

'ঘোঁজায় নৌকা রাখে আশ্রয়ের লেইগ্যা। আশ্রয়ের বদলে কিছু আদায় করা ঠিক অইব না। আমরা যদি খুঁটগাড়ি আদায় করতে শুরু করি, তয় নৌকা আর একটাও এই ঘোঁজায় আসব না। মাঝিরা অন্য চরের কোনা-কাঞ্চিতে গিয়া নাও রাখব। আপনাগ কাছেই তো শুনছি রউজ্যার কাণ্ড। যদি ওর মতন ডাকাতি করতে পারেন, তবে ডাকাতির ভয়ে কিছু নৌকা আসতে পারে এই ঘোঁজায়।'

হঠাৎ একটা শোরগোল শোনা যায়।

সবাই সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। তারা দেখতে পায়, চরমান্দ্রার অনেক পুবে, কোনো একটা চরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের লেলিহান জিভ লকলক করে উঠছে আকাশে।

'তোমরা বোঝতে পারছনি, ব্যাপারখান কি?' জাবেদ লশকর বলে। 'কী মনে অয় তোমাগ?'

'এইডা জঙ্গুরুল্লার কারসাজি।' রমিজ মিরধা বলে। 'নিজেগ ঘরে আগুন লাগাইয়া আমাগ বিরুদ্ধে থানায় ইজাহার দিব।'

'তুমি ঠিকই ধরছ।' জাবেদ লশকর বলে। 'জঙ্গুরুল্লা ঐবার নাহক ডাকাতি মামলায় আমাগ আসামি দিয়া চর দখল করছিল। এইবার আবার ঘর পোড়ানের মামলা দিয়া পুলিস সুলাইয়া দিব আমাগ ধরতে।'

BanglaBook.org

জাবেদ লশকর নিচু গলায় বলে, 'একটা কাম করলে অয়। কিন্তু বেবাকের সামনে কওন যাইব না।'

'চলেন ঘরে গিয়া বসি।'

'ও মিয়ারা তোমরা গিয়া পাত পাইত্যা বস। মনে অয় খিচুড়ি এতক্ষণে রান্দা অইয়া গেছে।'

'হ, তোমরা যাও। আমরা আইতে আছি।'

ফজল একটা হারিকেন হাতে করে পুলকি মাতব্বরদের নিয়ে তাদের ভাওর ঘরে গিয়ে বসে।

'বলেন, কি বলতে চাইছিলেন?' ফজর উৎসুক হয়ে তাকায় জাবেদ লশকরের দিকে।

সে চাপা গলায় বলে, 'আমরাও একটা ঘরে আগুন লাগাইয়া ওগ নামে ইজাহার দিমু।'

'উঁহু, এইডা ঠিক অইব না।'

'কী যে কও তুমি! জানো না, বিষ দিয়া বিষ মারতে অয়? কাডা দিয়া কাডা খুলতে অয়?'

'তা তো জানি। কিন্তু ডাহা মিথ্যারে সত্য বইল্যা প্রমাণ করতে পারবেন?'

'ক্যান্ পারমু না? ওগ পিঠে আমাগ গুলির দাগ আছে না?'

'হ, কিছু লোকের শরীরে গুলিতো লাগছিলই।'

'হোন, আমরা এই বুইল্যা ইজাহার দিমু—অমুক, অমুক, অমুক, আরো দশ বারোজন আমাগ ঘরে আগুন লাগায়। আমরা টের পাইয়া যখন গুলাইল মারতে শুরু করি তখন ওরা দুইডা শড়কি ফালাইয়া ভাইগ্যা যায়। আমাগ গুলির দাগ আছে ওগ শরীলে।'

'ওরা দিব ঘর পোড়ার ইজাহার, আমরাও যদি ঘর পোড়ার পাল্টা ইজাহার দেই তা দারোগা বিশ্বেস করব না।' রমিজ মিরধা বলে। 'তার চাইয়া ডাকাতির মামলা সাজাও। জঙ্গুরুল্লার দুই পোলা ও আরো দশ বারোজন রামদাও শড়কি লইয়া ডাকাতি করতে আইছিল। আমাগ গুলাইলের গুলি খাইয়া একটা রামদাও আর দুইডা শড়কি ফালাইয়া ওরা ভাইগ্যা যায়। ওগ শরীলে আমাগ গুলির দাগ আছে।'

'ইজাহার দেওয়া সোজা।' ফজল বলে। 'সাক্ষী-সাবুদ দিয়া প্রমাণ করা বড় কঠিন। জোরে কচ্লান দিলে কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা বাইর অইয়া পড়ে। মাইনষে কইতেই কয়—সাচ্চা গুড় আন্ধার রাইতেও মিডা।'

'তা অইলে কী করতে চাও? আমাগই খালি পুলিস দিয়া অয়রান করব আর আমরা চুপ কইর‍্যা সইজ্য করমু।'

'আমাগ হয়রান করতে ওরাও হয়রান অইয়া যাইব, ওগ টাকার শেরাদ্দ অইব। আমরা এত টাকা খরচও করমু না, আর মাইনষের নাহক হয়রানির মইদ্যেও ফেলমু না। শোনেন, আমাগ কোলশরিক যারা পাতনা দিয়া আছে অন্যের জা'গায়, তারা এই রাইতের মইদ্যে বউ-পোলাপান, হাঁস-মুরগি, গিরস্থালির বেবাক মাল-সামান লইয়া আইব এই চরে। ভাওর ঘরে গিরস্তালি শুরু করব। যার যার গরু-বাছুর কাইল সকালের মইদ্যে আইন্যা বাইন্ধা থুইব ঐ বাথানে। দারোগা-পুলিস আইলে যেন বুঝাইয়া দিতে পারি, এই চর আমাগ। আমরা ধান লাগাইছি, কলাগাছ লাগাইছি। বাপ-দাদার আমলতন এই জা'গার চর আমাগ। এইখানে কতবার চর জাগছে, কতবার ভাঙছে। কিন্তু আমরা সব সময় খাজনা চালাইয়া আইছি। আমাগ পর্চা-দাখিলা আছে। জঙ্গুরুল্লার কি আছে? পারব কোনো কাগজ দেখাইতে?'

'না, ওরা কাগজ দেহাইব কইতন?' মেহের মুনশি বলে। 'হুনছি বিশুগাঁয়ের রায়চদরীগ তিন বচ্ছরের খাজনা দিয়া আমলদারি নিছে জঙ্গুরুল্লা। দেহাইলে ঐ আমলদারি আর খাজনার দাখিল দেহাইতে পারে। কিন্তু আগের আমলের কোনো কাগজ দেহাইতে পারব না।'

BanglaBook.org

'রায়চৌধুরীগ কান্দার চর তো আছিল অনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেই চর তো ভাইঙ্গা গেছে ছয়-সাত বছর আগে। জমিদারগ শয়তানি দ্যাখেন না। নিজেগ চরের নাম-নিশানা নাই। তবু তারা আমলদারি দিছে জঙ্গুরুল্লারে। সে এখন আমাগ চর খাবলা দিয়া নিতে চায়।'

'হ, জমিদাররা এম্বায়ই যত আউল-ঝাউল লাগায় আর আমরা মারামারি কইর‍্যা মরি।'

'শোনেন, দারোগা-পুলিস কাইল পরশুর মইদ্যে আইসা পড়ব মনে হয়। খবরদার কেও যেন চর ছাইড়্যা না পালায়। কয়জনরে আর ধরব!' ফজল বলে।

'কিন্তু মিয়া, পুলিস আইলে তুমি এট্টু সইর‍্যা থাকবা।' কদম শিকারি বলে। তোমারে ধইর‍্যা নিলে এই চর রাখন যাইব না। তুমি পরে আদালতে আজির অইয়া জামিন লইয়া আইতে পারবা।'

কদম শিকারির প্রস্তাবে সায় দেয় সবাই। কিন্তু ফজল আমতা আমতা করে। সে বলে, 'আপনাগ পুলিসে ধইর‍্যা লইয়া যাইব আর আমি পলাইয়া থাকমু?'

'হ, পুলিস আইলে তুমি সইর‍্যা থাকবা।' জাবেদ লশকর বলে।

'লড়াইয়ের সময় সেনাপতি থাকে বেবাকের পিছনে। তারে রক্ষা করে সিপাই-লশকররা। তুমি আমাগ সেনাপতি। তোমারে রক্ষা করণ আমাগ ফরজ।'

'হ, তুমি রক্ষা পাইলে আমরাও রক্ষা পাইমু।' মেহের মুনশি বলে।

'দারোগার পানসি দূরের তন দ্যাখলেই চিনা যায়। চাইরদিগে আমাগো পাহারাদার থাকব। তারা নজর রাখব সব সময়।'

'হ দারোগার নাও দ্যাখলেই চিক্কইর দিব।' রমিজ মিরধা বলে। 'ষাড়েরে যেমুন কইর‍্যা মাইনষে ডাক দেয় তেমুন কইর‍্যা ডাক দিব—মোল্লাকে ডাক কর—ত্। আবার গামছা উড়াইয়া ইশারাও দিব।'

'হ, ইশারা ধরনের লেইগ্যা পালা কইর‍্যা এক জনের পর আরেক জন ভাওর ঘরের কাছে বইয়া চউখ রাখব চাইরদিগে।'

'হ, এইডাই ঠিক।' জাবেদ লশকর বলে। 'জমিরদ্দির দাঁড়াইশ্যা ডিঙিখান তৈয়ার থাকব সব সময়। পাঁচজন বাইছাও ঠিক কইর‍্যা রাখন লাগব।'

'আচ্ছা, আপনাগ রায় মাইন্যা নিলাম।' ফজল বলে। 'আর শোনেন, ভাটিকান্দি ছাইড়্যা আমি চইল্যা আসমু এই চরে। তিন-চারদিনের মইদ্যে ঘর-দরজা ভাইঙ্গা মাল-সামান লইয়া এই চরে আইস্যা বসত করমু। আর কেও যদি এই চরে আইতে চান, আইতে পারেন। দারোগা-পুলিস আসার ইশারা পাইলেই হাতিয়ারগুলা ধানখেতের ভিতর গুজাইয়া রাখতে অইব।'

অন্য চরে যাদের জমাজমি নেই তারা সবাই এই চরে এসে বসত করাই উচিত কাজ মনে করে। তারাও কয়েক দিনের মধ্যেই ঘর-দরজা ভেঙে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে আসবে।

॥ ছাব্বিশ ॥

আগুন দেখে ফজলের দল ঠিকই অনুমান করেছিল—ওটা জঙ্গুরুল্লার কারসাজি। খুনের চর থেকে বিতাড়িত হয়ে কোলশরিকরা জঙ্গুরুল্লার বাড়ি গিয়ে হাজির হয় সন্ধ্যার পর। ওদের দেখে কিছু বলার আগেই সে বুঝতে পারে, খুনের চর বেদখল হয়ে গেছে। রাগের তীব্রতায় তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তার ক্রুদ্ধ ঘুর্ণায়মান চোখ দুটোয় আগুন জ্বলছে। সে চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে মিইয়ে যায় সবাই। তাদের বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে থাকে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরে খেঁকিয়ে ওঠে জঙ্গুরুল্লা, 'হারামজাদা শুয়রের বাচ্চারা, চরের দখল ছাইড়্যা দিয়া আইছস ? খুন কই ? জখম কই ? একটা হারামজাদার গায়েও তো একটা কোপের দাগ নাই। কিরে লাশ ফালাইয়া থুইয়া আইছস ?'

দবির গোরাপি ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বলে, 'না হুজুর, কেও খুন অয় নাই।'

'খুন অয় নাই! তয় তোরা মাইর করস নাই ? ওগ দেইখ্যা ডরে চর ছাইড়্যা পলাইয়া আইছস ?'

'না, হুজুর, মাইর করছি।'

'মাইর করলে খুন-জখমতো অইত ? তার আলামত কই ? দুই চাইড্ডারে খুন কইর‍্যা, লাশ লইয়া থানায় গিয়া ইজাহার দেই।'

সাহস সঞ্চয় করে দবির গোরাপি ও মজিদ খালাসি মারামারির বিস্তারিত বিবরণ দেয়। জঙ্গুরুল্লা প্রথমে শুনতে চায়না তাদের কথা। প্রতিপক্ষের অভিনব কায়দা-কৌশলের কথা শুনেই সে মনোযোগ দেয়। তাদের বিবরণ শেষ হলে জঙ্গুরুল্লা বলে, 'হুনছি—রামদাওয়ালা চাকইর‍্যা আছে দক্ষিণে, ভাটির মুল্লুকে। কিন্তু আঁউকড়া আর চোত্‌রাপাতা দিয়া এম্বায় লবজান করার কথা তো শুনি নাই কোনো কালে। চাকইর‍্যাগ চিনতে পারছনি ?'

'না, ক্যামনে চিনমু।' মজিদ খালাসি বলে। 'কাইলামতো, চাকইর‍্যারা আর দলের অনেকেই মোখা লাগাইয়া আইছিল।'

'ফউজ্যারে দ্যাখছ নি ? ওকি জেলের তন ছাড়া পাইয়া আইছে ?'

'তারে দেহি নাই।' দবির গোরাপি বলে।

'তোমরা কেও দ্যাখছ নি মিয়ারা ?' কোলশরিকদের দিকে চেয়ে বলে মজিদ খালাসি।

ফজলকে কেউ দেখেনি। তবে দু'-তিন জন নাকি তার গলার আওয়াজ শুনেছে।

'তোমরা খোঁজ খবর নেও।' জঙ্গুরুল্লা বলে। 'গোরাপি আর খালাসি এইখানে থাইক্য, কথা আছে। তোমরা কয়েকজনরে পাডাইয়া দ্যাও খবর আনতে—ফউজ্যা জেলেরতন আইছে, না আহে নাই ? রাইত দুফরের আগে পাকা খবর চাই। আর বাকি সবাই বাড়িত্ যাও। চর দখলের ব্যবস্থা কইর‍্যা তোমাগ খবর দিমু।'

দবির গোরাপি ও মজিদ খালাসি ফজলের খবর সংগ্রহের জন্য দুখানা নৌকায় ছ'জনকে পাঠিয়ে দেয় দু'দিকে। তারা বুঝতে পারে প্রতিপক্ষের জোয়ান পুরুষরা আজ বাড়িতে নেই কেউ। সবাই গেছে খুনের চরে। একদল ঘটক সেজে ফজলের বোনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সোজা চলে যাবে ভাটিকান্দি—ফজলদের বাড়ি। কথায় বের করে আনবে ফজলের খবর। অন্য দলটি যাবে জাবেদ লশকরের বাড়ি। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কোনো অছিলায় ফজলের খবর বের করে আনবার চেষ্টা করবে।

দবির গোরাপি ও মজিদ খালাসি ফিরে এসে দেখে জঙ্গুরুল্লা হুঁকোর নল মুখে দিয়ে চোখ বুজে কি যেন ভাবছে। তার পা টিপছে চাকর। তার থমথমে গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস হয় না তাদের।

জঙ্গুরুল্লা হুঁকোয় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। চোখ মেলে গোরাপি আর খালাসিকে দেখতে পেয়ে বলে, 'ফউজ্যার খবর আনতে মানুষ পাডাইছ ?'

'হ, দুইদল দুইখানে পাডাইছি।' দবির গোরাপি বলে।

'শোন, তোমরা আমার ইজ্জতটা এক্কেরে গরবাদ কইর‍্যা দিছ। চর দখলের মাইরে আমার দল কোনোদিন হারে নাই। আমার দখল করা চরে কোনো ব্যাডা আইতে সাহস করে নাই। আর এইবার কি কারবারডা অইয়া গেল!'

BanglaBook.org

'এহন কি করতে চান হুজুর ?' মজিদ খালাসি বলে।

'ওরা মনে অয় বাছাবাছা চাকইর‍্যা আনছে ভাটি মুল্লুকতন। আমরা আর মাইর দাঙ্গার মইদ্যে যাইমু না। কলে কলে চাবি দিয়া কল ঘুরাইতে অইব। শোন, ওগ বিরুদ্ধে ঘর পোড়ানের মামলা দিমু।'

'ঘর পোড়ানের মামলা!'

'হ, ঘর পোড়ানের মামলা। দশ-বারো জনরে দিমু আসামি। ফউজ্যা জেলেতন আইলে ওরে দিমু এক লম্বর আসামি। তোমরা একটা ঘর ঠিক কর। ঐ ঘরে আগুন দিয়া ঘরের মালিক ডাকচিক্কইর দিব। ঐ ডাক-চিক্কইর শুইন্যা তোমরা এই চর ওই চরের কয়েকজন দেখবা—ঘরে আগুন দিয়া নাও বাইয়া পলাইয়া যাইতেছে ওগ দশ-বারো জন। ইজাহারে আরো কইতে অইব, ঘরে পাট আছিল।'

জঙ্গুরুল্লার পরামর্শে তারই কুমিরডাঙার কোলশরিক তালেবালী নিজের কুড়েঘরে আগুন দেয়।

ফজল জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছে, খবরটা পেলেই জঙ্গরুল্লা রাত দুপুরের পর তালেবালীর সাথে তার বড় ছেলে জাফর ও দবির গোরাপিকে পাঠিয়ে দেয় থানায়।

তারা থানায় পৌঁছে বেলা ন'টারও পরে। থানার বড় দারোগা জাফরকে দেখেই চিনতে পারেন। বলেন, 'কি মিয়া নতুন চর জেগেছে বুঝি ? কারা দখল করেছে ? নাম বলো। সব ক'টার মাজায় রশি বেঁধে নিয়ে আসি।'

'না হুজুর, চর দখলের ঘটনা না।'

'তবে ঘটনাটা কি ?'

'হুজুর, এই তালেবালীর ঘরে আগুন লাগাইছে।'

'আগুন লাগিয়েছে! কারা লাগিয়েছে, দেখেছ তোমরা ?'

'হ, হুজুর।'

'আচ্ছা।'

বড় দারোগা দু'জন সেপাই ডাকেন। দবির গোরাপি ও জাফরকে দেখিয়ে বলেন, 'তোমরা দু'জন এদের নিয়ে যাও। একজন যাও পুকুরের উত্তর পাড় আর একজন যাও দক্ষিণ দিকে পুলের ওপর। এদের সাথে গপ্‌গপ্ করো গিয়ে। আমি একজন একজন করে ডাকব।'

বড় দারোগা ঘটনার বিবরণ শোনেন তালেবালীর কাছ থেকে। তাকে জেরা করেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর জাফর ও দবির গোরাপিকে এক এক করে জেরা করেন। জেরা শেষ হলে তিনি বলেন, 'কি মিয়ারা, মামলাটা ঠিকমত সাজিয়ে আনতে পারোনি ? বাদী বলছে—তার পশ্চিম-ভিটি ঘরে বগি পাট ছিল পাঁচমন। ঘর আর সব পাট পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে ফজল ও আরো চারজন আসামির নাম বলেছে। আরো চার-পাঁচ জন ছিল, তাদের চিনতে পারেনি। সে দুটো নৌকায় আসামিদের পালিয়ে যেতে দেখেছে। তার কাছে টর্চলাইট ছিল না। রাতের অন্ধকারে সে আসামিদের চিনল কেমন করে ? দবির গোরাপি বলছে—তালেবালীর ঘরে দশমন নালতে পাট ছিল। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ডাক চিৎকার শুনে সে টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিল। সে একটা নৌকায় আসামিদের পালিয়ে যেতে দেখেছে। সে ফজল ও আরো চারজন আসামির নাম বলেছে। কি তাজ্জবের কথা! তালেবালী যাদের দেখেছে দবির গোরাপিও ঠিক তাদেরই দেখেছে। আর কাউকে চিনতে পারেনি। দু'জনের চোখ যেন পরামর্শ করেই ঐ কয়জন আসামিদের ওপর দৃষ্টি ফেলেছিল। তালেবালী বলছে—নয়-দশ জন আসামির মধ্যে

BanglaBook.org

দু'জনের দাড়ি ছিল। অথচ দবির গোরাপি বলছে—চারজনের দাড়ি ছিল। তালেবালী যে আউশ ধান পেয়েছিল তা ভাদ্র মাসেই খেয়ে শেষ করেছে। ভাদ্রমাস থেকেই সে চাল কিনে খাচ্ছে। আর দবির গোরাপি যে আউশ ধান পেয়েছিল তা এখনও খেয়ে শেষ করতে পারেনি। অথচ দবির গোরাপি পাট বেচে দিয়েছে ভাদ্র মাসেই। তার ঘরে পাট নেই। অন্য দিকে তালেবালীর টানাটানির সংসার। সে পাট মজুদ রেখেছে বেশি দাম পাওয়ার জন্য। ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তারপর জাফর বলছে—ঘটনার বিবরণ ও সাতজন আসামির নাম সে তালেবালীর কাছে শুনেছে। বাড়তি দু'জনের নাম জাফর পেল কোথায় ? তালেবালী তো কুল্লে চিনেছে পাঁচজনকে। কী মিয়া জাফর, দু'জনের নাম পেলে কোথায় ?'

'হুজুর, তালেবালী আমার কাছে সাতজনের নামই কইছিল।' ভয়ে জাফরের গলা কাঁপছে। তার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে।

বড় দারোগা হাঁক দেন, 'অ্যাই কে আছ ?'

দু'জন সেপাই এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ায়।

বড় দারোগা নির্দেশ দেন, 'এই তিনজনকে হাজতে ঢুকাও। মিথ্যা এজাহার দিতে আসার মজাটা দেখাচ্ছি।'

জাফর হাতজোড় করে, 'হুজুর, কী কইতে কী কইয়া ফালাইছি—'

'আমিও কী করতে কী করে ফেলি, টের পাবে এবার। মিথ্যাকে খোলস পরিয়ে সত্য বানানো যায় না। অ্যাই, তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন ? নিয়ে যাও এদের হাজতে।'

জাফর ও দবির গোরাপি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর ভয়ে কাঁপছে থরথর করে।

তালেবালী বড় দারোগার পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'হুজুর মাপ কইর‍্যা দ্যান। মাইনষের কথায় আর কান দিমু না, আর কোনো দিন থানায় আইমু না।'

পা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য বড় দারোগা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'আরে ছাড়ো, ছাড়ো, পা ছাড়ো। এই সেপাইরা, দাঁড়িয়ে দেখছ কি ?'

সেপাই দু'জন তালেবালীর হাত ধরে টেনে তোলে।

'যাও, এই শয়তানের বাচ্চা তিনটাকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দাও থানা থেকে।'

গলাধাক্কা দেয়ার আর প্রয়োজন হয় না। তিনজনই দ্রুত থানা থেকে বেরিয়ে যায়।

॥ সাতাশ ॥

চর অঞ্চলের লোক যা কোনোদিন করেনি, করতে সাহস পায়নি, তাই করছে জঙ্গুরুল্লা চৌধুরী। সে চৌধুরীর চরে নিজের বাড়ি থেকে অল্প দূরে দক্ষিণ দিকে তার পীরবাবার জন্য দেয়াল ঘেরা তিন কামরার পাকা বাড়ি তৈরি করছে। দেয়ালের বাইরে তৈরি করছে খানকাশরিফ।

প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য সে কোনো দিনই ইটের বাড়ি বানাতে সাহস করেনি। সে প্রায়ই বলত, 'ইট মানেই মাটি। এই মাটির ঘরেরতন টিনের ঘর অনেক ভালো। রাক্কইস্যা গাঙ থাবা দিলে টিনের ঘর ভাইঙ্গা-চুইর‍্যা আরেক খানে গিয়া আবার বসত করণ যায়। আর ইটের ঘর ? ইটের ঘর ভাঙলেই বেবাক মাটি। ভাঙ্গন শুরু অইলে এই মাটির ঘর চিৎ-কাইত অইয়া রসাতল অইয়া যাইব।'

BanglaBook.org

পীরবাবা বুজুর্গ আদমি, আল্লার খাস বান্দা, পিয়ারা দোস্ত। তাঁর খানকাশরিফ, তাঁর মহল খোদ আল্লাই হেফাজত করবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাসই জঙ্গুরুল্লার বুকে হিম্মত দিয়েছে ইটের বাড়ি তৈরি করবার। পীরবাবাকে তো আর তাদের মতো টিনের ঘরে মাটির মেঝেতে বাস করার কথা বলা যায় না।

তার আরো বিশ্বাস—পীরবাবা এ চরে বসত করলে রাক্ষুসে নদী এ চরের ওপর তার সর্বনাশ থাবা দিতে সাহস করবে না।

বিকেল বেলা সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে জলচৌকির ওপর বসে জঙ্গুরুল্লা রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখাশুনা করছিল আর হুঁকো টানতে টানতে ভাবছিল অনেক কিছু।

খুনের চর হাতছাড়া হয়ে গেছে। এই কার্তিক মাসের পরেই অগ্রহায়ণ মাসের শেষ নাগাদ এই চরের ধান পাকবে। তার আগেই কলে-কৌশলে চরটা আবার দখল করতে হবে। যুদ্ধের দরুন ধান-চালের দাম লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে। গোলার ধান আরো কয়েক মাস রেখে দিলে ভালো দাম পাওয়া যাবে। আমনের মরশুমে দুই-তিন হাজার মণ চাল কিনে রাখলে অনেক মুনাফা হবে। চাল রাখার জন্য একটা গুদামঘর বানানো দরকার। কিন্তু টিন পাওয়া যাচ্ছে না। টাটা কোম্পানী এখন নাকি যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করতে ব্যস্ত। টিন আর তৈরি করছে না। অনেকে অভাবে পড়ে ঘর বিক্রি করছে। দু-চারটে ঘর কিনতে পারলে গুদামের জন্য প্রয়োজনীয় টিন পাওয়া যাবে। পীরবাবা আর মাসখানেক পরেই এসে পড়বেন। তাই বাড়ি তৈরির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। আরশেদ মোল্লার মেয়ের সাথে পীরবাবার শাদিমোবারক সহি-সালামতে সম্পন্ন করতে পারলেই তার মনে লালিত অনেক দিনের আরজু পুরো হয়। কিন্তু তার আগে ফজলকে আবার জেলে ঢোকাতে হবে। গুলি-খাওয়া বাঘ খাঁচায় ঢুকাতে না পারলে স্বস্তি নেই। ও বাইরে থাকলে চর দখল করা কঠিন হবে। আর শুভ কাজের সময় সে কী যে করে বসে বলা যায় না।

হঠাৎ আরশেদ মোল্লা ও তার মেয়ের খোঁজ খবর নেয়ার প্রয়োজন বোধ করে জঙ্গুরুল্লা। মোল্লাকে সে দেখেনি অনেকদিন। খুনের চর থেকে বিতাড়িত কোলশরিকদের মাঝেও তাকে দেখেছে বলে মনে পড়ে না তার। কোরবান আলী তার সামনেই বসে ছিল। তাকেই জিজ্ঞেস করে সে, 'মাইরের দিন আরশেদ মোল্লা কি চরে আছিল ?'

'হ আছিল। ভ্যান্‌দাডা পলাইতে পারছিল না ?' ওরে চুবাইয়া এক্কেরে আধামরা কইর‍্যা ফালাইছিল।'

'অ্যাঁ, কও কি! এই কথাডাতো আমারে কয় নাই কেও।'

'আমি ও জানতাম না হুজুর, আইজই হুনছি।'

'কে চুবাইল ? জামাই বুঝিন হউরের লাগুড় পাইয়া শোধ নিছে ? চুবাইয়া হ্যা-দফা ঘডাইয়া দিছে ?'

'কে চুবাইছে, হুনি নাই।'

'ভ্যাবলাডা কই এহন ? বাইন্দা রাখে নাই তো ?'

'না ওগ আতে পায়ে ধইর‍্যা, মাইয়া দিয়া আহনের ওয়াদা কইর‍্যা ছাড়া পাইছে।'

'অ্যাঁ, কও কি! ওয়াদা কইর‍্যা আইছে ?'

'হ, আমার কানে কানে কইছে। আপনের কাছে কইতে মানা করছে।'

'ক্যান্ ? মানা করছে কিয়ের লেইগ্যা ? মাইয়া কি দিয়া আইব নি ?'

'হেইডা কয় নাই। তয় ওয়াদা যহন করছে—'

'ওয়াদা করছে তো জান বাঁচানের লেইগ্যা। তালাক দেওয়া মাইয়ারে দিয়া আইব ক্যামনে ? তুমি শিগগির যাও। আরো পাঁজ-ছয়জন লইয়া যাও। মোল্লারে ধইর‍্যা উচ্‌কাইয়া লইয়া আইবা আমার কাছে। আর শোন, ওর মাইয়াডারেও লইয়া আহো।'

কোরবান ঢালী চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মজিদ খালাসি আসে।

'কি ও খালাসি, কি খবর লইয়া আইছ ?'

'হুজুর, থানায় ইজাহার নেয় নাই।'

'ইজাহার নেয় নাই!' জঙ্গুরুল্লা রাগে ও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়।

'তুমি খবর পাইলা কই ? তোমারে তো থানায় পাডাই নাই।'

'ওনারা ডরে আপনের কাছে আহে নাই। আমারে খবর দিয়া পাডাইছে।'

'ইজাহার নেয় নাই ক্যান্ ?'

'বড় দারোগা বিশ্বেস করে নাই।'

'ক্যান্ বিশ্বেস করে নাই ?'

'তাতো কিছু ভাইঙ্গা কয় নাই। মনে অয় ঠিকমত মিল দিয়া কইতে পারে নাই।'

রাগান্বিত জঙ্গুরুল্লা দাঁতে দাঁত ঘষে। বলে, 'এই হারামজাদারা কোনো কামের না। এই সামান্য কামডা ঠিক মতন কইর‍্যা আইতে পারল না। ইচ্ছা করে ওগ ভরতা বানাইয়া খাই। হারামজাদারা—'

মাগরেবের আজান শোনা যায়।

জঙ্গুরুল্লা রাগে গরগর করতে করতে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

রাতের খাওয়া সেরে জঙ্গুরুল্লা যখন শোয়ার আয়োজন করছিল তখন বাইরে কোরবান ঢালীর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। 'হুজুর, ঘুমাইয়া পড়ছেন নি ? আমরা আইছি।'

জঙ্গুরুল্লা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মোল্লারে লইয়া আইছ ?'

'না হুজুর, আরশেদ মোল্লা বাড়িত্ নাই। কোথায় গেছে বাড়ির কেও কইতে পারে না।'

'কবে আইব ?'

'তাও কেও কইতে পারে না।'

'তার মাইয়া লইয়া আইছ ?'

'না হুজুর। আরশেদ মোল্লা নাই, এমুন অবস্থায় তার মাইয়া আনি ক্যামনে ?'

'আইচ্ছা বাড়িত্ যাও। কাইল সকাল বেলা আমার লগে দেখা কইর‍্যা।'

জঙ্গুরুল্লা পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

'আরশেদ মোল্লার মাইয়ারে আনতে কইছিল কিয়ের লেইগ্যা ?' পাশে শোয়া দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শরিফন জিজ্ঞেস করে।

'তুমি ওই সব বোঝবা না।'

'বুঝমু না ক্যান্ ? সুখের গাঙ্গে বুঝিন রসের জোয়ার লাগছে, রঙ্গের ঢেউ উথালপাথাল করতে আছে ?'

'উঁহু, নাগো, দুক্‌খের গাঙ্গে এখন বড় তুফান। ঐ সব কথা বাদ দ্যাও। তুমি আমার রান দুইডারে টিপ্যা দ্যাও জোরে জোরে। রানের মইদ্যে বড় চাবাইতে শুরু করছে।'

শরিফন ওঠে। স্বামীর পা টিপতে টিপতে বলে, 'মাইয়াডা বোলে পরীর মতন খবসুরত ?'

শরিফনের কথা কানে যায় না জঙ্গুরুল্লার। তার মনে তখন নানা দুশ্চিন্তার ভিড় জমতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

আরশেদ মোল্লা কি সত্যি ওয়াদা পালন করবে ? ফজলের ঘরে দিয়ে আসবে তার মেয়েকে ? তা কি করে হয়! তালাক দেয়া মেয়ে আগের স্বামীর ঘর করবে কেমন করে ? এটা যে শরিয়তের বরখেলাপ।

পীরবাবার জাদু-টোনার কি কোনো আছর পড়েনি মেয়েটার ওপর ? ফজলকে জেলে ঢুকাবার একটা বড় সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। ওকে কি ভাবে আবার জেলে ঢোকানো যায়।

॥ আটাশ ॥

সে দিনের সে গানটি ফজলের মনে গেঁথে রয়েছে। সে একাকী বসে থাকলে বা শুয়ে জেগে থাকলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ছাপিয়ে গানটির গুঞ্জরণ শুরু হয় তার মনের মধ্যে। দেহের সমস্ত তন্ত্রী নেচে ওঠে সুরের ঝঙ্কারে। সে নিজেও গুনগুন করে গায় গানের কয়েকটা কলি। কখনো কলাগাছের ফাঁক দিয়ে রূপজানের বিষণ্ন মুখ, কখনো কাশবনের ফাঁক দিয়ে জরিনার অশ্রুসজল চোখ ধরা পড়ে তার মনের চোখে। দু'জনই তাকে ভালোবসে। দু'জনই তার চোখে এক ও অভিন্ন, যেন এক দেহে লীন হয়ে গেছে দুটি নারী।

ভাওর ঘরে শুয়ে আছে ফজল। তার পাশে ঘুমিয়ে আছে নূরু। পাশের আরেকটা ভাওর ঘরে বরুবিবি ও আমিনা ঘুমিয়ে আছে।

সারাটা দিন খুবই খাটুনি গেছে। ভাটিকান্দি থেকে ঘর-দরজা ভেঙে সে নিয়ে এসেছে খুনের চর। কাল ভোরেই আবার শুরু হবে ঘর তৈরির কাজ। এক দিনের মধ্যে ঘরগুলো খাড়া করতে হবে। এজন্য তিনজন মিস্ত্রি ঠিক করেছে সে। জন চল্লিশেক কোলশারিকও কাজ করবে মিস্ত্রিদের সাথে।

রাত অনেক হয়েছে। গতদিনের খাটা-খাটুনিতে ফজল ক্লান্ত, অবসন্ন। ঘুমে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কিন্তু তবুও তার মনের ভেতর চলছে গানের গুঞ্জরন, '—সেথায় বধূ থাকে।'

এক সময়ে গানের গুঞ্জরণ থেমে যায়। ফজল ঘুমিয়ে পড়ে।

...কাশবনের ভেতর দিয়ে কলসি কাঁখে এক যুবতী নারী ললিতগতিতে এগিয়ে আসছে নদীর পাড়ে। তার পরিধানে কমলা রঙের শাড়ি। কে এ নারী ? রূপজান, না জরিনা ? দূর থেকে চিনতে পারছে না ফজল। সে ডিঙির মাথিতে বসে বৈঠা টানছে। কলসিটা পাড়ে রেখে যুবতীটি কোমরে জড়িয়ে নেয় শাড়ির আঁচল। কলসিটা বাঁহাতে তুলে সে পানিতে নামে। কলসিটায় বুকের ভর দিয়ে সে এবার পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করে। হঠাৎ তার চিৎকার শুনতে পায় ফজল। সে দেখতে পায়, যুবতীটি কলসির গলা জড়িয়ে ধরে ভেসে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিসে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। নিশ্চয়ই কুমির টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফজল জোরে জোরে বেঠা টেনে এগিয়ে যায়। কলসিটা একদিকে কাত হয়ে ছুটছে মাঝনদীর দিকে। মাঝে মাঝে ওটা ডুবে যাচ্ছে। যখন ভেসে উঠছে তখন ওটার গলা জড়িয়ে ধরা কনুই ও একগোছা চুল শুধু দেখতে পায় ফজল। সে বৈঠাটা দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে কুমিরের সম্ভাব্য অবস্থানের দিকে তাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি লাগে ফজলের সারা দেহে। তার মাথাটা ধপ করে পড়ে বালিশের ওপর।

'আল্লাহু আল্লাহ্! কী দ্যাখলাম!' ঘাড়টা ব্যথা করছে ফজলের। বালিশের ওপর ঘাড়টা এ-কাত ও-কাত করে সে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়। পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর ফজল বিছানা ছেড়ে ওঠে। অন্ধকারে হাতড়ে সে খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখা

BanglaBook.org

টর্চলাইটটা হাতে নেয়। ওটা জ্বালিয়ে ঘরের এক কোণে রাখা মাটির কলসি থেকে ঢেলে পুরো এক গ্লাস পানি খায়।

রাত আর কতক্ষণ আছে, কে জানে? বেড়ায় সাথে ঝোলানো আছে ঘড়িটা। ফজল টর্চের আলো ফেলে ঘড়ি দেখে। বারোটা বেজে ওটা বন্ধ হয়ে আছে। গত পরশুর পর নানা ঝামেলার জন্য ওটায় আর দম দেয়ার কথা মনে হয়নি।

ফজল ঝাঁপ সরিয়ে খালি পায়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। পায়ের নিচে ভিজে মাটি। মাথার ওপর খোলা আকাশ। লক্ষ কোটি তারা মিটিমিটি জ্বলছে। সন্ধ্যায় দেখা শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ আর আকাশে নেই। সে আদমসুরত খুঁজে বের করে। আদমসুরতের অবস্থান দেখে সে বুঝতে পারে, রাত পোহাতে ঘণ্টা তিনেক বাকি আছে।

'কী একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম!' ফজল মনে মনে বলে। 'রূপজানের কোনো বিপদ হয় নাই তো! জরিনা কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে নাই তো!'

ওরা কেমন আছে, জানতে প্রবল ইচ্ছে জাগে তার মনে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের কোনো খবরাখবর সে পায়নি। চোখ দুটো তার আপনা থেকেই একবার উত্তর-পুবমুখি নলতার দিকে আর একবার দক্ষিণ-পুব বরাবর নয়াকান্দির দিকে দৃষ্টি ফেলে। ঘন কালো অন্ধকার। কয়েকটা বাতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। জেলেরা মাছ ধরছে নদীতে। বাতি জ্বলছে তাদের নৌকায়।

ফজল দুদিকেই টর্চের আলো ফেলে। সে আলো চরের সীমানা ছাড়িয়ে খুব বেশি দূর এগোয় না। সে জানে টর্চের আলো নলতা বা নয়াকান্দির অর্ধেকের অর্ধেক দূরত্বও অতিক্রম করতে পারবে না। তবুও অযথাই সে ঐ দুদিকে টর্চের আলো ফেলে বারবার। ফজলের দিকে টর্চের আলো আসছে পুবদিকে থেকে। চরের পাহারায়রত তারই লোক তার আলোর জবাবে আলো ফেলছে।

ফজল চরের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকেও টর্চের আলো ফেলে। সেদিক থেকেও টর্চ মেরে জবাব দেয় পাহারাদাররা।

ফজল ধানখেতের আল ধরে এগিয়ে যায় পুবদিকে। পায়ের নিচে প্যাচপেচে কাদা। কিছুদূর কাদা মাড়িয়ে, তারপর তিরতিরে পানি ভেঙে সে পুব কিনারায় চলে যায়। অনেকক্ষণ নদীতে ভাটা শুরু হয়েছে। কিন্তু জোয়ারের পানি এখনো পুরোপুরি নেমে যায়নি।

'এখানে কারা আছে পাহারায়?' ফজল জিজ্ঞেস করে।

'আমি লালু আর সাবু।' উত্তর দেয় একজন পাহারাদার। অনেক লটাঘাস বিছিয়ে একটা ঢিবির মতো করা হয়েছে। তারই ওপর দাঁড়িয়ে আছে দু'জন পাহারাদার।

'তোরা সাবধানে থাকিস। গাঙ্গে কিন্তু কুমির আছে।'

'আমাগ কাছে কুমির আইব কি মরতে? ট্যাটা দিয়া এক্কেরে গাঁইথ্যা ফালাইমু।'

'ঢিপির উপরে তোগ টঙ বানাইয়া দিতে অইবরে। শীতকাল আইসা পড়তেছে। ছই না থাকলে মাথায় ওস পড়ব। আমাগ বেড়য়ালারা কই? ফাঁকগুলা বানা দিয়া বন্ধ করছে?'

'হ, ভাটার টান লাগনের আগেই জাগাইয়া দিছিলাম।' সাবু বলে। 'তারা ফাঁক বুজাইয়া ঘুমাইয়া রইছে ডিঙির মইদ্যে।'

জোয়ারের সময় মাছ যাতে কিনারায় আসতে পারে সেজন্য বেড়ের কিছু বানা তুলে দেয়া হয়। ভাটার টান শুরু হওয়ার আগেই সে ফাঁক গুলো আবার বানা দিয়ে বন্ধ করতে হয় যাতে পানি কমার সাথে সাথে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।

BanglaBook.org

'মোরগের বাকের আগে পানি নামব না।' ফজল বলে। 'পানি বেবাক সইর‍্যা যাওনের আগেই ওগ জাগাইয়া দিস আবার।'

'আইচ্ছা।'

'আর শোন্, মাছ বেচতে যারা তারপাশা যাইব, তাগো মনে করাইয়া দিস, তারা যেন খবরের কাগজ আনতে ভোলে না।'

ফজল টর্চের আলো ফেলে কিনারা ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। কোথাও পায়ের পাতা সমান, কোথাও আধ্‌হাঁটু পানি। সে পুরোটা চরে ঘোরে। পাহারাদাররা সবাই সজাগ, সতর্ক।

সে তাদের সাবধান করে দেয়, 'কুমির আছে কিন্তু গাঙ্গে। সাবধান!'

ফজল ভাওর ঘরে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর শোনা যায় ভোরের আজান।

বসত ভিটা উঁচু করা প্রয়োজন। উঁচু না করলে ভরা বর্ষার সময় জোয়ারের পানি ঢুকবে ঘরের মধ্যে। তাই চল্লিশ জন কোলশরিক অন্ধকার থাকতেই ওড়া-কোদাল নিয়ে কাজে লেগে গেছে। ফজলের বাড়ির জন্য নির্ধারিত চৌহদ্দির দক্ষিণ পাশে পুকুর কেটে তারা বসত ভিটায় মাটি ফেলছে। কিন্তু পুকুরটা বেশি গভীর করা যাচ্ছে না। পানি উঠছে নিচে থেকে।

আকু মিস্ত্রি ভোরেই এসে কাজ করতে শুরু করেছে। তার তদারকিতে কাজ করছে আরো দু'জন মিস্ত্রি।

দক্ষিণ ভিটিতে উঠবে তিরিশের বন্দের কাছারি ঘর। উত্তর ভিটিতে সাতাশের বন্দের ও পশ্চিম ভিটিতে পঁচিশের বন্দের দুটো থাকবার ঘর উঠবে। ঘরগুলোর ঢেউটিনের চালা, পাতটিনের বেড়া আর খুঁটি-খাম্বা সবই তৈরি। এখন মাপ-জোখ নিয়ে, বন্দ ঠিক করে, খুঁটি-খাম্বা পুঁততে হবে। খুঁটির ওপর চালা বসিয়ে বেড়াগুলো গজাল মেরে আটকে দিতে হবে। পুবের ভিটিতে চাড়ার দো-চালা ঘর উঠবে। ওটার একদিকে ঢেঁকিঘর আর একদিকে রসুইঘর হবে।

ফজল বসে বসে মিস্ত্রিদের কাজ দেখছে আর নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে পুলকি মাতব্বরদের সাথে।

'ওরা কি থানায় গেছে?' জিজ্ঞেস করে ফজল।

'গেছে, এডুক খবর পাইছি।' মেহের মুনশি বলে। 'কারে কারে আসামি দিছে, খবর পাই নাই।'

'আপনারা খবর নেন। যাদের এই চরে আসার কথা, তারা কি সবাই আইস্যা পড়ছে?'

'হ, সবাই বউ-পোলাপান লইয়া আইছে।' বলে জাবেদ লশকর। 'গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি সব লইয়া আইছে।'

ফুঁত-ফুঁত।

চাটগাঁ মেল আসছে। সকলেই সেদিকে তাকায়। স্টিমারটা এ চরের উত্তর দিক দিয়ে চলে যায়। তারপাশা, ভাগ্যকুল টেপাখোলা ধরে যায় গোয়ালন্দ।

'জাহাজটা অনেক দেরিতে যাইতে আছে আইজ।' কদম শিকারি বলে।

'চর মাথাভাঙ্গার উত্তর চর পড়তে আছে।' জাবেদ লশকর বলে। 'তার লেইগ্যা ঘুইর‍্যা আইতে জাহাজের দেরি অইয়া যায়।'

BanglaBook.org

'শোনেন, একট প্রাইমারি ইস্কুল খুলতে অইব।' ফজল বলে। 'শুরুতে নিজেগই মাস্টারি করণ লাগব।'

'তা করণ যাইব।' মেহের মুনশি বলে।

'বাজারের বেইল অইয়া গেছে।' রমিজ মিরধা বলে। 'ট্যাহা লইয়া আহো। আমি আর মুনশি হাশাইল যাইমু। গয়নাগুলা বেবাক ছাড়াইয়া লইয়া আইমু।'

'লাগবতো আসল দেড় হাজার আর এক মাসের সুদ পঁচাত্তর টাকা। তাই না?' ফজল বলে।

'হ। এই কয়দিনের লেইগ্যা পুরা এক মাসের সুদ চাইতে পারে।'

ফজল উঠে ভাওর ঘরে যায়। লোহার সিন্দুক এনে সেখানেই রাখা হয়েছে। সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে সে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে। মেহের মুনশি টাকা গুণে নিয়ে রমিজ মিরধার সাথে হাশাইল রওনা হয়।

রোদের তেজ বাড়তে শুরু করেছে। ফজল সবাইকে নিয়ে তাদের ভাওর ঘরের ছায়ায় গিয়ে বসে।

ঘোঁজার দিক থেকে চারজন লোক আসছে। তাদের সাথে করে নিয়ে আসছে উত্তর দিকের একজন পাহারাদার।

'এই লোকগুলা আইছে আপনের লগে দ্যাহা করতে।' ফজলকে বলে পাহারাদার বাচ্চু।

'হ, মাতবরের পো, আপনের কাছে একটা আরজু লইয়া আইছি। আমরা আছিলাম ধানকুনিয়ার চরে। আমাগ চর ভাইঙ্গা গেছে। আমার নাম তোবারক। অনেকদিন ধইর‍্যা পাতনা দিয়া আছি ডাইনগাঁয়। আর ওনারা চর ভাঙনের পর আসামি মুল্লুকে চইল্যা গেছিল। আবার ফিরত আইছে। আমাগ কিছু জমি দ্যান।'

'জমি দিব কইত্যন? কদম শিকারি বলে। 'জমিতো বেবাক ভাগ-বণ্টন অইয়া গেছে।'

'এই মিয়া মাতবরের পো ইচ্ছা করলে দিতে পারে। আমাগ বাঁচনের একটা রাস্তা কইর‍্যা না দিলে আমরা না খাইয়া মইর‍্যা যাইমু।'

'না মিয়ারা, জমি দেওনের কোনো উপায় নাই।'

'দয়া কইর‍্যা আমাগ বাঁচনের একটা পথ কইর‍্যা দ্যান।' তোবারকের সাথের একজন বলে। 'আমরা এই তিনজন চর ভাঙ্গনের পর গেছিলাম আসাম মুল্লুক।'

'আসামে তো অনেক মানুষ যায়।' ফজল বলে। 'গেলেই কি জমি পাওয়া যায়।?'

'পাওয়া যাইব কইতন? জমিতো কেও দ্যায় না। বন-জঙ্গল সাফ কইর‍্যা জমি বানাইতে অয়। আমরাও জমি আবাদ করছিলাম। কিন্তু কালাজ্বরে থাকতে দিল না। কালাজ্বরে আমার মা, দুইডা লায়েক পোলা মরছে। ওনাগ পোলাপানও মরছে। হেষে মরণের মোখেরতন আমরা পলাইয়া আইছি।' হঠাৎ লোকটির গলা ধরে যায়। তার চোখ ছলছল করে।

ফজলের মনে সহানুভূতি জাগে। সে জাবেদ লশকর ও কদম শিকারির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনারা কি কন?'

'কী আর কইমু।' জাবেদ লশকর বলে। 'এতে কষ্ট কইর‍্যা আমরা চর দখল করলাম। আর ওনারা আসমানতন আইয়া কয়, জমি দ্যান।'

'না মিয়ারা, জমি দেওন যাইব না।' কদম শিকারি দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

'আমাগ বাঁচনের একটা রাস্তা কইর‍্যা না দিলে বউ-পোলাপান লইয়া দপাইয়া মইর‍্যা যাইমু।' তোবারক বলে। 'সাড়ে তিন ট্যাহা মনের চাউল দশ ট্যাহা অইয়া গেছে।'

BanglaBook.org

আকু মিস্ত্রি হুঁকো টানতে টানতে এসে দাঁড়িয়ে শুনছিল এদের কথা। সে বলে, 'হ, কাইল ট্যাহায় চাইর সের ভাও গেছে দিঘিরপাড়। হোন মাতবরের পো, আমাগ কিন্তু এহন আষ্ট আনা রোজ দিয়া পারবা না। আমাগ এহন অ্যাক ট্যাহা কইর‍্যা দিতে অইব।'

'ওরে আমার আল্লারে', আষ্ট আনারতন এক্কই লাফে অ্যাক টাকা!'

'চাউলের দামও তো লাফ দিয়া তিন দুনা অইছে, কি কও, দিবা, না দিবা না ? না দিলে থাকুক পইড়্যা তোমার কাম। আমরা বাড়িত্ চললাম।'

'না, না, কাম করতে থাকেন। বিবেচনা কইর‍্যা দিমু আপনাগ।'

আকু মিস্ত্রি গিয়ে আবার কাজে লেগে যায়।

লোকগুলো আবার অনুনয় করে।

'জমি দিতে পারমু না।' ফজল বলে। 'তয় তোমাগ বাঁচনের একটা পথ কইর‍্যা দিতে পারি।'

'হ, একটা পথ কইর‍্যা দ্যান।' তোবারক বলে। 'আল্লায় আপনের ভালো করব।'

'শোন, বাড়ির কাছে এত বড় গাঙ থাকতে তোমরা না খাইয়া মরবা ক্যান্ ? এই গাঙ আমাগ যেমন ভোগায়, তার চেয়ে বেশি খাওন যোগায়। আমাগ কোলশরিকরা বেড় দিয়া মাছ ধরে। সেই মাছ বেইচ্যা তারা সংসার চালায়। পারবা তোমরা মাছ ধরতে ?'

'পারমু, মাতবরের পো। তোমরা কি কও, পারবা ?'

'হ, পারমু।' আসাম-ফেরত তিনজন বলে।

'যদি পার, চইল্যা আসো এই চরে। থাকনের লেইগ্যা ঘর উঠানের জায়গা আমি দিমু। তোমরা বাঁশ, বেত, নারকেলের কাতা কিন্যা আনো। চাঁই বানাও, দোয়াইর বানাও, চালি বুনাও। দাউন বড়শি বাইন্দা লও। অবসর সময়ে জাল বোনো—ইলশা জাল, মই জাল, টানা জাল, ধর্মজাল, ঝাঁকি জাল। আমাগ কোলশরিকরা পূব-দক্ষিণ আর পশ্চিমের ঢালে বেড় পাতছে। বেড় পাতনের আর জায়গা নাই। উত্তর দিকটা ঢালু না, খাই বেশি। ঐ দিগে তোমরা চাই পাতো, দোয়াইর পাতো, দাউন বড়শি পাতো। থাকলে মানুষ পারে না কোন কাম ? না খাইয়া মরে কারা ? যারা আত-পাও থাকতে হায়-হুতাশ করে। বাঁশ, বেত, সূতা কিনতে টাকা লাগলে কর্জ নিও আমারতন।'

ফজলের প্রস্তাবে রাজি হয়ে তারা চলে যায়।

জাবেদ লশকর বলে, 'বড় খারাপ দিন আইতে আছে। মানুষ চেষ্টা করলেও কি বাঁইচ্যা থাকতে পারব ?'

'চেষ্টাতো করতে অইব। ইতিহাসে পড়ছি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই দেশের তিনভাগের এক ভাগ মানুষ মইর‍্যা গেছিল। সেই সময়েও ব্রিটিশ আছিল। দেশের ফসল মাইর গেছিল। মানুষের টাকা থাকলেও চাউল পাওয়া যায় নাই। সেই সময় তো জাহাজ আছিল না, রেলগাড়ি আছিল না। অন্য দেশের সাথে যোগাযোগ আছিল না। এখন তো একখানের ফসল মাইর গেলে আরেকখানতন আনতে পারা যায়। সরকার কী করতে আছে ? এক জেলারতন আরেক জেলায় ধান-চাউল আনতে দেয় না। জাপানিরা বর্মা দখল করছে। ওই খানের পেগু চাউল আর আসব না। আবার মিলিটারির লেইগ্যা ধান-চাউল গুদামে ভরতে আছে। সরকার যদি দেশের মানইনষের দিগে না চায় তয় সেই সরকার থাকন না থাকন সমান। শোনেন, এই বিদেশী সরকার খেদান লাগব। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু অইছে। ব্রিটিশ আর বেশিদিন এই দেশে থাকতে পারব না। শোনেন বিদেশী সরকারের উপর ভরসা কইর‍্যা থাকন

BanglaBook.org

যাইব না। এই চরের ধানে কিন্তু বেবাকের সাত-আট মাসের বেশি চলব না। আপনারা চীনা আর কাউনের বীজ যোগাড় করেন। উঁচা জায়গায় ঐ লতা লাগাইয়া দিবেন। যার যার বাড়িত লপ্তে।'

গুড়গুড় আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। সবাই মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকায়। পাঁচটা উড়োজাহাজ আসছে দূর থেকে। তার পেছনে আসছে আরো পাঁচটা।

'যুদ্দু এইবার লাগছে জবর।' জাবেদ লশকর বলে। 'ওগুলা কই যাইতাছে?'

'ওগুলা যাইব আসামের কোনো ঘাঁটিতে।' ফজল বলে। 'সেইখানতন পেট্রল ভইর‍্যা যাইব বর্মা মুল্লুকে, জাপানিগ উপরে বোমা মারতে।'

ভয়ঙ্কর বিদঘুটে শব্দ করে উড়োজাহাজগুলো মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় উত্তর-পুবদিকে।

ফজল তার অসমাপ্ত কথার জের টেনে বলে, 'আপনারা যার যার বাড়ির লপ্তে কদু, কুমড়া, বেগুন, মরিচ, নানান জাতের তরিতরকারির গাছ লাগাইতে শুরু করেন। বাড়ির চুতর্দিগে বেশি কইর‍্যা, ঘন কইর‍্যা কলাগাছ লাগান। এতে বাড়ির পর্দাও অইব, কলাও খাওয়ন যাইব। যদি আকাল লাগে, তয় চীনা-কাউনের ভাত, মিষ্টি আলু, কলার বারালি পেটের জামিন দিয়াও বাঁচন যাইব।'

'ও মিয়া মাতবরের পো।' আকু মিস্ত্রি ডাকে ফজলকে। 'দ্যাহো দেহি ভালো কইর‍্যা। ব্যাকাত্যাড়া অইয়া গেলনি আবার।'

জাবেদ লশকর, কদম শিকারি ও আহাদালীকে নিয়ে ফজল ঘরের কাজ দেখে। খুঁটি-খাম্বা ঠিকমত বসানো হয়েছে। মিস্ত্রিদের কাজে কোনো খুঁত পাওয়া যায় না। বসত ভিটায় ও ঘরের ভিটির মাটি ফেলা শেষ হয়েছে। তক্তা দিয়ে পিটিয়ে দুরমুশ করে সমতল ও মজবুত করে মাটি বসাচ্ছে কয়েকজন কোলশরিক।

'মিস্ত্রি চাচা, সব ঠিক আছে। এইবার চালগুলা উড়াইয়া খিলাইয়া ফেলেন। বেড়াগুলা লাগাইয়া ফেলেন। চাল উড়াইতে আমাগ ধরন লাগব?'

'না, বহুত মানুষ আছে। তোমাগ ধরন লাগব না।'

পুলকি-মাতব্বরদের নিয়ে ফজল আবার এসে বসে ভাওর ঘরের ছায়ায়।

'গতকাল দারোগা-পুলিস আসার কথা ছিল। আসে নাই ক্যান্, কে জানে! আজ কিন্তু আসতে পারে। পাহারাদাররা সতর্ক আছে তো?'

'হ আছে।' আহাদালী বলে।

যারা মাছ নিয়ে তারপাশা গিয়েছিল তারা ফিরে আসে। ফজলের জন্য খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে তারা।

আনন্দবাজার পত্রিকাটা হাতে নিতে নিতে ফজল বলে, 'আজাদ পাইলা না?'

'না, এইডাই শুধু পাওয়া গেল।' কোলশরিক জমিরদ্দি জবাব দেয়।

'কত পাওয়া গেছে আইজ?'

'বড় মাছে আঠারো ট্যাকা। আর গুডা মাছে আট টাকা।'

'ভালোইতো পাইছ।'

'হ, মাছের দাম কিছু বাড়ছে।'

'কিন্তু চাউলের দামের মতন তো বাড়ে নাই।'

'তারপাশায় চাউলের দামের খোঁজ নিছিলা?'

BanglaBook.org

'হ, ট্যাহায় চাইর সের। মাইনষে কওয়া-কওয়ি করছিল—দর আরো বাড়ব। হেষে পাওয়াই যাইব না।'

জেল থেকে খালাস পেয়ে আসার পর ফজল খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ পায়নি। আর খবরের কাগজ হাতে পেয়েই তার পিপাসার্ত চোখ খবরের শিরোনামগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'কি লেখছে মিয়া ?' জাবেদ লশকর উন্মুখ হয়ে জিজ্ঞেস করে। 'জোরে জোরে পড়লে আমরাও কিছু জানতে পারি।'

'উত্তর আফ্রিকায় মিত্রবাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণ। রোমেলের দুর্ধর্ষ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ। ব্রিটিশ বিমান হামলায় আকিয়াবের জাপানি ঘাঁটি বিধ্বস্ত। স্তালিনগ্রাডে প্রচণ্ড যুদ্ধ।'

ফজল জোরে জোরে শিরোনামগুলো পড়তে থাকে।

দুপুরের কিছু পরে রমিজ মিরধা ও মেহের মুনশি হাশাইল থেকে ফিরে আসে। তারা গয়নাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

'একটা কামের মতো কাম অইছে।' জাবেদ লশকর বলে। 'এহন ছাড়াইয়া না আনলে গয়নাগুলা আর কোনোদিন ছাড়ান যাইত না।'

'এই গয়নাগুলা নেওনের সময় কত বউ-ঝিরে কান্দাইছি।' রমিজ মিরধা বলে। 'আইজ তাগ মোখে আবার হাসি ঝলমল করব।'

'ফর্দের সঙ্গে মিলাইয়া গয়নাগুলা আলাদা আলাদা সাজাইয়া নেন।' ফজল বলে। 'তারপর একজন একজন কইর‍্যা বোলাইয়া যার যার গয়না ফিরত দিয়া দ্যান। পয়লা আমারে দিয়াই শুরু করেন।'

রূপজানের গয়নাগুলো বুঝে নিয়ে ফজল সেগুলোকে রুমালে বাঁধে। রুমালের পুটলিটা বুকের সাথে চেপে ধরে সে ভাওর ঘরে যায়। তার মা সেখানে আলগা চুলোয় রান্না করছে।

'মা এই নেও গয়না। আইজই মহাজনের ঘরতন টাকা দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া আইছি।'

'গয়নাতো আনছস। কিন্তু গয়নার মানুষটারে তো আনতে পারলি না।' গয়নার পুটলিটা হাতে নিয়ে বলে বরুবিবি।

ফজল মাথা নিচু করে সরে যায় সেখান থেকে।

দুপুরের খাওয়া সেরে ফজল মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে চলে আসে। পুলকি-মাতব্বররা বাড়ি চলে গেছে যার যার। শেষ বিকেলের আগে তারা আর আসবে না।

ফজল খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে যায়।

'ফজল।'

ফজল মুখ তুলে তাকায়। 'আরে জাহিদ ভাই! তুমি কইতন আইলা ?'

'আইলাম বাড়িত্‌ন। গেছিলাম ভাটিকান্দি। শোনলাম, তোমরা ঘর-দরজা ভাইঙ্গা এই নতুন চরে আইসা পড়ছ।'

'বাড়ির সব কেমন আছে ? চাচি, শহিদ-ভাই, তওহিদ, সেতারা ?'

'সব্বাই ভালো আছে। আমিই খালি ভালো নাই।'

'ক্যান্‌, কি অইছে ?'

'এই নানান ঝামেলা। চাচি কই ?'

BanglaBook.org

'ঐ খানে ভাওর ঘরে। চলো যাই। তোমার তো খাওয়া হয় নাই।'

'না।'

জাহিদকে ভাওর ঘরে নিয়ে যায় ফজল। তাকে দেখে খুশি হয় বরুবিবি। তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তাদের বাড়ির সকলের কথা।

এরফান মাতব্বরের বড় ভাই এমরান মাতব্বর। সে-ই ছিল এ এলাকার বড় মাতব্বর। বাংলা ১৩২৬ সনের বন্যার পরের বছর যখন লটাবুনিয়া ভেঙে যায় তখন সে তার সব কিছু নিয়ে চলে যায় তার শ্বশুরবাড়ি—দক্ষিণপাড়ের পাইকপাড়া গ্রামে। তার স্ত্রী শরিফ ঘরের মেয়ে। সে বেঁকে বসেছিল, সে আর কোনো দিন চর অঞ্চলে যাবে না। উপায়ান্তর না দেখে সেখানেই সে জমাজমি কিনে বাড়ি-ঘর করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তারপর লটাবুনিয়া কয়েকবারই জেগেছে, আবার ভেঙেছে। নাম বদলে হয়েছে খুনের চর। কিন্তু এমরান মাতব্বর আর চরে ফিরে আসেনি কোনো দিন। স্ত্রীর জেদের কাছে তাকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বছর সাতেক আগে সে কলেরায় মারা যায়। জাহিদ তারই মেজো ছেলে।

জাহিদকে নিয়ে ফজল আবার চলে আসে মিস্ত্রিদের কাজের জায়গায়।

'জাহিদ ভাই, তুমি না মিলিটারিতে গেছিলা ?'

'হ, না জাইন্যা ঢুকছিলাম পায়োনিয়ার ফোর্সে। আমাগ নিয়া গেছিল চাটগাঁর অনেক দক্ষিণে জঙ্গল সাফ কইর‍্যা রাস্তা বানাইতে। এমুন সব কাম করতে হুকুম দেয় যা গুষ্ঠীর কেউ কোনোদিন করে নাই। অইসব জা'গায় জাপানিরা বোমা মারতে পারে। আমি আইয়া পড়ছি, আর যাইমু না।'

'পলাইয়া আইছ ?'

'না পলাইমু ক্যান্। ছুটি লইয়া আইছিলাম। আর যাইমু না।'

'আমাগ কোলশরিক কিতাবালীর পোলা বোরহান পড়ত ক্লাস এইটে। মিলিটারিতে *'টপ্যাস'* অইয়া ঢুকছিল। সে মনে করছিল রাইফেল-বন্দুক হাতে লইয়া লড়াই করব। আমরা যেমন লড়াই করি ঢাল-শড়কি লইয়া। ও গিয়া দেখে, টপ্যাসের কাজ ঝাড়ু দেওয়া। সে-ও পলাইয়া আইছে। তারে নাকি পলাতক ঘোষণা করছে। তার নামে ওয়ারেন্ট বাইর অইছে।'

জাহিদ গলা খাদে নামিয়ে বলে, 'শোন ফজল, আমার নামেও ওয়ারেন্ট অইছে। সেই জন্যই আইছি তোমাগ বাড়ি। এইখানে তো আমারে কেও চিনে না। আমি এইখানেই থাকমু কিছুদিন।'

'থাকো, যদ্দিন তোমার মনে লয়। কিন্তু পুলিস আমাগ ধরতে আইব। আইজও আইতে পারে, কাইলও আইতে পারে। আমাগ বিরুদ্ধে ঘর পোড়ানের মামলা আছে।'

'তয় তো বড় মুসিবত। আমি তাইলে এখনি চইল্যা যাই।'

'না, যাইবা ক্যান্। পুলিস আইলে আগেই খবর পাইমু। আমি ধরা দিমু না। সইর‍্যা যাইমু। নাও-বাইছা সব তৈয়ার। তুমিও আমার লগে সইর‍্যা পড়বা।'

জাহিদ আশ্বস্ত হয়। কিছুক্ষণ পরে সে বলে, 'আইচ্ছা, এই চরের অর্ধেক মালিকানা তো আমার বা'জানের আছিল। তার অবর্তমানে এখন আমরা মালিক। দূরে আছিলাম বুইল্লা দাবি করি নাই। এহন দাবি করলে আমাগ অংশের জমি দিবা ?'

'নেও না। আমার ভাগের অর্ধেক জমি দিমু তোমারে। চাচিরে, ভাবিসাবরে লইয়া আহো গিয়া।'

BanglaBook.org

'মা তো আইব না। তোমার ভাবিসাবরে লইয়া আইমু।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'আইজ হাঁটতে হাঁটতে জান সারা। আমি ভাওর ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম নেই।'

সবগুলো ঘর উঠে গেছে। কাজ আর বেশি বাকি নেই। দিনের শেষে কাজেরও শেষ হবে বলে মনে হয় ফজলের।

আজও পুলিস আসেনি। ফজল মনে মনে ভাবে, খুবই ভালো হলো। কাল এসে পুলিস প্রমাণ পাবে, এ চরের সত্যিকার মালিক কে?

আকু মিস্ত্রি চালার ওপর উঠে চালার জোড়ায় টুয়া লাগাচ্ছে। এক সময়ে সে গানে টান দেয়:

যেই ঘর আমি বানাইলাম
মনের মতন সাজাইলাম
সেই ঘরেতে হবে না মোর ঠাঁই রে,
হবে না মোর ঠাঁই।
সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে
থাকতে হবে চিরতরে
সেই ঘরেতে আলো বাতাস নাই রে,
আলো বাতাস নাই।

॥ উনত্রিশ ॥

পাঁচদিন পর ফজল খবর পায়—প্রতিপক্ষ ঘর পোড়ানোর এজাহার দিতে পারেনি, কারণ তাদের মিথ্যা কারসাজি বড় দারোগার জেরার চোটে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

গত কয়েকদিন বড় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে ফজল ও তার দলের লোকজন। মস্ত বড় একটা বিপদ কেটে যাওয়ায় তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আনন্দে উল্লসিত হয়। কারো মুখে গালাগালির তুবড়ি ছোটে জঙ্গুরুল্লার উদ্দেশে। দিঘিরপাড় ছিল ফজলের চিত্তবিনোদনের একমাত্র স্থান। সেখানে দেখা হতো তার খেলার সাথী আর স্কুলের বন্ধুদের সাথে, পেত নানা ঘটনার, বিভিন্ন জন-স্বজনের খবরাখবর। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে গল্প গুজব করে মনটাকে তাজা করে, হাট-সওদা নিয়ে সে বাড়ি ফিরত। অন্যদিন না হলেও হাটের দিন সেখানে না গিয়ে সে থাকতে পারত না। অথচ গত আটদিন মাসের মধ্যে সে একদিনও সেখানে যায় নি, যাওয়ার সুযোগ পায়নি।

বিপদ কেটে যাওয়ার পর থেকেই তার মনটা ছটফট করতে থাকে দিঘিরপাড় যাওয়ার জন্য। কিন্তু জঙ্গুরুল্লার দল কখন যে হামলা করে, ঠিক নেই কিছু।

দুদিন পরে দিঘিরপাড়ের হাট। এ দুদিনের ভেতর জঙ্গুরুল্লার সম্ভাব্য হামলার সংবাদ সংগ্রহ করতেই হবে তাকে।

সংবাদ পেয়েও যায় ফজল। প্রতিপক্ষের প্রস্তুতির কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। সে আরো খবর পায়, চালের দর বেড়ে যাওয়ায় চরের গরিব চাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। তারা সাহায্যের জন্য যাচ্ছে জঙ্গুরুল্লার কাছে। সাহায্য করার নামে জঙ্গুরুল্লা তাদের দাদন দিচ্ছে। আমন ধান উঠলেই পাঁচ টাকা মন দরে তাকে ধান দিতে হবে দাদনের বিনিময়ে।

আজ দিঘিরপাড়ের হাট। প্রয়োজনীয় সওদাপাতির ফর্দ তৈরি করে চান্দু ও বক্করকে ডেকে নিয়ে সে ডিঙিতে উঠে।

BanglaBook.org

চান্দু পাছায় আর বক্কর গলুইয়ে বসে বৈঠা টানছে।

'এই চান্দু, আমার হাতে বৈঠা দে।' ফজল বলে। 'অনেকদিন নৌকা বাইনা। মাঝে-মইদ্যে না বাইলে নৌকা বাওয়া ভুইল্যা যাইমু।'

'এইখান দিয়াতো উজান। এট্টু পরেই ভাটির জাগায় গিয়া আপনের আতে—।'

'আরে না, তুই এখনি দে। ভাটি পানিতে তো বেশি টনতে অয় না। হাইল ধইর‍্যা বইস্যা থাকলেই অয়।'

চান্দুর হাত থেকে বৈঠা নিয়ে জোরে জোরে টানতে থাকে ফজল।

কিছুদূর গিয়েই সে বাঁ দিকের খাঁড়িতে ঢুকিয়ে দেয় ডিঙিটা।

'ঐ দিগে যান কই ?' চান্দু বলে। 'ঐডা দিয়া গেলে তো বহুত ঘোরন লাগব। দাত্রার খাঁড়ি দিয়া যান।'

'একটু ঘুইর‍্যাই যাই। নলতার খাঁড়িতে শুনছি কুমির আছে। খাঁড়ির পশ্চিম দিগের চরে দুইডা কুমির বোলে রউদ পোয়াইতে আছিল।'

'আমরা তো কোনো দিন হুনি নাই।' বক্করের কথার ভেতর ঘোলাটে সন্দেহ।

'আরে সব খবর কি সবার কানে আসে। তোরা পশ্চিম দিগের চরটার দিগে চউখ রাখিস।'

'এহন তো শীতকাল না। আর রউদের তেজও খুব। কুমির কি এহন এই ঠাডা রউদে বইয়া রইছে ?'

'তবুও চউখ রাখিস তোরা। দ্যাখ্যা যাইতেও পারে। যদি দ্যাখ্যা যায় রে! দ্যাখা গেলে কি করমু জানস ?'

'কি করবেন ?' চান্দু জিজ্ঞেস করে।

'ফান্দে আটকাইমু। কুমিরের ফান্দা ক্যামনে পাতে, তোরা দ্যাখছস কোনো দিন ?'

'উঁহু দেহি নাই।'

'যেইখান দিয়া কুমির রউদ পোয়াইতে উপরে ওডে, সেইখানে তিন কাঁটাওলা বড় বড় অনেকগুলা গ্যারাফি বড়শি শন সুতার মোট্টা দড়িতে বাইন্দা লাইন কইর‍্যা পাততে অয়। দড়িগুলারে মাটির তল দিয়া দূরে উপরের দিগে নিয়া শক্ত খুঁড়ার লগে বাইন্দা রাখতে অয়। তারপর যখন কুমির রউদ পোয়াইতে চরের উপরে ওডে, তখন উলটাদিক তন দাবড় দিলে কুমির হরহর কইর‍্যা বড়শির উপর দিয়া দৌড় মারে পানির দিগে। ব্যস কুমিরের ঠ্যাঙ্গে, প্যাডে বড়শি গাঁইথ্যা যায়। আমি কুট্টিকালে দেখছি, বা'জান একবার ফান্দা পাতছিল। একটা বড় আর একটা বাচ্চা কুমির বড়শিতে গাঁথছিল। বড়ডার ঠ্যাংঙ্গে আর ছোডডার প্যাডে।'

চান্দু ও বক্করের চোখ যখন পশ্চিম দিকের বালুচর, লটাবন, আর কাশবনে কুমিরের সন্ধানে ব্যস্ত তখন ফজলের চোখ জরিপ করছে সামনে পুবদিকের একটা বাড়ি। কলাগাছ ঘেরা বাড়িটা এখানো অনেক দূরে।

তার মনে আবার সেই গানের গুঞ্জরন শুরু হয়।

হলুদ শাড়ি-পরা এক তরুণী কলসি কাঁখে নদীর ঘাটে আসছে। দূর থেকে তাকে চেনা না গেলেও ফজল বুঝতে পারে, সে রূপজান ছাড়া আর কেউ নয়।

ফজল জোরে জোরে বৈঠায় টান মারে। কিন্তু ডিঙিটা অনেক দূরে থাকতেই তরুণীটি কলসিতে পানি ভরে বাড়ি চলে যায়। অদৃশ্য হয়ে যায় কলাগাছের আবডালে।

ইস্! আর কিছুক্ষণ আগে যদি সে রওনা দিত! ফজল নিজের ওপর বিরক্ত হয়। আর দশটা মিনিট আগে রওনা দিলেই ঐ বাড়ির ঘাটের কাছে পৌঁছতে পারত সে। দেখা হয়ে যেত রূপজানের সাথে।

BanglaBook.org

কিন্তু দেখা হলেই বা কি করত ফজল ? কি বলত রূপজানকে ? রূপজানই বা তাকে কি বলত ? ফজল বুঝতে পারে—শুধু চোখে চোখে কথা বলা যেত। চাতক-চোখের পিপাসা কি তাতে কমত, না বাড়ত ?

ঠিকমত হাল না ধরায় ডিঙিটা হঠাৎ ঘুরে যাচ্ছিল। ফজল সংবিৎ ফিরে পেয়ে বৈঠার টানে ডিঙিটা সোজা করে। হাল ঠিক রেখে বেয়ে যায় সামনের দিকে।

'তোরা কুমিরের সন্ধান পাইছসনিরে ?' ফজলের মনে কৌতুক, কিন্তু গলার স্বরে কপট গাম্ভীর্য।

'না, এহন কি আর দ্যাহা যাইব।' বক্কর বলে।

'একটা হাঁস আইন্যা কিনারে বাইন্দা থুইলে কেমন অয় ? হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁক শোনলে কুমিরগুলা ভাইস্যা ওঠব খাওনের লেইগ্যা।'

ফজল আর বৈঠা টানছে না এখন। শুধু হাল ধরে বসে থাকে। তার আশা প্রবল বাসনা হয়ে রূপজানের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু সে আর নদীর ঘাটে আসে না।

ডিঙিটা রূপজানদের ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ফজল বৈঠা না টানলে কি হবে। আগা গলুইয়ে বসে বক্করতো টেনেই চলেছে তার বৈঠা। তাকে তো আর বৈঠা টানতে মানা করা যায় না।

ফজল কিছুক্ষণ পর পর ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দিকে তাকায়। তাকাতে গিয়ে তার ঘাড়ে ব্যথা ধরে যায়। কিন্তু রূপজানকে আর ঘাটে আসতে দেখা যায় না।

দিঘিরপাড় পৌঁছতেই পরিচিত লোকজন, বন্ধু-বান্ধব ফজলকে স্বাগত জানায়। কেউ কেউ তাকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধরে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ডাকাতি মামলার এজাহার দিয়ে তাকে হাজতে পাঠানো, জোর করে তালাকনামায় তার টিপ নেয়া, খুনের চরের দখল-বেদখল-পুনর্দখলের ঘটনাবলি, তার বিরুদ্ধে ঘর-পোড়ানো মামলা সাজানোর কারসাজি—সবই তারা শুনেছে। শুনে তাদের মনে সমবেদনা ও সহানুভূতি জেগেছে। কে একজন বলে, 'পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা বড় বাইড়্যা গেছিল। মানুষেরে মানুষ বুইল্লা গিয়ান করে নাই। এইবার ফজল মিয়া ওর মিরদিনা ভাইঙ্গা দিছে। ঘোলাপানি খাওয়াইয়া ঠাণ্ডা করছে।'

দিঘিরপাড়ে চর আর আসুলির জেদাজেদির হা-ডু-ডু খেলার দিন দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে ছিল উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা। তার খেলা দেখে সেদিন তারা চমৎকৃত হয়েছিল। বহুলোক, বিশেষ করে চরের কিশোর-তরুণ-যুবকের দল তার ভক্ত। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। কুচক্রী জঙ্গুরুল্লার হাত থেকে খুনের চর উদ্ধার করার জন্য সবাই তার ওপর খুশি। তারা তার বাহাদুরির প্রশংসা করে। উত্তরের প্রত্যাশা না করে নানা প্রশ্ন করে।

আক্কেল হালদার বাইরে কোথাও গিয়েছিল। এসে ফজলের পরিচয় পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, সমাদরের সাথে তার গদিতে নিয়ে যায়। থালা ভরে হরেক রকম মিষ্টি এনে তাকে আপ্যায়ন করে। খেলার তারিখ দিয়ে কেন সে অনুপস্থিত ছিল তার বৃত্তান্ত সে ফজলকে বলে দক্ষিণপাড় থেকে পাঁচজন নামকরা খেলোয়াড় নিয়ে নৌকা করে ফিরছিল আক্কেল হালদার। পথে তারা গাঙডাকাতের হাতে পড়ে। ডাকাতের ছোরার আঘাতে সে নিজে ও তিনজন খেলোয়াড় আহত হয়।

বিকেল হয়ে গেছে। ফজল চান্দুকে নিয়ে প্রয়োজনীয় সওদাপাতি কিনে নৌকাঘাটায় আসে।

BanglaBook.org

তাদের ডিঙির কাছে দাঁড়িয়ে বক্করের সাথে কথা বলছে একটা লোক। তার মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। চুল উস্কখুস্ক। বিমর্ষ মলিন মুখ। চোখে অসহায় দৃষ্টি। ফজলকে দেখেই লোকটা ডান হাত কপালে ঠেকায়, 'আস্‌সালামালেকুম মিয়াভাই, আমারে চিনছেন নি ?'

'কে ? তুমি হেকমত না ?'

'হ, মিয়াভাই। কেমুন আছেন ?'

'ভালোই আছি। তুমি কেমন আছ ? কইতন আইলা ?'

'আমাগ থাকন আর না থাকন হমান কথা। এহন তো আইলাম হাটেরতন। থাকি অনেক দূরে।'

'কই যাইবা ?'

'বাড়িত্ যাইমু। বাড়ির কাছের একটা নাও-ও পাইলাম না। আমারে এট্টু লইয়া যাইবেন আপনাগ নায় ?'

'তোমার বাড়িতো অনেক দক্ষিণে। আমরা তো ঐ দিগ দিয়া যাইমু না।'

'বেশি দূর যাওন লাগব না। আমারে ধলছত্রের কোণায় নামাইয়া দিলে যাইতে পারমু।'

'আইচ্ছা ওঠ নায়।'

ফজল ও চান্দু নৌকায় ওঠে। তাদের পেছনে ওঠে হেকমত।

'এই চান্দু, এই বক্কর, নাও ছাইড়্যা দে তাড়াতাড়ি।' ফজল তাগিদ দেয়, 'আইজ বাড়িত যাইতে রাইত অইয়া যাইব।'

'হ, উজান বাইয়া যাইতে দেরি তো অইবই।' চান্দু বলে।

উজান স্রোত ভেঙে ছলচ্ছল শব্দ করে ডিঙিটা এগিয়ে চলে।

'মিয়াভাই, আইজ হাটে আপনের খুব তারিফ হোনলাম।' হেকমত বলে। 'মাইনষে কইতে আছিল—অ্যাকটা মর্দের মতো মর্দ। বাপের বাড়া। জঙ্গুরুল্লা ওনার বাপ-দাদার সম্পত্তি খাবলা দিয়া গিল্যা ফালাইছিল। কিন্তু ওরে ঐ সম্পত্তি আর অজম করতে দেয় নাই। প্যাডের মইদ্যেরতন টাইন্যা বাইর করছে।'

কেউ কোনো কথা বলে না অনেকক্ষণ।

নীরবতা ভেঙে এক সময়ে ফজল জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি করো এখন ?'

'কী আর করমু। হগলেই তো জানে আমি কী করি। আপনেওতো জানেন। জানেন না ?'

'হ, শুনছিলাম। কিন্তু এই কাম ছাইড়্যা দিতে পারো না ? হালাল রুজি কইর‍্যা খাওনা ক্যান্ ?'

'হালাল রুজি করনের কি আর উপায় আছে ? আমি এক মহাজনের কাছে বান্দা।'

'মহাজন! কিসের আবার মহাজন ?'

'থইলতদার। কাপড়ে-চোপড়ে ভর্দ লোক, গেরামের সর্মানী লোক। তারেই আমরা কই মহাজন। বড় দাপটের মহাজন ?'

'তার কাছে বান্দা ক্যান্ ?'

'সে অনেক বিত্তান্ত। আমাগ মালপত্র সে সামলাইয়া রাখে। বেইচ্যা যা পায় আমাগ কিছু দ্যায় আর বেবাক ওনার প্যাডে যায়। একবার ধরা পইড়্যা অনেকদিন হাজতে আছিলাম। উনি বোলে ছয়শ ট্যাহা খরচ করছিল আমারে ছাড়াইয়া আনতে। আপনের কাছে গোপন করমু না। হেরপর কত কত চুরি করলাম, কত কত মাল-মাত্তা আইন্যা দিলাম। কিন্তুক ঐ ট্যাহা বোলে শোদই অয় না। দুই-দুই বার পলাইছিলাম। দুইবারই তার পোষা গুণ্ডা দিয়া

BanglaBook.org

ধইর‍্যা নিছে। নিয়া হেইযে কী যন্ত্রণা দিছে কি কইমু আপনেরে। পিঠমোড়া বান দিয়া শরীলে বিছা ছাইড়্যা দিছে, শুঁয়াসম্বল ডইল্যা দিছে, পিডের উপরে বিড়ি নিবাইছে। এই দ্যাহেন—।'

হেকমত গেঞ্জি খুলে পিঠ দেখায় ফজলকে। সারা পিঠে কালো কালো পোড়া দাগ।

'এই দিগে বাড়িত গিয়াও শান্তি নাই। চকিদার-দফাদার খবর পাইলেই দৌড়াইয়া আহে। কয়-ফলনা মারানির পুত, অমুক বাড়িত চুরি করছস। চল থানায়। আমি চর অঞ্চলে এহন চুরি করি না। অথচ কোনোহানে চুরি অইলেই মাইনষে কয়—আর কে করব ? হেকমইত্যার কাম। হের লেইগ্যা বাড়িতেও যাইতে ইচ্ছা করে না। মহাজনও বাড়িত যাইতে দ্যায় না। যদি ফির‍্যা না যাই। চুরির খোঁজ-খবর আননের নাম কইর‍্যা মিছা কতা কইয়া অনেকদিন পরপর বাড়িত যাই। অ্যাকদিনের বেশি থাকি না।'

হেকমত কোমরে লুঙ্গির প্যাঁচে গোঁজা একটা পুটলি বের করতে করতে বলে, 'আমার শরীলের অবস্থাও ভালো না। শুলবেদনায় বড় কষ্ট পাই। বেদ্‌না উঠলেই প্যাডেরে ঘুস দিতে অয়।'

হেকমত পাঁচ আঙ্গুলের মাথা দিয়ে পুঁটলি থেকে এক খাবলা সোডা তুলে বলে, 'এইডা অইল ঘুস। প্যাডেরে ঘুস না দিলে ছাড়াছাড়ি নাই। এক্কেরে কাবিজ কইর‍্যা ফালায়।'

সে সোডা মুখে দিয়ে নদী থেকে আঁজলা ভরে পানি খায়।

ফজল নিবিষ্ট মনে শুনছিল হেকমতের সব কথা। যে হেকমতের কথা মনে এলে ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর কুঁচকে উঠত, সেই হেকমতের জন্য তার বুক ব্যথায় ভরে ওঠে, তার হৃদয়ে দরদ ও সহানভূতি জাগে। সে বেদনা-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হেকমতের দিকে। কথা বলতে পারে না।

অনেকক্ষণ পরে সে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার মহাজন কোথায় থাকে ? কী নাম তার ?'

'নাম দিয়া কি করবেন ? উদ্দার করতে পারবেন আমারে ?'

'দেখি পারি কি না।'

'কিন্তুক বাড়িত্ আইয়া করমু কি ? অ্যাক নল জমিও তো নাই। পারবেন আমারে কিছু জমি দিতে ?'

'তুমি যদি ভালো অইয়া যাও, তয় আমি কথা দিলাম, এই পদ্মার উপরে বইস্যা কথা দিলাম, তোমারে আমি জমি দিমু। এইবার কও কী নাম তোমার মহাজনের।'

'আইজ থাউক, মিয়াভাই। দুই-অ্যাক দিনের মইদ্যে আপনের বাড়িত গিয়া কানে কানে কইয়া আইমু।'

'তোমার থলির মইদ্যে কী ?'

'কয় সের চাউল। চাউল এত মাংগা অইয়া গেল ক্যান, মিয়াভাই ? ট্যাহায় তিন সের। তা-ও আবার চাউলের মইদ্যে ধান আর আখালি।'

'ধলছত্রের কাছে আইয়া পড়ছি।' বক্কর বলে। 'আপনে কোহানে নামবেন ?'

'ঐ সামনের ঢোনে নামাইয়া দ্যান।'

'আন্দারের মইদ্যে যাইতে পরবা তো ?' ফজল জিজ্ঞেস করে।

হেকমত হেসে উঠে বলে, 'আমরাতো আন্দারেরই মানুষ। রাইতের আন্দারই আমাগ পথ দ্যাহায়।'

হেকমতকে নামিয়ে দিয়ে ডিঙিটা খুনের চরের দিকে এগিয়ে যায়। ফজল তাকিয়ে থাকে পেছনের বাঁদিকে, যেদিন দিয়ে যেতে যেতে হেকমত মিশে যায় রাতের অন্ধকারে।

BanglaBook.org

॥ ত্রিশ ॥

চার-পাঁচ দিন আগে কাজের সন্ধানে চরদিঘলি গিয়েছিল জরিনা। সেখানেই সে খবর পায়, জঙ্গুরুল্লার দলকে বিতাড়িত করে এরফান মাতব্বরের দল খুনের চর আবার দখল করেছে।

জরিনার মন নেচে ওঠে আনন্দে। তবে কি ফজল জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছে? জরিনার মনে হয়, সে খালাস পেয়ে এসেছে। সে না হলে চর দখলের এত সাহস আর কার হবে?

কয়েকদিন ধরে জরিনা কাজের সন্ধান করছে। খেয়া নৌকায় পার হয়ে সে ঘুরছে এ চর থেকে সে চর। কিন্তু কোথাও কাজ পায়নি। অধিকাংশ গেরস্তের ঘরে খোরাকির ধান নেই। কেউ বেশি দামের আশায় 'রাখি' করা পাট বেচে, কেউ নিদানের পুঁজি ভেঙে ধান-চাল কিনছে। অনেকেই হাঁস-মুরগি, খাসি-বকরি বিক্রি করে চাল কিনে খাচ্ছে। চালতো নয় যেন রূপার দানা। চারদিন কামলা খেটে এক টাকা পাওয়া যায়। সেই এক টাকা বেরিয়ে যায় তিন সের চাল কিনতে। যাদের ঘরে পুরো বছরের খোরাকির ধান আছে, তারাও টিপে টিপে হিসেব করে চলছে আজকাল। তাদের বউ-ঝিরাই এখন ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানছে। ধান-ভানুনিদের আর প্রয়োজন হয় না তাদের। বেহুদা খরচের দিন আর নেই।

কাজ পাবে না জেনেও জরিনা আজ ভোরেই আবার বেরিয়েছিল। গিয়েছিল বিদগাঁও। বাড়ি বাড়ি ঘুরেও সে কাজ পায়নি। প্রায় সকলের মুখে ঐ এক কথা, 'ধান পাইমু কই? এহন তো চাউল কিন্যা খাইতে আছি। তোমারে কাম দিমু কেম্বায়?'

বিদগাঁও থেকে ধুঁ-ধুঁ দেখা যায় খুনের চর। সেখানে বড় বড় কয়েকটা টিনের ঘরও দেখা যায়। একজনকে জিজ্ঞেস করে জরিনা জেনে নেয়, ফজল মাতব্বর ভাটিকান্দি ছেড়ে খুনের চরে বাড়ি করেছে।

ঠিকই অনুমান করছিল জরিনা, ফজল জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছে। সে-ই আবার দখল করেছে খুনের চর।

জরিনা বিদগাঁর উত্তর-পশ্চিম দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। নদীর কিনারায় বসে থাকা এক জোড়া মানিকজোড় ভয় পেয়ে উড়ে যায়।

জরিনা পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে খুনের চরের দিকে। সেদিকে কোনো খেয়া নৌকা যায় না। খেয়া থাকলে একবার ঘুরে আসতে পারত সে। ফজলের মা এখনো আদর করে তাকে বসতে দেয়। এখনো তাকে বউ বলে ডাকে। ভালো-মন্দ কিছু তৈরি থাকলে খেতে দেয়। অনেক দূর বলে সে-ই যেতে পারে না। এরফান মাতব্বরের মৃত্যুর খবর পেয়ে গিয়েছিল সে। তারপর আর একবারও যাওয়া হয় নি।

মানিকজোড় দুটো সোজা খুনের চরের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

আহা রে! তার যদি পাখা থাকতো পাখির মতো!

হঠাৎ জরিনার মনে হয়, আল্লার দুনিয়ায় পাখিই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী। পাখি হাঁটতে পারে, উড়তেও পারে। কে বলে সব সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষ? মানুষ পাখির মতো উড়তে তো পারেই না, দৌড় দিয়ে ইঁদুরের সাথেও পারে না।

জরিনা বাড়ির দিকে রওনা হয়। খালি হাতে সে যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন বিকেল হয়ে গেছে। শাশুড়ি উঠানে হোগলার ওপর শুয়ে আছে। তার মাথার পাশে পড়ে আছে একটা ছোট কাঁথা। তার ওপর সুই আর সুতা। সে কাঁথা সেলাই করছিল।

জরিনার ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠার সাথে সাথেই আবার মিলিয়ে যায়। একটা নিঃশব্দ বেদনা ঘা দেয় তার বুকে। একটা বংশধরের জন্য শাশুড়ির কত যে আকুতি!

BanglaBook.org

তার বিয়ের পর থেকেই নাজুবিবি অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। তার বহু দিনের আশা পূর্ণ হবে এবার। কিন্তু সে যদি জানত তার আশার বাসায় কোন পাখির ডিম!

জরিনার পায়ের শব্দ পেয়ে নাজুবিবি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। তার দিকে তাকিয়ে সে কিছুটা ক্ষোভের সাথে বলে, 'দিন কাবার কইর‍্যা এহন ফিরছস আবাগীর বেডি! নিজের প্যাট্‌টা বুঝিন তাজা কইর‍্যা আইছস ?'

'কী যে কন আম্মাজান! এই আকালের দিনে কে কার লেইগ্যা রাইন্দা থোয় ?' উষ্মা মেশানো জবাব দেয় জরিনা। সে বুঝতে পারে, খিদের জ্বালায় মেজাজ ঠিক নেই শাশুড়ির। খিদেয় পেট জ্বলছে তারও, মাথা ঘুরছে, ঝাপসা দেখছে চোখে।

কিন্তু ঘরে যে একটা দানাও নেই!

জরিনার কথায় রাগের আভাস পেয়ে নাজুবিবি একটু দমে যায়। সে আবার সুই-সুতা নিয়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে যায়। জরিনা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আছে দেখে সে বুঝতে পারে জরিনার রাগ পড়েনি। শেষে সে-ই যেচে কথা বলে, 'ও মা, মাগো, রাগ অইছস ? তুই রাগ অইলে আমি কই যাইমু ? যেইডারে প্যাডে রাখলাম, বুকের দুধ খাওয়াইলাম, হেইডা তো গেছে অদস্থালে। হেইডায় না দেখল মা-র কষ্ট, না বুঝল বউর দুক্ক। তোরে তো প্যাডে রাহি নাই, বুকের দুধ খাওয়াই নাই। তুই তো আমারে ফালাইয়া যাইতে পারস নাই। তুই কাম কইর‍্যা খাওয়াইতে আছস। তুই না থাকলে কোন দিন মইর‍্যা মাডির লগে মিশ্যা যাইতাম। নিজের মা-ও এতহানি করত না। তুই আমার মা-জননী। আমার কতায় রাগ অইস না, মা। প্যাডের জ্বালায় কি কইতে কি কইয়া ফালাইছি।'

নাজুবিবির কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। তাকে স্নেহময়ী মায়ের মতোই মনে হয় জরিনার। তাই এ নিঃসহায় শাশুড়িকে তার দেখতেই হয়। সে নিজেও বিপন্ন, নিঃসহায়। শাশুড়ির ওপর মাঝে মাঝে তার রাগ হয়। কিন্তু অসহায় বুড়ির জন্য তার হৃদয়ে যে মমতা সঞ্চিত হয়ে আছে, তার স্পর্শে সে রাগ পানি হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই।

'ও মা, মাগো, কতা কস না ক্যান ?' নাজুবিবি কাতর কণ্ঠে আবার বলে।

'কী কইমু ? আইজও কাম পাই নাই। না খাইয়া থাকতে অইব আইজ।'

হঠাৎ জরিনার মনে পড়ে, একটা ডিব্বার ভেতর কিছু খুদ আছে। মুরগির বাচ্চার জন্য সে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চা ফুটবে আর কার উমে ? মোরগ-মুরগি যে একটাও নেই! খোপসহ সব ক'টা সে বিক্রি করে দিয়েছে অভাবের তাড়নায়।

জরিনা ঘরে গিয়ে ডিব্বাটা বের করে আনে। পোয়াখানেক খুদ আছে তাতে। কিন্তু ছাতকুরা পড়ে সেগুলো কালচে হয়ে গেছে।

ডিব্বা খোলার শব্দ পেয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকায় নাজুবিবি। ব্যগ্রতার সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু পাইছস, মা ?'

'হ, দুগ্‌গা খুদ আছে। জাউ রাইন্দা ফালাই।'

'হ, যা রান্দনের ত্বরাত্বরি রাইন্দা ফ্যাল্‌। প্যাডের মইদ্যে খাবল খাবল শুরু অইয়া গেছে।'

জরিনা খুদ ক'টা ধুয়ে চুলো ধরায়। ঘরের চাল থেকে সে গোটা কয়েক লাউয়ের ডগা কেটে নেয়, গাছ থেকে ছিঁড়ে নেয় কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে সন্ধ্যার আগেই খেয়ে নিতে হবে। বেশ কিছুদিন ধরে কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কোনো বাড়িতেই বাতি জ্বলে না আজকাল। সন্ধ্যার পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, নয়তো বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়া—এ ছাড়া অন্ধকারে আর কিছুই করার উপায় নেই।

BanglaBook.org

খাওয়া শেষ করে থালা-বাসন মাজা শেষ না হতেই বেলা ডুবে যায়। দোর-মুখে দাঁড়িয়ে দেশলাই জ্বালে জরিনা। কুপির শুকনো সলতেয় আগুন দিয়ে সে ঘরে সাঁঝ-বাতি দেয়। সন্ধ্যার পরই কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করে।

মাগরেবের নামাজ পড়ে বউ ও শাশুড়ি হোগলার বিছানায় বসে থাকে। কিন্তু অন্ধকারে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। আবার মশারও উৎপাত শুরু হয়েছে।

'মশা গাঙ পাড়ি দিয়া আহে ক্যামনে?' বিস্মিত প্রশ্ন নাজুবিবির। 'আগেতো চর-চঞ্চালে এত মশা আছিল না!'

'মশা আহে মাইনষের লগে লগে।' জরিনা বলে। 'পয়লা পরথম দুই-চাইড্ডা আহে গায়ে বইস্যা, নায়ে চইড়্যা। হেরপর চরেই পয়দা অয় হাজারে হাজার।'

'না গো মা, মশার জ্বালায় আর বইস্যা থাকন যায় না। তুই ত্বরাত্বরি মশারি টাঙাইয়া দে, হুইয়া পড়ি।'

মশারির দুই কোনা টাঙানোই ছিল। অন্ধকারে হাতড়ে জরিনা বাকি দুই কোনা টাঙিয়ে ফেলে। তারপর কপাটে খিল লাগিয়ে সে মশারির ভেতর ঢোকে।

'চাউলের খবর কি, অ্যা মা? দাম কি কমছে?'

'না, দাম আর কমব না।' বসে বসেই জবাব দেয় জরিনা। 'যুদ্দু যদ্দিন আছে, দাম বাড়তেই থাকব। কয়দিন আগে আছিল ট্যাহায় চাইর সের। আইজ হুনলাম তিন সের ভাও।'

'যুদ্দুর লগে চাউলের কোন এমুন দোস্তালি! চাউল ভইর‍্যা কি কামান লাগায় নি?'

'হ কামানই দাগায়।' জরিনা হাসতে হাসতে বলে। 'কামান ফুড়াইতে যদি চাউল লাগত আর চাউল ভইর‍্যা একটা কামান যদি মারত আমাগ বাড়িত্, হে অইলে কী মজাই না অইত!'

'হ, হে অইলে চাউল টোকাইয়া খাইয়া বাঁচতে পারতাম।'

'হোনেন, চাউলের কাহাত পড়ছে ক্যান্। যুদ্দু অইলে অ্যাক দ্যাশের চাউল অন্য দেশে যাইতে পারে না। আগে দ্যাখছেন না পেগু চাউল? আমাগ দেশে চাউলের আকাল পড়লে বর্শা মুল্লুকতন ঐ চাউল আইতো।'

'হ, খালি দেখমু ক্যান্, খাইছিও। ঐ চাউল ভাত অয় গাবের দানার মতন মোডা মোডা।'

'এ পেগু চাউল আর আইতে পারব না।'

'ক্যান?'

'বর্মা মুল্লুক হুনছি জাপান দখল করছে।'

জরিনা শাশুড়ির পাশে অন্য একটা বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

'এই যুদ্দু কি আর থামব না! কী তাম্‌শা শুরু করছে মরার যুদ্দু। চাউল মাংগা, কেরাসিন পাওয়া যায় না।'

'হুনছি, কয়দিন পর চাউলও পাওয়া যাইব না।'

'তয়তো মানুষ মইর‍্যা সাফ অইয়া যাইব!'

'হ বাঁচনের আর আশা ভস্‌সা দেহি না।'

'আমাগ কি অইব? আরেকজন আইতে আছে। তারে ক্যামনে বাঁচইমু।'

জরিনা কোনো কথা বলে না।

'অ্যা মা, চুপ কইর‍্যা আছস ক্যান্? কতা কস না ক্যান?'

'কতা কইতে আর ভাল্‌লাগেনা।'

BanglaBook.org

'তয় ঘুমাইয়া থাক। আমিও দেহি ঘুমাইতে পারি নি।' নাজুবিবি চোখ বুজে ঘুমুবার চেষ্টা করে।

শরীর ভারী হওয়ার পর থেকেই একটা দুশ্চিন্তা জরিনার মনে বাসা বেঁধেছে। একা থাকলে, বিশেষ করে অন্ধকারে শুয়ে থাকলে দুশ্চিন্তাটা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে। বিঁধতে থাকে তার হাড়-পাঁজরায়। শাশুড়ি তো আসমানের চাঁদ ধরবার জন্য 'ডিলকি' দিয়ে রয়েছে। কিন্তু আর একজন ? তার ছেলে ? সে-তো জানে, অমাবস্যা রাতে চাঁদ উঠতেই পারে না।

জরিনা কি করবে ভেবে পায় না। এ বিপদের কথা শুধুমাত্র একজনকেই বলা যায়। সে-ই দিতে পারে পরামর্শ। কিন্তু পরামর্শ দিয়ার আছেই বা কি ? তবুও তার কাছে ভেঙে বললে সে হয়তো একটা কিছু বুদ্ধি দিতে পারে। এই সময়ে, এই মুহূর্তে যদি শোনা যেত হট্টিটির ডাক।

'বাড়িডা দেহি আন্দার! বাড়ির মানুষ কি মইর‍্যা গেছে নি ?'

হেকমতের গলা। জরিনা আঁতকে ওঠে। কাঁটা দিয়ে ওঠে তার সারা শরীর। তার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যায় একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি। সে পায়ের কাছ থেকে কাঁথাটা টেনে নিয়ে শরীরটা ঢেকে দেয়।

খট্-খট্-খট্। কাঠের দরজায় ঘা দিচ্ছে হেকমত।

নাজুবিবি কাশি দিয়ে গলা সাফ করে বলে, 'ক্যাডারে ? হেকমত আইছস নি ?'

'হ, তোমরা হাউজ্যা বেলায় বাত্তি নিবাইয়া হুইয়া পড়ছ!'

'কি করমু ? বাত্তিতে তেল নাই।' নাজুবিবি উঠে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে কপাট খুলে দেয়।

'কে, মা ? তুমি উঠ্ছ ক্যান্, আরেকজন কই ?'

'হুইয়া রইছে। ও মা, ঘুমাইয়া পড়ছস নি ?'

জরিনা চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে।

'ওঠতে কওনা ক্যান্ ? বাত্তি জ্বালাইতে কও।' দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হেকমত বলে।

'বাত্তি জ্বালাইব ক্যামনে ? কইলাম তো কুপিতে তেল নাই।'

'তেল নাই!'

'না, কেরাসিন যে পাওয়া যায় না!'

'কিন্তুক রান্দন তো লাগব। চাউল আনছি।'

'আর কি আনছস

'আর কিছু তো আনি নাই

'তয় খাবি কি দিয়া ?'

'ক্যান, ঘরে নাই কিছু ? আণ্ডা তো আছে দুই-একটা।

'নারে বা'জান, অণ্ডা আইব কইত্তন ? মোরগ-মুরগি তো বেবাক বেইচ্যা খাইছি।'

'ডাইল নাই ?'

'ডাইলও বুঝিন নাই। অ বউ, ডাইল আছে নি ?'

'না। ডাইল তো অনেক দিন ধইর‍্যা নাই। পয়সা পাইমু কই ?' জরিনা শুয়ে শুয়েই জবাব দেয়।

'এহনও হুইয়া রইছে! ওডে না ক্যান্ ? চাউলের মইদ্যে ধান আর আখালি। এগুলারে বাছতে অইব।'

BanglaBook.org

'আন্দারে ক্যামনে বাছমু ?'

'ক্যান্! আন্দারে চুলের জঙ্গল আতাইয়া উকুন বাছতে পারে, আর চাউলের আখালি বাছতে পারব না!' দিনের বেলা হলে হেকমতের মুখ ভ্যাঙচানো দেখতে পেত জরিনা।

'হ পারমু।' নাজুবিবি বলে। 'কিন্তু ভাত খাবি কি দিয়া ? কদুর ডোগা সিদ্দ কইর‍্যা দিলে খাইত্তে পারবি ?'

'দুৎ, দুৎ! খালি কদুর ডোগা কি খাওন যায়! ওরে উঠতে কও দেহি। ঝাঁকিজালডা নামাইয়া দিতে কও। দুইডা খেও দিয়া আহি।'

'জালতো নাই।' জরিনা বলে।

'নাই! বাড়িত আইয়া খালি হুনতে আছি নাই আর নাই।' হেকমত রেগে ওঠে। 'জালডা গেল কই ?'

'দফাদারে লইয়া গেছে। অ্যাকদিনের লেইগ্যা কইয়া নিছিল। অ্যাক মাস পার অইয়া গেছে। এহনও দিয়া যায় নাই।'

'হায়রে আল্লাহ! কিয়ের লেইগ্যা বাড়িত্ আইলাম ?'

একটু থেমে হেকমত বলে, 'মাছ রাহনের জালিডা আছে তো ? না হেইডাও নাই ?'

'হেইডা আছে।'

'বাইর কইর‍্যা দে জলদি। দেহি, আতাইয়া কয়ডা গইদ্যা বাইল্যা ধরতে পারি নি।'

'এই আন্দার রাইতে ক্যামনে যাবি, বা'জান ?'

'আমাগ আন্দারে চলনের আদত আছে। আন্দারে কি আমাগ আটকাইতে পারে ? আর একটু পর চানও ওড্‌ব। দুই রাইত আগেইতো গেছে পূন্‌নিমা।'

জরিনা অন্ধের মতো হাতড়াতে মাছ রাখার জালটা খুঁজে পায়।

'এই যে ধরুক।' জরিনা হাত বাড়িয়ে জালটা হেকমতের হাতে দেয়।

জালের সাথে লাগানো লম্বা সুতলির অন্য প্রান্ত কোমরের তাগায় বাঁধতে বাঁধতে হেকমত বলে, 'আমি গেলাম। চাউল বাইচ্ছা ভাত চড়াইয়া দে।'

'ত্বরাত্বরিই আইয়া পড়িস, বা'জান।' নাজুবিবি বলে।

কোনো কথা না বলে আবছায়ার মতো সরতে সরতে হেকমত আঁধারে মিশে যায়। থলে থেকে কুলায় অল্প অল্প করে চাল ঢেলে অন্ধকারে ধান আর কাঁকর বাছতে শুরু করে বউ আর শাশুড়ি।

'ধানের খুইর মইদ্যে কি আখাইল ভইর‍্যা থুইছিল নি আল্লায় ?' নাজুবিবি বলে।

জরিনা অন্য কিছু ভাবছিল। শাশুড়ির কথার শেষটুকু শুধু তার কানে যায়। সে বলে, 'আম্মাজান কি কইলেন ?'

'কইলাম, আল্লায় কি ধানের খুইর মইদ্যে আখালি ভইর‍্যা থুইছিল ? হেইয়া না অইলে চাউলের লগে আখালি আইল কইত্তন ?'

'আল্লায় ভরব ক্যান ? চাউলের দাম তো বেশি। হের লেইগ্যা ধান আর আখালি মিশাইয়া ওজন বাড়াইছে।'

'দ্যাখ, মানুষ কেমুন জানোয়ার অইয়া গেছে।'

'এক জানোয়ার কি আরেক জানোয়াররে এম্বায় ঠকাইতে পারে ?'

'উঁহু নাতো! ঠিকই ধরছস। জানোয়ারের মইদ্যে ঠকাঠকির কারবার তো নাই! মানুষ তো দ্যাখতে আছি জানোয়ারেরও অধম অইয়া গেছে।'

BanglaBook.org

'আমার বা'জান কইত, ভালো মানুষ হগল জানোয়ারের থিকা ভালো। আর খারাপ মানুষ খারাপ জানোয়ারের থিকাও খারাপ।'

'হ, কতাডা ঠিকই কইত তোর বা'জান। নে মা, ত্বরাত্বরি আত চালা। ও আবার আইয়া পড়ব।'

জরিনা হাত চালাতে চালাতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার আজ মহাবিপদ। রাত পোহালে কি হবে? রাতের অন্ধকারে তাকে দেখতে পায়নি হেকমত। কিন্তু রাত পোহালেই তাকে দেখে সব বুঝতে পারবে সে।

'ও বউ, ও মা, ও আইলেই কুন্তু সুখবরডা দিতে অইব। ও হুনলে যা খুশি অইব!'

দুশ্চিন্তার অথই দরিয়ায় ডুবে আছে জরিনা। শাশুড়ির কথা সে শুনতে পায় না।

'ও বউ, চুপ মাইর‍্যা রইছস ক্যান?' নাজুবিবি হাত দিয়ে ঠেলা দেয় জরিনার হাতে। 'কী কইছি, হোনছস? ওরে সুখবরডা দিলে ও যা খুশি অইব!'

জরিনার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। সে বলে, 'না, এত হবিরে কওনের দরকার নাই। চান ওঠলে দ্যাখতেই পাইব।'

'উঁহু ওরে কইতেই অইব। তুই এহন আর ঢেঁকির কাম করতে পারবি না। তোরে আর ঐ কাম করতে দিমু না। ওরে কইমু বেশি কইর‍্যা ট্যাহা দিয়া যাইতে।'

'কত ট্যাহাই দ্যায় আপনের পোলা! মনে করছেন ট্যাহার থলি বুঝিন লইয়া আইছে।'

নাজুবিবি লজ্জিত হয়। সে কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

জরিনা আবার বলে, 'আপনের কওনের কোনো দরকার নাই। যা কওনের আমিই কইমু। আপনে গিয়া হুইয়া থাকেন। চাউল আর বাছন লাগব না। আমি রাইন্দা-বাইড়্যা আপনেরে ডাক দিমু।'

'আবারও খাইতে ডাক দিবিনি? খাইছি তো অ্যাকবার।'

'ঐ খাওন কি প্যাড ভরছে? আবারও খাইবেন আপনের পোলার লগে।'

'আইচ্ছা, আমি তয় হুইয়া থাকি গিয়া। ভাত-সালুন রান্দা অইলে আমারে ডাক দিস।'

নাজুবিবি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। জরিনা চুলা ধরিয়ে তার ওপর পানি সমেত ভাতের পাতিল বসিয়ে দেয়। চুলার ভেতর ঘাস-পাতা জ্বলছে। সামান্য সে আলো তার কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। সে দু'জনের ভাতের চাল মেপে, সেগুলো তাড়াতাড়ি কলসির পানিতে ধুয়ে ঢেলে দেয় পাতিলের মধ্যে।

চুলার কাছে আলোয় বসে থাকতে তার কেমন ভয় ভয় লাগে। সে ঘরে গিয়ে একটা ছেঁড়া শাড়ি নিয়ে আসে। সেটাকে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে আবার বসে চুলার ধারে। এবার সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করে।

জরিনা ভাবে, হেকমতকে কোনো রকমে খাইয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করা যেত!

এই রাতের অন্ধকারেই তাকে যে করে হোক বিদায় করতে হবে। সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় তার চোলায় শক্ত হয়, মুষ্টিবদ্ধ হয় দুটি হাত।

কৃষ্ণ তৃতীয়ার চাঁদ পূর্বদিগন্ত ছেড়ে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। ফিকে হয়ে এসেছে অন্ধকার।

জরিনা হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'কে, কে, কেডা অইখানে? কতা কয় না ক্যান?'

'কে, কেডাগো? ও বউ।' নাজুবিবি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে।

BanglaBook.org

জরিনা মশারির কাছে গিয়ে নিচু গলায় শাশুড়িকে বলে, 'টচলাইট জ্বালাইয়া কারা যেন আইতে আছিল। আমি কে কে করছি পর টচ নিবাইয়া দিছে। চইল্যা গেছে না হুতি দিয়া আছে কইতে পারি না। টচের আলোতে দ্যাখলাম তিন-চার জোড়া ঠ্যাঙ। ঠ্যাঙ্গে বুটজুতা। আবছা মতন পাগড়িও দ্যাখলাম মাতায়।'

'তয় কি পুলিস?'

'পুলিস ছাড়া আর পাগড়ি মাতায় দিব কে? আপনের পোলা বাড়িত্ আইছে, এই খবর পাইছে। মনে অয় ধরতে আইছে।'

'ও আল্লাহ্, কী অইব এহন! শান্তিতে দুইডা ভাতও খাইতে দিব না।'

'এহনতরি আইল না। আইলে কাইশ্যা বনে পলাইয়া থাকতে কইমু। রান্দা অইলে আমি গিয়া খাওয়াইয়া আইমু।'

'হ, এইডাই ভালো বুদ্ধির কাম। ওইখানতনই চইল্যা যাইতে কইয়া দিস।'

'হ কইয়া দিমু।'

ভাত রান্না হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নাজুবিবি লবণ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে গরম গরম ভাত খেয়ে হেকমতের জন্য কিছুক্ষণ হা-হুতাশ করে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ে।

হেকমত এখনো আসছে না কেন, বুঝতে পারে না জরিনা। সত্যিই কি পুলিস এসে গেছে খবর পেয়ে? ওত পেতে আছে কোথাও? তাই দেখেই কি পালিয়ে গেছে হেকমত?

সে আর আসবে না আজ—জরিনার মনে এ বিশ্বাস চাড়া দিয়ে উঠতেই তার দুশ্চিন্তা কেটে যায়, বন্য খুশিতে নেচে ওঠে মন।

ঈষৎ ক্ষয়ে যাওয়া গোলাকার চাঁদটা এখন ঠিক মাথার ওপর। রাত দুপুর পার হয়ে গেছে। নাজুবিবি এক ঘুম দিয়ে উঠে বাইরে আসে। চার দিকে তাকায়। জোছনার ঘোলাটে আলোয় দূরের গাছ-পালা বাড়ি-ঘর অস্পষ্ট দেখা যায়। সে ডাকে, 'ও বউ, ও মা, কই তুমি?'

জরিনা রসুইঘরের বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। শাশুড়ির ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে সে বলে, 'এই তো আম্মাজান, আপনের পোলাতো এহনো আইল না।'

'ওর কি অইল, আল্লা মালুম। মনে অয় পুলিস দেইখ্যা পলাইয়া গেছে।'

একটু থেমে সে আবার বলে, 'ও মা, ওরে পুলিসে ধইর‍্যা লইয়া যায় নাই তো? তোর কি মনে অয়?'

'কিছুই তো বোঝতে পারলাম না।'

'আইচ্ছা, গাঙ্গে তো কুমির থাকে।'

হঠাৎ নাজুবিবি ডুকরে কেঁদে ওঠে। ইনিয়ে-বিনিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে শুরু করে, 'ও আমার বা'জান রে। তোরে না জানি কুমিরে খাইয়া ফালাইছেরে। ও আমার বা'জান রে, ৫-৫!'

নাজুবিবির কান্নায় শেষ রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। জরিনার বুকটাও হঠাৎ বোবা বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। বুকটায় তোলপাড় তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার দুচোখ থেকে অশ্রু ঝরে দরদর ধারায়।

BanglaBook.org

॥ একত্রিশ ॥

খুনের চরের মারামারিতে হেরে যাওয়ায় জঙ্গুরুল্লার সম্মানের হানি হয়েছে অনেক। ফজলের বিরুদ্ধে ঘর পোড়ানো মামলার কারসাজি বানচাল হয়ে যাওয়ায় আরো খোয়া গেছে তার মান-সম্ভ্রম। সে খেলো হয়ে গেছে, মিথ্যাচারী বলে প্রমাণিত হয়েছে আইনের মানুষদের কাছে। স্রোতের তোড়ে তলা ক্ষয়ে যাওয়া নদীর পাড়ের মতো তার প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত ক্ষয়ে গেছে। তার নামের শেষের স্বনির্বাচিত সম্মানসূচক পদবি আর কারো মুখে উচ্চারিত হয় না আজকাল। বরং সহাস্যে উচ্চারিত হয় তার নামের আগের বিশেষণটি।

জঙ্গুরুল্লা তার কীর্তিধর পা দুটোকে পরিচর্যার জন্যই শুধু একটা চাকর রেখেছে। সে লোকজনের সামনে কাছারি ঘরে গিয়ে বসলেও চাকরটি গিয়ে তার পা টিপতে শুরু করে। লোকজনকে সে বোঝাতে চায় তার পায়ের মূল্য। এ পা সোনা দিয়ে মুড়ে রাখবার ক্ষমতা আছে তার। ফরমাশ দিয়ে এক জোড়া সোনার জুতা বানিয়ে পরলে কেমন হয়? জঙ্গুরুল্লা মাঝে মাঝে ভাবে। তা হলে *'সোনা-পাইয়া'* বা ও রকম সুন্দর একটা বিশেষণ তার নামের আগে যুক্ত হয়ে যাবে।

জঙ্গুরুল্লা চেয়ারে বসে পদসেবার জন্য পা দুটো চাকরের কোলের ওপর রেখে আজকাল প্রায়ই চিন্তার অলিগলিতে বিচরণ করে। ভাবে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের কথা :

...খুনের চরটা আবার দখল করতে হবে। মাসখানেক পরে তার কোলপাড়কদের রোপা আমন ধান পাকবে। তার আগেই ওটা দখল করতে হবে। ব্যর্থ হলে তার হারানো প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ফিরে আসবে না। পীরবাবার খানকাশরিফ আর বাড়ির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। পীরবাবা এলে নতুন বাড়িতে তার বসবাসের সুব্যবস্থা করতে হবে। আরশেদ মোল্লার সাথে কথা বলে শুভ দিন ধার্য করে শুভ কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু আরশেদ মোল্লাকেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। খুনের চর থেকে চুবানি খেয়ে সে যে কোথায় চলে গেছে, তা কেউ বলতে পারে না। বাড়িতে সে নাকি কিছু বলে যায়নি। জামাইর হাতের চুবানি খেয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করেনি তো? আত্মহত্যা করলেও অসুবিধে নেই। ওর বিধবাকে আরো সহজে পথে আনা যাবে। আর কিছুদিন পরেই আসতে শুরু করবে দাদনের ধান। ঐ ধান মজুদ করার জন্য গুদাম তৈরি করতে হবে। দুটো টিনের ঘর কেনা হয়েছে। ওগুলোর টিন দিয়ে তৈরি করতে হবে গুদাম। বড় দারোগা বড় কড়া লোক। সে তার ওপর বড় খাপ্পা। তাকে কিছুতেই বশ করা গেল না। তাকে যদি অন্য থানায় বদলি করানো যেত। থানার দারোগা হাতে না থাকলে কোনো কিছুতেই সুবিধে করা যায় না, কোনো কাজে সফল হওয়া যায় না।

জঙ্গুরুল্লার সব চিন্তার বড় চিন্তা—কি ভাবে ফজলকে জব্দ করা যায়। তার সব কাজের বড় কাজ—কোন্ ফিকিরে ওকে আবার জেলে ঢোকানো যায়।

হঠাৎই একটা সুযোগ পেয়ে যায় সে। সুযোগ নয়, সে এক মহাসুযোগ। এ যেন রূপকথার মোহরভরা কলসি। হাঁটতে হাঁটতে তার ঘরে এসে হাজির।

পীরবাবা ভাগ্যকূল এসেছেন—খবর পায় জঙ্গুরুল্লা। তাঁকে আবার কোন মুরিদ দখল করে ফেলে তার কি কোনো ঠিক আছে? এটাও চর দখলের মতোই দুরূহ কাজ।

খবর পাওয়ার পরেই দিনই মোরগের বাকের সময় সে পানসি নিয়ে ভাগ্যকূল রওনা হয়। পানসি বাওয়ার জন্য তিনজন বাঁধা আছে—একজন হালী ও দু'জন দাঁড়ী। এছাড়াও অতিরিক্ত দু'জন দাঁড়ী সে সাথে নেয়। যাওয়ার সময় উজান ঠেলে যেতে হবে। বছরের এ

BanglaBook.org

সময়ে বাতাস কম। তাই পাল না-ও খাটতে পারে। হয়তো সবটা পথ দাঁড় বেয়ে, গুন টেনে যেতে হবে।

পানসিতে উঠেই জঙ্গুরুল্লা ওজু করে ফজরের নামাজ পড়ে। নামাজের শেষে হাত উঠিয়ে সে দীর্ঘ সময় ধরে মোনাজাত করে। মোনাজাতের মধ্যে সে আল্লার কাছে অনেক কিছু প্রার্থনা করে। অনেক কিছুর মধ্যে দুটো ব্যাপারে সে বারবার পরম দয়ালু আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করে, '...ইয়া আল্লাহ, এরফান মাতব্বরের পোলা ফজলরে শায়েস্তা করার বুদ্ধি দ্যাও, শক্তি দ্যাও, সুযোগ দ্যাও। ইয়া আল্লাহ, থানার বড় দারোগা আমার উপরে বড় রাগ, বড় খাপ্পা। ইয়া আল্লাহ্, তারে অন্য থানায় বদলি কইর‍্যা দ্যাও। রাব্বানা আতেনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাও ওয়াকেনা আজাব আন্‌নার। আমিন।'

জঙ্গুরুল্লা খাস খোপ থেকে বেরিয়ে ছই-এর সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

ফরসা হয়ে গেছে চারদিক। রক্তরাঙা গোলাকার সূর্য দিগ্বলয় ছাড়িয়ে উঠে গেছে। শিশির-ভেজা ধানের শিষ আর কাশফুল মাথা নুইয়ে ভোরের সূর্যকে প্রণাম করছে, স্বাগত জানাচ্ছে। ঝিরঝিরে বাতাসের স্পর্শে শিহরিত রূপালি পানি কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। উজান ঠেলে, ভাটি বেয়ে বিভিন্ন মোকামের ছোট বড় নানা গড়নের খালি বা মালবোঝাই নৌকা চলাচল করছে। দুটো গাধাবোট টেনে নিয়ে একটা লঞ্চ উত্তরের বড় নদী দিয়ে পুবদিকে যাচ্ছে।

জঙ্গুরুল্লার পানসি গুনগাঁর খাঁড়িতে ঢোকে। কেরামত হাল ধরে আছে। বাকি চারজন টানছে দাঁড়। কুলোকেরগাও বাঁয়ে রেখে, ডাইনগাঁও ডানে রেখে পানসিটা উত্তর-পশ্চিম কোনাকুনি বড় নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গুরুল্লা ডান দিকে তাকায়। ডাইনগাঁয়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। সে আবার বাঁ দিকে তাকায়। কুলোকেরগাঁও বড় হচ্ছে পলি পড়ে।

সামনে ডানদিকে বেশ কিছু দূরে দুটো চিল শূন্যের ওপর মারামারি খামচাখামচি করতে করতে নিচে পড়ে যাচ্ছে। ও দুটো পানিতেই পড়ে যাবে মনে হয়। কিন্তু গায়ে পানি লাগার আগেই একটা চিল রণে ভঙ্গ দিয়ে উড়ে পালায়। তার পিছু ধাওয়া করে অন্যটা। কিছুদুর পর্যন্ত তাড়া করে বিজয়ী চিলটা ফিরে যায় পাড়ের কাছের সেই জায়গাটায়।

কেরামতের চোখের সামনেই ঘটছে চিলের মারামারি। সে উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে চিল দুটোর গতিবিধি।

চিলটা পানির ওপর তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি ফেলে চক্কর দিচ্ছে আর ছোঁ মারার জন্য তাওয়াচ্ছে। মনে হয় এখনি ছোঁ মারবে। হটে যাওয়া চিলটা ওখানেই যাচ্ছে আবার। বিজয়ী চিলটা আবার ওটাকে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে যায় সে জায়গায়।

কেরামত ঠিক বুঝতে পারে না, নদীতে এত জায়গা থাকতে দুটো চিলেরই রোখ ঐ এক জায়গায় কেন? মাছের খনি আছে নাকি ওখানে?

জায়গাটার কাছাকাছি পশ্চিম দিক দিয়ে এখন যাচ্ছে পানসিটা।

চিলটা ছোঁ মারে হঠাৎ। নখরে বিঁধিয়ে কী নিয়ে উঠছে ওটা? আরে, একটা জাল যে! জালের একটা মাছওতো বিঁধে আছে নখরে!

'হুজুর দ্যাহেন দ্যাহেন চাইয়া দ্যাহেন চিলের কাণ্ড!' বিস্মিত কেরামত এক নিশ্বাসে বলে।

জঙ্গুরুল্লা দেখে, একটা চিল জালের মাছ নখরে বিঁধিয়ে জালসহ ওপর দিকে পাখা ঝাপটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। জালের এক প্রান্তে বাঁধা সুতলির কিছুটা ওপরে উঠে গেছে

BanglaBook.org

জালের সাথে। সুতলির আর এক প্রান্ত নিশ্চয়ই পানির নিচে কোনো কিছুর সাথে বাঁধা আছে—ভাবে জঙ্গুরুল্লা। তাই জালটা ওপরে টেনে তুলতে পারছে না চিলটা। জালের ভেতর কয়েকটা মাছও দেখা যাচ্ছে। বিতাড়িত চিলটা এদিকে আসছে আবার। ওটা জালের মাছের ওপর থাবা দেয়ার উপক্রম করতেই দখলদার চিলটা জালসহ মাছ ছেড়ে দিয়ে ওটার পেছনে ধাওয়া করে। জালটা ধপ করে পানিতে পড়ে যায়।

'এই কেরা, নাও ভিড়া জলদি। জালডা কিয়ের লগে বান্দা আছে, দ্যাখন লাগব।'

কেরামত ও দাঁড়ীরা সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে জঙ্গুরুল্লার দিকে তাকায়।

'আরে চাইয়া রইছস ক্যান ? ত্বরাত্বরি কর।'

কেরামত নৌকা ঘুরিয়ে কিনারায় জালটার কাছে নিয়ে যায়।

স্রোতের টানে জালটা ডুবে যাচ্ছে, আবার ওটার এক প্রান্ত ভেসে উঠছে কিছুক্ষণ পরপর। কয়েকটা মরা পেট-ফোলা মাছ চিৎ হয়ে আছে জালের মধ্যে।

'এই কেরা, কিনারে নাও বাইন্দা রাখ। ভালো জাগায় বান্দিস। পাড় ভাইঙা যেন না পড়ে।'

কেরামত পাড়া গেড়ে নৌকা বাঁধে কিনারায়।

'এই কেরামত, পানিতে নাম। জালের সুতলি ধইর‍্যা ডুব দেয়। দ্যাখ জালডা কিয়ের লগে বান্দা।'

কেরামত গামছা পরে পানিতে নেমে বলে, 'এই ফেকু, তুইও আয়। একলা ডর করে।'

কিয়ের ডর, অ্যা ব্যাডা! এহন ভাটা লাগছে। বেশি নিচে যাওন লাগব না।'

ফেকুও গামছা পরে পানিতে নামে। জালের সুতলি ধরে দুজনেই ডুব দেয়। একটু পরে গোতলাগুতলি করে দু'জনই ভেসে ওঠে। ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে কেরামত বলে, 'একটা মানুষ!'

জঙ্গুরুল্লা এটাই অনুমান করেছিল। সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, 'মানুষ! কেরে মানুষটা ? মাথাডা উডাইয়া দ্যাখ দেখি।'

'আমার ডর লাগে।' কেরামত বলে।

'দুও ব্যাডা। কিয়ের আবার ডর ?'

নৌকার বাকি তিনজন তাজু, মেছের ও নূরবক্সকে নাম ধরে ডেকে বলে, 'তোরা তিনজনও পানিতে নাম। বেবাকে মিল্যা মাথাডা উপরে উডা। কিন্তু সাবধান। লাশটা যেমুন অবস্থায় আছে তেমুনই রাইখ্যা দিতে অইব। বেশি লাড়াচাড়া দিলে স্রোতে টাইন্যা লইয়া যাইব গা।'

দাঁড়ী তিনজন পানিতে নামে।

'মাথাডা কুনখানে আছে আগে আতাইয়া ঠিক কইর‍্যা ল।'

কোমর-পানিতে দাঁড়িয়ে তারা আলগোছে লাশের মাথাটা উঁচু করে।

'আরে! এইডা দেহি হেকমইত্যা চোরা!' তিন-চারজন এক সাথে কলবল করে ওঠে।

'হেকমইত্যা চোরা! ওর বাড়ি কই ?' জঙ্গুরুল্লা জিজ্ঞেস করে।

'এইতো কাছেই পুবদিগে, নয়াকান্দি।' নূরবক্স বলে।

'ওর বাড়িতে কে আছে ?'

'আছে ওর মা আর বউ। আর কেও নাই। কাইল বিয়ালে ওরে দিঘিরপাড় দেখছিলাম। ফজল মাতবরের লগে তার নায় উইট্টা বাড়িত গেল।'

BanglaBook.org

জঙ্গুরুল্লার মনে হঠাৎ খুশির বান ডাকে। আনন্দের আতিশয্যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। আর মনে মনে আল্লার শোকরগুজারি করে। আজই ভোরে মাত্র কিছুক্ষণ আগে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করে সে মোনাজাত করেছিল। যে ওজু করে সে মোনাজাত করেছিল সে ওজু নষ্ট হওয়ার আগেই তার মোনাজাত কবুল হয়েছে পরম দয়ালু আল্লার দরবারে। এত তাড়াতাড়ি এত তদ্‌নগদ আল্লা তার মকসেদ পুরা করবে সে তা ভাবতেই পারেনি।

জঙ্গুরুল্লা তার মনের উল্লাস মনেই চেপে রেখে বলে, 'এই নূরবক্স, তুই ঠিক দ্যাখছস তো ? ঐ নায় আর কে কে আছিল ?'

'আর আছিল নাগরার চরের চান্দু। আর একজনরে চিনি নাই।'

'ওগ আর কে কে দ্যাখছে ?'

'ঐ সময় দিঘিরপাড় নৌকা ঘাডে যারা আছিল, অনেকেই দ্যাখছে।'

'তোরা বোঝতে পারছস ঘটনাডা কি ?'

সবাই তার মুখের দিকে তাকায়।

'ঘটনাডাতো আয়নার মতন পরিষ্কার। খুন কইর‍্যা ঐখানে ফালাইয়া গেছে।'

'খুন! কারা খুন করছে ?' বিস্মিত প্রশ্ন সকলের।

'হেইডাও বুঝলি না ? নূরবক্স কি কইল ? কারা ওরে নায়ে কইর‍্যা লইয়া গেছিল ?'

ওরা পানি থেকে নৌকায় উঠতেই জঙ্গুরুল্লা বলে, 'আরে তোরা উইঠ্যা গেলিনি। এই ফেকু, তুই আবার পানিতে নাম। জালডা মনে অয় কোমরে বান্দা আছে। জালডা খুইল্যা আন। মাছগুলা ফালাইয়া দে।'

ফেকু ডুব দেয়। জালের সুতলি ধরে ধরে নিচে যায়। কিন্তু সুতলিটা যেখানে গিঁঠ দিয়ে বাঁধা সেখানে তার হাত যায় না। গিঁঠটা উপুড়-হয়ে-পড়ে-থাকা লাশটার পেটের দিকে তাগার সাথে। ভয়েই সে আর ওদিকে হাত বাড়ায় না। সে ওপরে উঠে দম নিয়ে আবার ডুব দেয়। দাঁত দিয়ে সুতলিটা কেটে সে জালটা তুলে নিয়ে আসে। মাছগুলোকে জঙ্গুরুল্লার নির্দেশ মতো সে স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

জঙ্গুরুল্লা চারদিকে তাকায়। দূর দিয়ে দু-একটা নৌকা যেতে দেখা যায়। ধারে কাছে কেউ নেই। একটু পরেই লোকজনের ভিড় জমে যাবে।

'ও তাজু, ও ফেকু, তোরা পাড়ে নাইম্যা থাক।' জঙ্গুরুল্লা নির্দেশ দেয়। 'তোরা পাহারা দিবি। আরেকটু পরে খবর পাইয়া মানুষজন আইস্যা ভিড় জমাইব। খবরদার, কাউরে পানিত্ নামতে দিবি না। আমরা থানায় খবর দিতে যাইতে আছি। পুলিস আইয়া লাশ উডাইব।'

গলা খাদে নামিয়ে সে আবার বলে, 'তোরা শোন, চিলের কথা, জালের কথা কিন্তু কারো কাছে কইবি না, খবরদার!'

তাজু ও ফেকু নৌকা থেকে কিছু মুড়ি ও বাতাসা নিয়ে নেমে যায়। পানসিটা রওনা হয় হেকমতের বাড়ির দিকে। পথ চিনিয়ে নিয়ে যায় নূরবক্স।

রাত না পোহাতেই জরিনাকে নিয়ে নাজুবিবি হেকমতের খোঁজে এলাকার চৌকিদারের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু চৌকিদার কোনো খোঁজই দিতে পারেনি। ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ গলা খাঁকারি শুনে তারা হকচকিয়ে যায়।

'কে আছে বাড়িতে ?' অপরিচিত ভারী গলায় জিজ্ঞেস করছে কেউ।

'এইতো আমরা আছি। কেডা জিগায় ?' নাজুবিবি পাল্টা প্রশ্ন করে।

BanglaBook.org

নূরবক্স পা চালিয়ে নাজুবিবির কাছে যায়। নিচু গলায় সে জঙ্গুরুল্লার পরিচয় দেয়।

'ও, পা-না-ধোয়া...'

'চুপ, চুপ!' নূরবক্স মুখে আঙুল দিয়ে সতর্ক করে দেয় নাজুবিবিকে। 'কও চদরী সাব।'

'আহেন চদরী সাব।' নাজুবিবি সাদর আহ্বান জানায়।

জঙ্গুরুল্লা এসে উঠানে দাঁড়ায়।

জরিনা পিঁড়ি এনে শাশুড়ির হাতে দেয়। সে ওটা পেতে দিয়ে বলে, 'গরিবের বাড়িত্ হাতির পাড়া। বহেন চদরী সাব।'

'না বসনের সময় নাই। তুমিই হেকমতের মা?'

'হ, হেকমতের কোনো খবর লইয়া আইছেন?'

'হ।'

'কি খবর? জলদি কইর‍্যা কন। আমরা তো চিন্তায় জারাজারা অইয়া গেছি।'

খবর শোনার পরের পরিস্থিতিটা আঁচ করতে পারে জঙ্গুরুল্লা। সে বলে, 'খবর পরে অইব। তুমি আর তোমার পুতের বউ চলো আমাগ লগে নৌকায়। থানায় যাইতে অইব।'

'থানায়! ওরে কি থানায় বাইন্দা লইয়া গেছে?'

'পরেই শুনতে পাইবা। এহন তোমরা তৈরি অইয়া লও জলদি।'

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাজুবিবি ও জরিনা জঙ্গুরুল্লার পানসিতে উঠে বসে।

সরু একটা সোঁতা দিয়ে কিছুদূর ভাটিয়ে পানসিটা গুনগাঁর খাঁড়িতে গিয়ে পড়ে। জঙ্গুরুল্লার নির্দেশে ডানদিকে মোড় নিতেই বাঁদিকে লোকজনের ভিড় দেখা যায়।

দুঃসংবাদটা আর চেপে রাখা ঠিক নয় ভেবে জঙ্গুরুল্লা বলে, 'হেকমতের মা, তোমরা মনেরে শক্ত করো। যা অইয়া গেছে তার লেইগ্যা কান্দাকাড়ি করলে আর ফায়দা অইব না।'

'ক্যান্, কি অইছে? আমার হেকমত বাঁইচ্যা নাই? ও আমার বাজানরে।' নাজুবিবি ডুকরে কেঁদে ওঠে।

'শোন, কাইন্দ না। তোমার পোলারে মাইর‍্যা পানির মইদ্যে গুঁজাইয়া থুইয়া গেছে।'

নাজুবিবি এবার গলা ছেড়ে বিলাপ করতে শুরু করে দেয়, 'ও আমার হেকমতরে বাজান্। তোরে কোন নির্বইংশায় মাইর‍্যা থুইয়া গেছে রে, বা'জানরে আ-মা-া-র।...'

জরিনা স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে ফুকরে কাঁদতে পারে না। মাথায় লম্বা ঘোমটা না থাকলে দেখা যেত তার দুগাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে তার গলা ও বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে।

'শোন হেকমতের মা, আর কাইন্দা কি করবা? কাইন্দা কি আর পুত পাইবা?' নাজুবিবির বিলাপ মাঝে মাঝে থামে। আর থামার সাথে সাথেই এক সাথে অনেক অশ্রু ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। কিছুক্ষণ পর বুকের ভেতরটা আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। বুকের ব্যথা অসহ্য হতেই সে আবার শুরু করে দেয় বিলাপ।

জঙ্গুরুল্লা তার বিলাপের বিরতির অপেক্ষায় থাকে। তার বিলাপ থামতেই জঙ্গুরুল্লা বলে, 'কে মারছে আমরা জাইন্যা ফালাইছি। সাক্ষীও পাইছি।'

'ও আমার বেসাতরে, আমা-া-ার। তোরে না যেন্ কে না যেন্ মাইর‍্যা থুইয়া গেছেরে, তার কইলজা ভরতা কইর‍্যা খাইমুরে বাজা-া-ান আমা-া-ার। বংশের চেরাগ প্যাডে থুইয়া ক্যামনে চইল্যা গেলি, বা'জানরে আমা-া-ার।...'

পানসিটা ঘটনাস্থলে এসে থামে। লোকজন নৌকার মাথির কাছে এসে ভিড় করে। তারা নানা প্রশ্ন করে জঙ্গুরুল্লাকে। কারো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধু বলে, 'নয়াকান্দির হেকমতরে খুন কইর‍্যা ঐখানে পানির মইদ্যে গুঁজাইয়া থুইয়া গেছে।'

BanglaBook.org

'কে ? কে ? কে খুন করছে ? এক সাথে অনেক লোকের প্রশ্ন।

'হেইডা পুলিসে বাইর করব। তোমরা কিন্তু পানিতে নাইম্যা না। লাশে আত দিও না। পুলিস আইয়া লাশ উডাইব। আমরা থানায় যাইতে আছি। তোমরা দুইজন দাঁড় টানার মানুষ দিতে পারবানি ? ত্বরাত্বরি যাওন লাগব। উচিত পয়সা দিমু, খাওন দিমু। আবার বকশিশও দিমু।'

ভিড়ের মাঝ থেকে চার-পাঁচজন হাত উঁচিয়ে নৌকায় কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। তাদের মাঝ থেকে দু'জনকে বেছে নেয় জঙ্গুরুল্লা।

সে নাজুবিবির দিকে ফিরে বলে, 'ও হেকমতের মা, ঐ যে দেইখ্যা লও। তোমার পোলারে মাইর‍্যা ঐ খানে গুঁজাইয়া থুইছে। পুলিস আইয়া না উডাইলে দ্যাখতে পাইবা না।'

নাজুবিবি বিলাপ করতে করতে দাঁড়ায়। তার হাত ধরে দাঁড়ায় জরিনাও। পানির নিচে যেখানে লাশ রয়েছে সেদিকে তাকিয়ে নাজুবিবি আরো জোরে বিলাপ করতে শুরু করে।

আর দেরি করা ঠিক নয়। জঙ্গুরুল্লার নির্দেশে পানসি দিঘিরপাড়ের দিকে রওনা হয়। সেখান থেকে আরো সাক্ষী যোগাড় করে যেতে হবে থানায়।

ভাটি পানি, তার ওপর চার দাঁড়ের টান। পানসিটা ছুটে চলে।

হেকমতের মা ও বউকে তার খাস খোপে বসিয়ে জঙ্গুরুল্লা তালিম দেয়, থানায় গিয়ে কি বলতে হবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই তারা দিঘিরপাড় নৌকাঘাটায় গিয়ে পৌঁছে। খাস খোপ থেকে বেরুবার আগে জঙ্গুরুল্লা নাজুবিবি ও জরিনাকে আর একবার সাবধান করে দেয়, 'কি কইছি, কানে গেছে তো ? যেম্বায় যেম্বায় কইয়া দিছি, হেম্বায় হেম্বায় কইবা। আমিতো ওয়াদা করছিই, ঠিকঠিক মতন কাম ফতে অইলে কুড়ি নল জমি দিমু তোমাগ। কুড়ি নলে অনেক জমি, পরায় এগারো বিঘা। তোমরা ঠ্যাঙ্গের উপ্‌রে ঠ্যাঙ দিয়া রাজার হালে থাকতে পারবা। আর যদি উল্ডা-পাল্ডা কও, বোঝলানি, তয় আর তোমাগ আল্লিও অ্যাকখানও বিচরাইয়া পাওয়া যাইব না, কইয়া দিলাম।'

জঙ্গুরুল্লা পানসি থেকে নামে। ঘাটের পুবদিকে একটা লঞ্চ দেখা যায়। ওটার পাশেই রয়েছে একটা পানসি। ঘাটের এক পান-বিড়ির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে সে জানতে পারে, ঐ *'কুত্তা জাহাজে'* জেলার পুলিস সাব গতকাল দিঘিরপাড় এসেছেন। মূলচরের এক বাড়িতে কয়েক দিন আগে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদের হাতে তিনজন খুনও হয়েছে। সেই মামলার তদন্তের তদারক করতে এসেছেন জেলার পুলিস সাব। থানার বড় দারোগাও এসেছেন।

এটাও আল্লার মেহেরবানি বলে মনে করে জঙ্গুরুল্লা। থানা পর্যন্ত তাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না।

জঙ্গুরুল্লা ঘাটমাঝির সাথে কথা বলে। সে-ও মাতব্বরের সাথে ডিঙিতে চড়ে হেকমতকে যেতে দেখেছে গতকাল বিকেল বেলা। খোঁজ করে এরকম আরো দু'জন সাক্ষী পাওয়া যায়।

ব্যস। আর দরকার নেই। জঙ্গুরুল্লা তিনজন সাক্ষীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা একজনকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়।

গতকাল দুপুরের পর থেকেই তদন্তের তদারক শুরু করেছেন জেলার পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট। মামলার দু'জন প্রধান সাক্ষীকে গতকাল পাওয়া যায়নি। আজ ভোরেই তাদের জবানবন্দি শুনে তিনি তাঁর তদারকের কাজ শেষ করেন।

BanglaBook.org

বেলা প্রায় দশটা। সশস্ত্র পুলিস-প্রহরী-বেষ্টিত পুলিস সুপার এবং তার পেছনে বড় দারোগা ও স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য লোক লঞ্চের দিকে আসছেন। তাঁরা লঞ্চের কাছে আসতেই নাজুবিবি হাত জোড় করে কান্না-জড়ানো কণ্ঠে বলে, 'হুজুর আমি ইনসাফ চাই। আমার পোলারে খুন কইর‍্যা ফালাইছে।'

সে আর কিছু না বলে বিলাপ করতে শুরু করে দেয়। বড় দারোগা এগিয়ে এসে নাজুবিবিকে বলেন, 'এই বুড়ি সরো, সরো, সরে দাঁড়াও সামনে থেকে। আমিই তোমার নালিশ শুনব একটু পরে।'

পুলিস সুপার বাধা দিয়ে বলেন, 'ওয়াজেদ, লেট হার স্পীক। ও বুড়ি, কি হয়েছে বলো।'

নাজুবিবি কাঁদতে কাঁদতে কি বলছে সবটা বুঝতে পারেন না পুলিস সুপার। জঙ্গুরুল্লা নাজুবিবির পাশেই ছিল জরিনাকে নিয়ে। সে নাজুবিবির হয়ে কথা বলতেই পুলিস সুপার বলেন, 'হু আর ইউ ? আপনি কে ?'

'আমার নাম জঙ্গুরুল্লা চৌধুরী। আমি চরের মাতব্বর।'

'আচ্ছা, বলুন কি হয়েছে।'

জঙ্গুরুল্লা ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করে।

জঙ্গুরুল্লার কাছ থেকে কিছুটা শুনেই পুলিস সুপার বুঝতে পারেন—হেকমত নামের একটা লোককে ফজল নামের কোনো লোক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে এবং তার লাশ পানির নিচে লুকিয়ে রেখে গেছে। তিনি বড় দারোগাকে ডাকেন, 'ওয়াজেদ, দিস ইজ আ কেস অব কাল্‌প্যাব্‌ল হোমিসাইড। তুমি এদের নিয়ে লঞ্চে ওঠো। লঞ্চের কেবিনে বসেই এজাহার নেবে। আমি কেসটা সুপারভাইস করে ওখান থেকেই চলে যাব। তোমার নৌকা লঞ্চের সাথে বেঁধে দাও।'

মাঝিকে তার পানসিটা লঞ্চের সাথে বাঁধবার নির্দেশ দিয়ে নাজুবিবি ও জরিনাকে নিয়ে বড় দারোগা লঞ্চে ওঠেন।

জঙ্গুরুল্লা হাতের ইশারায় কেরামতকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে তিনজন সাক্ষী নিয়ে লঞ্চে ওঠে। তাদের দেখে বড় দারোগা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস কনে, 'এরা কারা ?'

'ওরা সাক্ষী।'

বড় দারোগা জঙ্গুরুল্লার কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। এ ব্যাপারটায় তার উৎসাহ-উদ্যোগ দেখে তার সন্দেহ জাগে। তিনি বলেন, 'ওদের আমার পানসিটায় উঠিয়ে দিন। আর আপনি সারেং এর কাছে গিয়ে বসুন। তাকে আপনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।'

শিকলে-বাঁধা উত্তেজিত কুকুরের মতো। 'ঘঁউ-ঘঁউ-ঘঁউৎ' শব্দে সিটি বাজিয়ে লঞ্চ রওনা হয়।

এজাহার নেয়ার আগে বড় দারোগা লঞ্চের দু'নম্বর কেবিনে বসে প্রথমে নাজুবিবি ও পরে জরিনাকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘটনার বর্ণনায় মৃত হেকমতের মা যে বিবরণ দিচ্ছে, তার সাথে একেবারেই মিল খাচ্ছে না মৃতের স্ত্রীর বিবরণ। তিনি পুলিস সুপারের কেবিনে গিয়ে বলেন, 'স্যার আসল ঘটনাটা কী, বুঝতে পারছি না। শাশুড়ি বলছে এক রকম আর বউ বলছে আর এক রকম। দু'রকম ঘটনা পাচ্ছি।'

'কি রকম ?'

'মা বলছে—গতকাল সন্ধ্যার কিছু পরে সের কয়েক চাল নিয়ে হেকমত বাড়ি যায়। তার কিছুক্ষণ পরই এরফান মাতব্বরের ছেলে ফজল মাতব্বর ও আরো দু'জন হেকমতকে ডেকে নিয়ে যায়। ছেলের জন্য ভাত রান্না করে সে আর তার ছেলের বউ সারারাত জেগে প্রতীক্ষা

BanglaBook.org

করে। কিন্তু সে আর ঘরে ফেরেনি। ভোরে লোকজনের কাছে খবর পায়, গুনগাঁর খাঁড়ির মধ্যে হেকমতের লাশ পড়ে আছে। আর বউ বলছে—হেকমত গতকাল সন্ধ্যার কিছু পরে সের তিনেক কাঁকর-মেশানো চাল নিয়ে বাড়ি আসে। ঘরে ভাতের সাথে খাওয়ার কিছু না থাকায় সে একটা মাছ রাখার জাল নিয়ে শুধু হাতে গর্তের বেলে মাছ ধরার জন্য নদীতে যায়। বউ আর শাশুড়ি চালের কাঁকর বেছে ভাত রান্না করে বসে থাকে সারা রাত। কিন্তু হেকমত আর ঘরে ফিরে আসে না। ভোরে জঙ্গুরুল্লা এসে বউ আর শাশুড়িকে তার পানসিতে তুলে গুনগাঁর খাঁড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে সে একটা জায়গা দেখিয়ে বলে, হেকমতকে কারা খুন করে ঐ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে।'

'হেকমতকে কে মার্ডার করেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলছে বউটা ?'

'না স্যার। সে জানে না, এমন কি সন্দেহও করে না, কে তার স্বামীকে মার্ডার করেছে।'

'ঐ যে চৌধুরী, কি চৌধুরী যেন নাম ?'

'জঙ্গুরুল্লা চৌধুরী। কিন্তু লোকে বলে, পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা।'

'পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা! সেটা আবার কি রকম নাম ?'

'চৌধুরী খেতাব নিজে নিয়েছে। আগে নাকি সে অন্যের জমিতে কামলা খাটত। সে সময়ে এক বিয়ের মজলিসে পা না-ধুয়ে ফরাসের ওপর গিয়ে বসেছিল। আর তাতে পায়ের ছাপ পড়েছিল ফরাসে। সেই থেকে তার নাম হয়েছে পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা।'

'ভেরী ইনটারেস্টিং। পা-না-ধোয়া লঞ্চে এসেছে তো ?'

'হ্যাঁ স্যার। লোকটা মিথ্যা মামলা সাজাতে ওস্তাদ।'

'ডাকো তাকে।'

জঙ্গুরুল্লা এসে পুলিস সুপার জিজ্ঞেস করেন, 'কি মিয়া চৌধুরী, মামলাটা সাজিয়ে এনেছেন, তাই না ?'

'না হুজুর, সাজাইয়া আনমু ক্যান!'

'শাশুড়ি বলছে—হেকমতকে ফজল মাতব্বর ঘর থেকে ডেকে নিয়ে মার্ডার করেছে। আর বউ বলেছে, সে হাতিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সে বলতে পারে না, কে তার স্বামীকে মার্ডার করেছে।'

তালিম দেয়ার সময় বউটা চুপচাপ ছিল। এত সাবধান করা সত্ত্বেও, এত ভয় দেখানো সত্ত্বেও সে তার নিজের ইচ্ছে মতো যা-তা আবোল-তাবোল বলেছে। জঙ্গুরুল্লার ভেতরটা জ্বলে ওঠে রাগে। মনের আক্রোশে মনেই চেপে সে বলে, 'হুজুর, ঐ ফজল আছিল বউডার পরথম সোয়ামি। তার লগে এখনো ওর পিরিত আছে। ওর লগে যুক্তি কইর‍্যাই ফজল হেকমতরে খুন করছে।'

'অ্যাঁ তাই ?'

'হ, হুজুর, ঐ মাগিডারেও অ্যারেস্ট করন লাগব। ফজলের নৌকায় কাইল হেকমতরে দ্যাখা গেছে। সাক্ষীও আছে।'

'কোথায় সাক্ষী ?'

'হুজুর, এইখানেই আছে। ডাক দিমু তাগো ?'

'হ্যাঁ, তাদের ডেকে নিয়ে আসুন।'

সারেংকে পথের নির্দেশ দিয়ে ঘাট-মাঝি ও আরো দু'জন সাক্ষীকে জঙ্গুরুল্লা এনে হাজির করে।

BanglaBook.org

এক এক করে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিস সুপার নিজে। তিনজন সাক্ষীই বলে, তারা ফজল, চান্দু ও বক্করের সাথে হেকমতকে নৌকায় করে বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে। তারা আরো বলে—হেকমত সিঁদকাটা দাগি চোর। সে যে দাগি চোর তা থানার রেকর্ডে আছে বলে বড় দারোগাও জানান।

পুলিস সুপারের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন, বাড়ি যাওয়ার জন্য হেকমত দিঘিরপাড় থেকে ফজলদের নৌকায় ওঠে। পথের কাঁটা সরাবার এটাই সুযোগ মনে করে ফজল ওকে চুরির বা অন্য কিছুর প্রলোভন দেখায়। হেকমত রাজি হয়ে চাল রেখে আসার জন্য বাড়ি যায়। ওর ফিরে আসতে দেরি দেখে ফজল ওর বাড়ি গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসে। তরপরই এ হত্যা। তিনি বড় দারোগাকে নাজুবিবির কথা মতো এজাহার নেয়ার আদেশ দেন।

লঞ্চ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পুলিস সুপার ও বড় দারোগা কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখেন, পাড়ে বহু লোকরে ভিড়। এ-চর ও-চর থেকে বহুলোক হেঁটে, নৌকা করে জমায়েত হয়েছে।

ভিড়ের মাঝ থেকে কয়েকজন বলে ওঠে, 'উই যে পাও দ্যাহা যায়।'

এখন পুরো ভাটা। লাশের দুটো পায়ের পাতা জেগে উঠেছে।

'ঐ হানে ধানখেতের মইদ্যে একটা কালা গঞ্জি পইড়্যা রইছে।' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে কয়েকজন।

বড় দারোগা দু'জন সেপাই নিয়ে পাড়ে নামেন। জঙ্গুরুল্লাও নামে তাদের সাথে। ধানখেতের এক ধানছোপের ওপর পাওয়া যায় দলামুচড়ি করা একটা কালো গেঞ্জি। ওটার প্যাঁচ ছাড়িয়ে কাগজের একটা ছোট পুটলিও পাওয়া যায়। পুটলির ভেতর কিছু সাদা গুঁড়ো।

বড় দারোগা গুঁড়োর কিছুটা দুই আঙুলে তুলে ডলা দিয়ে চেনবার চেষ্টা করছেন জিনিসটা কি। তার চেনার আগেই ভিড়ের মাঝ থেকে কয়েকজন বলে, 'ওগুলা খাওইন্যা সোডা। শূলবেদনার লেইগ্যা হেকমত খাইত।'

ওগুলো দেখে পুলিস সুপারের ঠোঁটের কোণে কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তিনি তাঁর কথায় রসান দিয়ে বলেন, 'খুবই ভালো আলামত। খুনিদের তো বেশ বিবেক-বিবেচনা আছে হে। কি বলো ওয়াজেদ?'

'জ্বী স্যার। গেঞ্জি আর সোডা ভিজে নষ্ট হতে দেয়নি খুনিরা। কষ্ট করে গেঞ্জিটা খুলে যত্ন করে রেখে দিয়েছে।' কৌতুকের হাসি তারও মুখে।

'এ বিবেক-বিবেচনার জন্য খুনিদের পুরস্কার পাওয়া উচিত, কি বলো?'

'জ্বী স্যার, অবিশ্যি পাওয়া উচিত।'

বড় দারোগার নির্দেশে দু'জন কনস্টেবল ও একজন মাঝি পানিতে নামে। কোমর সমান পানি। পা, বুক ও পেটের তলায় হাত দিয়ে তারা লাশটা ওপরে তুলবার চেষ্টা করে। পা থেকে বুক পর্যন্ত সহজেই ওপরেই উঠছে। কিন্তু মাথার দিকটা বেশি উঠছে না। হাত দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে তারা বুঝতে পারে, একটা হাত পাড়ের মাটির ভেতর ঢুকে আছে। পানিতে জাবড়ি দিয়ে একজন পা ধরে ও দু'জন হাত ধরে জোরে টান দিতেই হাতটা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। লাশটা ওপর দিকে তুলতেই দেখা যায়, ওর দৃঢ়মুষ্টির ভেতর একটা পেট-গলে-যাওয়া মরা বেলে মাছ।

'খুন অইছে ক্যাডা কয়? ব্যাডাতো গদে আত দিছিল।' ভিড়ের মাঝ থেকে একজন বলে।

BanglaBook.org

'আরে হ খুনই অইছে। আজরাইলে খুন করছে।' আর একজন বলে।

'হ ঠিকই, গদের মইদ্যেরতন আজরাইলে আত টাইন্যা ধইর‍্যা রাখছিল।' অন্য একজন বলে।

'আহারে, বাইল্যা মাছ ধরতে আইয়া ক্যামনে মানুষটা মইর‍্যা গেল। কার মরণ যে ক্যামনে লেইখ্যা থুইছে আল্লায়, কেও কইতে পারে না।' আফসোস করে আরো একজন বলে।

পুলিস সুপার বড় দারোগাকে নিয়ে পানসিতে নেমে কাছে থেকে লাশ ওঠানো দেখছিলেন। লোকজনের কথাবার্তা তাঁর কানে যায়। তিনি মনে মনে বলেন, 'লোকগুলো ঠিকই বলছে, সঠিক রায়ই দিয়েছে।'

লাশটাকে তুলে পানসির আগা-গলুইয়ে পাটাতনের ওপর রাখা হয়।

দু'জন পুলিস অফিসারই তন্নতন্ন করে দেখেন লাশের কোথাও আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

হঠাৎ কোমরের তাগায় বাঁধা এক টুকরো সুতলি দেখতে পান বড় দারোগা।

'স্যার এই দ্যাখেন। এইটের সাথে বাঁধা ছিল মাছ রাখার জালটা। বউটা ঠিকই বলেছিল, মাছ রাখার জাল নিয়ে হেকমত হাতিয়ে বেলে মাছ ধরতে গিয়েছিল।'

'ইয়েস, ইউ আর রাইট। বেলে মাছের জন্য লোকটা গর্তে হাত দিয়েছিল। পানি আর বাতাসের চাপে *'চোক্‌ড'* হয়ে যাওয়ায় সে আর হাতটা টেনে বার করতে পারেনি। ভেরি ভেরি আনফরচুনেট! মনে হয়, ও যখন জোর করে হাত বার করার চেষ্টা করছিল তখন মুঠোর চাপে মাছটার পেট গলে যায়। মরা মাছটা *'ডেথক্লাচ'*-এর ভেতর আটকে থাকে ডিউ টু ক্যাডাভেরিক স্প্যাজ্‌ম্‌।'

'জ্বী স্যার। মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স-এ পড়েছি।'

বড় দারোগা নিচুস্বরে আবার বলেন, 'স্যার এইবার জালটা উদ্ধারের চেষ্টা করতে হয়। মনে হয় সুতলিটা কেটে জালটা কেউ নিয়ে নিয়েছে বা ফেলে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাই মনে হয়। ডাকো চৌধুরীকে। তাকে এবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করো।'

'চৌধুরী গেলেন কোথায় ?' বড় দারোগা হাঁক দেন। 'এদিকে আসুন জলদি।'

সবাই এদিক-ওদিক তাকায়।

'আরে! পা-না-ধোয়া চৌধুরী গেল কোথায় ?' বড় দারোগা চারদিকে তাকান।

ভিড়ের লোকজন এতক্ষণে বুঝতে পারে, বড় দারোগা কোন লোকের খোঁজ করছেন। তারা সবাই জঙ্গুরুল্লার খোঁজ করে। কিন্তু তাকে আর ধারে-কাছে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভিড়ের ভেতর থেকে দু-একজন গালাগাল দিয়ে বলে, 'হালার ভাই হালায় পলাইছে।'

ততক্ষণে জঙ্গুরুল্লার পানসি এসে পৌঁছে। বড় দারোগা পানসি তল্লাশি করে ডওরার এক খোপ থেকে মাছ রাখার জালটা উদ্ধার করেন।

পুলিস সুপার বলেন, 'এটা পরিষ্কার ইউ.ডি.কেস। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে লোকটার। তুমি সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করো। কিন্তু পোস্ট মর্টেম না করে মাটি দেয়া যাবে না। পা-না-ধোয়া চৌধুরীকে ২১১ ধারায় প্রসিকিউট করার ব্যবস্থা করো। এ কেসের জন্যই লাশাটার ময়না তদন্ত হওয়া দরকার। নয় তো লাশটা মাটি দেয়ার অর্ডার দিয়ে যেতে পারতাম। তুমি লাশটা সাবডিভিশনাল হসপিটালে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

BanglaBook.org

একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'চৌধুরীর মাঝি-মাল্লা আর ঐ বুড়িকে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করো। ওদের ধমক দিয়েই জঙ্গুরুল্লার সব কারসাজি বেরিয়ে পড়বে।'

পুলিস সুপার লঞ্চে ওঠেন।

লঞ্চটা 'ঘঁউ-ঘঁউ-ঘঁউৎ' সিটি বাজিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

॥ বত্রিশ ॥

খুনের চর থেকে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরেই বিছানা নিয়েছিল আরশেদ মোল্লা। অপমানের গ্লানির চেয়ে ভবিষ্যতের ভাবনা তাকে আরো বেশি মুসড়ে দিয়েছিল।

বেঢকচরে বিঘা সাতেক জমি ছিল তার। গত বর্ষার আগের বর্ষায় বিঘা তিনেক পদ্মার জঠরে বিলীন হয়ে গেছে। বাকি চার বিঘা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গত বর্ষায়। খুনের চরে জঙ্গুরুল্লা তাকে কুড়ি নল—প্রায় এগারো বিঘা জমি দিয়েছিল। অনেক আশা নিয়ে সে রুয়েছিল কনকতারা ধান। সেই চরও বেদখল হয়ে গেছে। বসতভিটা ছাড়া আর এক কড়া জমিও তার নেই। এদিকে চালের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে যে কোথায় যাবে, কি করবে, কি খাবে তার কুল-কিনারা করতে পারছিল না, বাঁচবার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

সোনাইবিবিই শেষে তাকে একটা পথের সন্ধান দেয়। তার সাবেক মনিব ল্যাম্বার্ট সায়েব হয়তো এখনো আছেন নারায়ণগঞ্জে। তাঁর কাছে গেলে তিনি হয়তো তাঁর কুঠিরে বা পাটের গুদামে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন।

আশা-নিরাশায় দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আরশেদ মোল্লা নারায়ণগঞ্জ চলে গেছে আজ দশ দিন। এখনো সে ফিরে আসছে না কেন বুঝতে পারে না সোনাইবিবি।

সন্দেহের দোলায় দুলছে তারও মন। সায়েব কি তাদের এ দুর্দিনে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন? কোনো সাহায্যই কি করবেন না?

সায়েব ও মেমসায়েব দু'জনই তাকে খুব স্নেহ করতেন। মালীর মেয়ে বলে এতটুকু ঘৃণা বা অবজ্ঞা করতেন না। তাঁদের চোখের সামনেই সে বড় হয়ে উঠছিল। খঞ্জন পাখির মতো সে লাফিয়ে বেড়াত সারা বাড়ি। দোলনায় দোল খেত। তাঁদের পোষা ময়নার সাথে কথা বলত। ফুল-পাতা ছিঁড়ে ফুলদানি সাজাত। কলের গান বাজাত। তার বিয়েতে তাঁরা অনেক টাকা খরচ করেছিলেন। বরকে যৌতুক দিয়েছিলেন নগদ দু'হাজার টাকা।

সোনাইবিবির স্পষ্ট মনে আছে, চাঁদ রায়-কেদার রায়ের কীর্তি রাজবাড়ির মঠ যেদিন পদ্মার উদরে বিলীন হয়ে যায়, তার ঠিক চারদিন আগে আরশেদ মোল্লা তাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল বেহেরপাড়া। তার চোখের সামনেই সে মঠটা কাত হয়ে নদীতে পড়তে দেখেছে। পড়ার সাথে সাথে বিশাল উত্তাল ঢেউ উঠেছিল। মঠবাসী হাজার হাজার পাখি উড়ছিল আর আর্তচিৎকার করছিল।

তার বছর তিনেক পর তার মা চন্দ্রভানের মৃত্যুর খবর পেয়ে সে স্বামীর সাথে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে শুনতে পায় ল্যাম্বার্টদের একমাত্র সন্তান স্টিফেন বাপ-মায়ের সাথে রাগ করে উড়োজাহাজে চাকরি নিয়েছিল। উড়োজাহাজ চালিয়ে সাগর পাড়ি দেয়ার সময় সে সাগরে ডুবে মারা গেছে। একটা অব্যক্ত বেদনায় সোনাভানের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

BanglaBook.org

দুবছরের রূপজানকে কোলে নিয়ে সোনাভান মেমসায়েবের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনি শিশুটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ওকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তক্ষুনি ড্রাইভার পাঠিয়ে ওর জন্য দোকান থেকে দামি-কাপড় ও খেলনা আনিয়েছিলেন। ওর মুখে শরীরে পাউডার লাগিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছিলেন। নতুন ফ্রক পরিয়ে তাকে কোলে নিয়ে গিয়েছিলেন সায়েবের ঘরে। অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে বলেছিলেন, 'মা, সোনাই, তোর মেইয়াটা আমাকে দিয়া দে। আমি পালবো। আমার তো আর কেউ নাইরে, মা!'

সোনাভান চুপ করে ছিল। শোকার্ত মায়ের অন্তরের আকুতিকে সে মুখের ওপর 'না' বলে রূঢ় আঘাত হানতে পারেনি। মেমসায়েব তার মুখ দেখে ঠিকই বুঝেছিলেন, তার মৌনতা সম্মতির বিপরীত লক্ষণ। তাই এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'তোর সোয়ামিরে লইয়া কাল ভোরে আমার সঙ্গে দেখা করিস।'

সোনাভান আশঙ্কা করেছিল, আগামীকালও এই একই প্রস্তাব আসতে পারে। প্রস্তাবের সাথে আসতে পারে অনেক টাকার প্রলোভনও। আরশেদ মোল্লা যে রকম টাকার লোভী, সে কিছুতেই এ সযোগ পায়ে ঠেলে দেবে বলে তার মনে হয়নি। তাই সে স্বামীর কাছে কিছুই বলেনি। তাকে তাড়া দিয়ে সেদিনই রাতের স্টিমারে রওনা দিয়ে পরের দিন তারা রাজবাড়ি স্টেশনে এসে নেমেছিল।

মেমসায়েব তার এ অবাধ্য আচরণে নিশ্চয়ই খুব রুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিল সোনাভান। তাঁর মনে পুষে রাখা সে রাগ কি এতদিনেও মরে যায়নি?

তারও সাত-আট বছর পর আর একবার সে স্বামীকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিল তার বাপের মৃত্যুর সময়। সেবার সে রূপজানকে সাথে নিয়ে যায়নি। এমন কি সায়েবের কুঠিতেও যায়নি। যেমন চুপিচুপি গিয়েছিল তেমনি চুপিচুপি তারা আবার ফিরে এসেছিল। তার মনে সব সময় একটা ভয় ছিল—মেমসায়েব হয় তো রূপজানকে নিজের কাছে রাখার জন্য জোরাজুরি করবেন।

তারপর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। সেদিনের সোনাভান বয়সের ভারে এখন সোনাইবিবি হয়েছে। সে হিসেব করে দেখে রূপজানকে নিয়ে মেম সায়েবের কাছ থেকে চলে আসার পর ষোল বছর পার হয়ে গেছে। সায়েব-মেম বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন, নারায়ণগঞ্জে আছেন, না বিলেত চলে গেছেন—কোনো খবরই তারা রাখে না।

স্বামীর ফিরে আসতে দেরি দেখে সোনাইবিবিরি মনে হয়, সায়েব ও মেম দু'জনই বা তাদের একজন অন্তত বেঁচে আছেন এবং নারায়ণগঞ্জেই আছেন। তাঁদের কেউ না থাকলে আরশেদ মোল্লার এত দেরি হওয়ার কথা নয়। সে তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে আসত।

এদিকে জঙ্গুরুল্লা রোজ দু'বার—সকালে ও বিকেলে লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্ছে, আরশেদ মোল্লা ফিরে এসেছে কিনা। প্রথম দিন কোরবান ঢালী এসেছিল চার-পাঁচজন লোক নিয়ে। তাদের সে কি হম্বি-তম্বি। তারা আরশেদ মোল্লাকে না পেয়ে জঙ্গুরুল্লার হুকুমে তার মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সোনাইবিবি ঘোমটার আড়াল থেকে কথার আঘাত মেরে তাদের এমন ধুনে দিয়েছিল যে তারা মা-বোনদের মর্যাদাহানিকর কোনো কথা বলতে আর সাহস পায়নি তারপর।

জঙ্গুরুল্লার লোক রোজই জানতে চায়, আরশেদ মোল্লা কোথায় গেছে। একমাত্র সোনাইবিবিই জানে সে কোথায় গেছে। কিন্তু সে একই কথা বলে তাদের বিদেয় করে, 'কই গেছে বাড়িতে কিচ্ছু কইয়া যায় নাই।'

BanglaBook.org

দু'দিন আগে এদের কাছেই সোনাইবিবি শুনেছে—জঙ্গুরুল্লা ভাগ্যকূল গেছে। সেখান থেকে পীরবাবাকে নিয়ে সে দু-এক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। পীরবাবা এসে গেলেই রূপজানের সাথে তাঁর বিয়ের শুভকাজটা সম্পন্ন করার জন্য জঙ্গুরুল্লা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে।

কিন্তু পীরবাবার জাদু-টোনায় কোনো কাজই যে হয়নি, কোনো আছরই যে পড়েনি রূপজানের ওপর! পীরের কথা সে শুনতেই পারে না। ফজল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছে এবং খুনের চর আবার দখল করেছে শুনে সে যে কী খুশি হয়েছে, তা তার চলনে-বলনে স্পষ্ট বোঝা যায়। সে আজকাল বিনা সাধাসাধিতেই খায়-দায়-ঘুমায়, মাথা আঁচড়ায়, সাজগোজ করে।

বারো দিন পর বাড়ি ফিরে আসে আরশেদ মোল্লা। আসে সারা মুখে খুশির জোছ্না মেখে। সায়েব-মেম দু'জনেই বেঁচে আছেন এবং ভালো আছেন, কিন্তু বেশ বুড়িয়ে গেছেন। সে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে শোনে, সায়েব-মেম দু'জনেই কলকাতা গেছেন। তাঁদের আসার অপেক্ষায় ছিল বলেই তার বাড়ি ফিরতে এত দেরি হয়েছে। কুঠিতে আগেকার বাবুর্চি-খানসামারাই কাজ করছে এখনো। তাদের সাথেই সে ছিল এ ক'দিন। নিতাইগঞ্জের দুটো গুদাম ছাড়া ল্যাম্ব্যার্ট জুট কোম্পানীর সবগুলো গুদাম এখন মিলিটারির দখলে। তারা সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধের রসদ মজুদ করেছে। সোডা-ওয়াটার কারখানাটা দেড় বছর ধরে বন্ধ। ম্যানেজার নাকি অনেক টাকা মেরে নিয়ে উধাও হয়েছে।

'আমারে দেইখ্যা, সায়েব-মেম পরথর চিনতেই পারে নাই।' আরশেদ মোল্লা বলে।

'চিনব ক্যামনে?' সোনাইবিবি বলে। 'তহনতো ওনার দাড়ি আছিল না। দাড়ির লেইগ্যা চিনতে পারে নাই।'

'হ ঠিকই। নাম বললাম পর তারা এত খুশি অইছে যে কি কইমু! জানো, আমাগ বিচরাইতে সায়েব মানুষ পাডাইছিল বেহেরপাড়া। তারা ফিরত গিয়া সায়েবরে কইছে, বেহেরপাড়া নামে একটা গেরাম আছিল। হেই গেরাম এহন পদ্মার প্যাডের মইদ্যে। গেরামের মানুষ কে যে কুনখানে গেছে কেউ কইতে পারে না।'

'হ, ঠিক অইত, বেহেরপাড়ারতন গেলাম চাঁচরতলা, হেইখানতন চাকমখোলা। তারপর আইলাম এই নলতা। এতবার গাঙ্গে ভাঙলে মাইনষে বিচরাইয়া পাইব ক্যামনে?'

'তারা রূপুর কথা বারবার জিগাইছে। রূপু কত বড় অইছে। যহন বললাম, ওর বিয়া দিয়া দিছি, তহন দুইজনের কী রাগ! মেমসাহ কয়—আমারে এট্টু খবরও দিলি না, নিমকহারাম। কার লগে বিয়া দিছস? যহন কইলাম, বড় একজন মাতবরের পোলার লগে বিয়া দিছি। জামাই নিজেই এহন মাতবর, তহন রাগটা এট্টু কমছে। মেমসাব আরো কইছে—বিয়ার খবর পাইলে ওর বিয়ার খরচ-পাত্তি সোনা-গয়না আমিই দিতাম। রূপুরে আর জামাইরে বেড়াইতে যাইতে কইছে। ওগ যাওনের ভাড়া দুইশ ট্যাহা দিয়া দিছে। ওরা গেলে মনে অয় অনেক ট্যাহা-পয়সা দিব, সোনা-গয়না দিব।'

'ইস্। মাইনষের কী লোভ। কিন্তুক মিথ্যা কতা কইয়া আইছে ক্যান? মাইয়ার তালাক লইছে, হেই কতা ক্যান্ কয় নাই?'

'হোন রূপুর মা, তোমারে তো কই নাই। রূপুরে মাতবর বাড়ি দিয়া আইমু—এই ওয়াদা কইর‍্যা আইছিলাম খুনের চর ছাইড়্যা দিয়া আহনের সময়। তুমি কাইল ওরে লইয়া যাইও মাতবর বাড়ি। বিয়াই বাঁইচ্যা থাকলে আমিই যাইতাম।'

BanglaBook.org

'কিন্তুক তালাক লওয়া মাইয়া ক্যামনে আবার দিয়া আইমু ?'

'হোন, জোর কইর‍্যা তালাক নিছিলাম। ঐ তালাক জায়েজ অয় নাই। আমি মুনশি-মৌলবিগ জিগাইছিলাম।'

'কিন্তু পা-না-ধোয়া গোঁয়ারডা কি এমনে এমনে ছাইড়্যা দিব! হে পীরবাবারে আনতে গেছে। লইয়াও আইছে মনে অয়। দিনের মইদ্যে দুইবার ওনার খবর লইতে আছে তার মানুষজন। আরেট্টু পরেই আবার আইয়া পড়ব।'

'হোন, আমি ঘরের মইদ্যে পলাইয়া থাকমু। ওরা আইলে কইও উনি এহনো আহে নাই। তারপর কাইল রাইত থাকতে তুমি রূপুরে সাথে লইয়া দিয়া আইও মাতবর বাড়ি। তুমি ফির‍্যা আইলে ঘরে তালা দিয়া আমরা কাইলই চইল্যা যাইমু নারায়ণগঞ্জ। জঙ্গুরুল্লা আর আমাগ কিচ্ছু করতে পারব না।'

'নারায়ণগঞ্জ যাইব, কিন্তুক কাম-কাইজের কতাতো কিছু হুনলাম না।'

'কাম ঠিক অইয়া গেছে। ঐ সোডা-ওয়াটার কারখানা আমারে চালু করতে কইছে সায়েব। উনিই টাকা-পয়সা দিব। এহন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বিদেশী সৈন্যে ভইর‍্যা গেছে। তাগো সরাব খাইতে সোডার পানি লাগে, সায়েব কইছে সোডারপানি এহন খুব চলব। সায়েব কইছে লাভের অর্ধেক আমার। আমাগ থাকনের লেইগ্যা ঘরও ঠিক কইর‍্যা দিছে। যাওনের খরচ দিছে তিনশ ট্যাহা। আরো দুইশ দিছে রূপু আর জামাইর যাওনের খরচ।'

'তয় আর দেরি করণের কাম নাই। ঐ দিগে খবর হুনছে ? মোখে কাপোড় বাইন্দা তিনডা ব্যাডা হেকমইত্যা চোরার বউরে বাড়িরতন জোর কইর‍্যা ধইর‍্যা লইয়া গেছে। বউডার আর কোনো খোঁজ-খবর নাই। মাইনষে কয় জঙ্গুরুল্লার লোক বউডারে কাইট্যা গাঙ্গে ফালাইয়া দিছে।'

'ক্যাঁ ?'

'ও, উনিতে হুইন্যা যায় নাই! হেকমইত্যা চোরা পাতাইয়া বাইল্যা মাছ ধরতে গেছিল। গদে আত দিয়া আত আর টাইন্যা বাইর করতে পারে নাই। মইর‍্যা রইছিল পানি তলে। জঙ্গুরুল্লা ঐ লাশ দ্যাহাইয়া খুনের মামলা দিতে চাইছিল ফজলের বিরুদ্দে। কিন্তু বউডা সত্য কতা কইছে। জঙ্গুরুল্লার কতা মতন দারোগা-পুলিসের কাছে সাক্ষী দেয় নাই বুইল্যা মামলাডা টিকাইতে পারে নাই। এই রাগে—।'

'এই কয়দিনের মইদ্যে এত কিছু অইয়া গেছে! হোন রূপুর মা, আর দেরি করণ যাইব না। রূপুরে মাতবর বাড়ি দিয়া কাইলই আমরা নারায়ণগঞ্জ চাইল্যা যাইমু।'

'হ, কাইলই যাওন লাগব। উনি এহন আফারে উইট্যা পলাইয়া থাকুক গিয়া।'

সন্ধ্যার একটু পরেই সাতজন গাট্টাগোট্টা লোক নিঃশব্দে গিয়ে হাজির হয় আরশেদ মোল্লার বাড়ি। তাদের মাথার ফেটা ভুরু পর্যন্ত নামানো। চোখ বাদ দিয়ে সারা মুখ গামছা দিয়া বাঁধা। একজনের মুখমণ্ডল গামছার বদলে সাদা রুমাল দিয়ে বাঁধা। তাদের তিনজনের হাতে ঢাল-শড়কি, দুজনের হাতে ঢাল-রামদা আর দু'জনের হাতে লাঠি ও টর্চলাইট। তারা পা টিপে টিপে উত্তর ভিটি ঘরের সামনের দরজার কাছে গিয়ে হাতিয়ারগুলো ঘরের পিড়ার নিচে নামিয়ে রাখে আলগোছে।

BanglaBook.org

ঘরের দরজা বন্ধ। লাল গামছায় মুখ-বাঁধা দলের একজন ডাক দেয়, 'মোল্লার পো ঘরে আছেন নি ?'

'ক্যাডা ?' ভেতর থেকে সাড়া দেয় সোনাইবিবি।

'জঙ্গুরুল্লা চদরী সাব আমাগ পাডাইছে।'

'উনিতো এহনো বাড়িত আহে নাই।'

'কই গেছে ?'

'কই গেছে, কিছু কইয়া যায় নাই।'

'হোনেন, আমাগ পাডাইছে আপনেগ নেওনের লেইগ্যা। পীরবাবা আইয়া পড়ছে। আইজ বোলে ভালো দিন আছে। আইজই কলমা পড়ান লাগব।'

'উনিতো বাড়িত্ নাই।'

'উনি বাড়িত্ নাই, আপনে তো আছেন। আমাগ কইয়া দিছে, মোল্লার পো না থাকলে আপনেরে লইয়া যাইতে। মাইয়া লইয়া, পোলাপান লইয়া চলেন শিগ্গির।'

'না, আমরা যাইতে পারমু না।'

'হোনেন চাচি, আমরা হুকুমের গোলাম। আমাগ কইছে ভালোয় ভালোয় না গেলে ধইর‍্যা উচ্কাইয়া লইয়া যাইতে।'

'গোলামের ঘরের গোলামরা কয় কি। তোগ ঘরে কি মা-বইন নাই ?'

'দ্যাহেন, গালাগালি দিয়েন না। ভালো অইব না।'

'এক শত্ বার দিমু। তোগ মা-বইনের নিয়া নিকা দে পীরের লগে। আরেক জনের বিয়াতো বউরে ক্যামনে আবার বিয়া দিতে চায় পা-না-ধোয়া শয়তানডা।'

'আরেকজন তো তালাক দিয়া দিছে।'

'না, জোর কইর‍্যা তালাক লইছে। ঐডা তালাক অয় নাই।'

'আমরা কিছু হুনতে চাই না। মাইয়া বাইর কইর‍্যা দ্যান। আপনেও চলেন পোলাপান লইয়া। পীরবাবা বিয়ার পাগড়ি মাতায় দিয়া বইয়া রইছে।'

'না, আমরা যাইমু না।'

'শিগ্গির দরজা খোলেন। নাইলে লাইথ্যাইয়া দরজা ভাইঙ্গা ফালাইমু।'

লাল গামছাধারীর নির্দেশে নিজ নিজ হাতিয়ার হাতে নেয় সবাই।

পশ্চিম ভিটি ঘরের বাতি নিবে যায় হঠাৎ—

সবুজ গামছাধারী একজন দরজায় লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে। কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ে কেঁদে ওঠে ভয়ে।

একজন টর্চ হাতে আর একজন রামদা হাতে ঘরে ঢোকে। টর্চ মেরে তারা রূপজানের খোঁজ করে।

সোনাইবিবি বলে, 'মাইয়া নাই। জামাই আইয়া লইয়া গেছে।'

'মিছা কথা কওনের আর জায়গা পাওনা বেডি!'

'মিছা কতা কিরে।' রামদা দেখেও সে ঘাবড়ায় না এতটুকু। তার ঘোমটার ভেতর থেকে গালাগালের ভিমরুল ছুটে আসে। কিন্তু লোকগুলো তা গ্রাহ্যের মধ্যেই নেয় না। তারা টর্চ মেরে চৌকির তলা, ধানের ডোল ইত্যাদি খুঁজতে থাকে।

হৈ-চৈ শুনে ডাকাত পড়েছে মনে করে আশপাশের লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তারা চারদিকে টর্চের আলো ফেলে। একজন চিৎকার দিয়ে বলে,

BanglaBook.org

'খবরদার! এই দিগে আইলে গুলি মাইর‍্যা দিমু। যার যার বাড়িত্ যাও। দরজা বন্দ কইর‍্যা হুইয়া পড় গিয়া।'

আফারে উঠবার ফাঁকা জায়গা দিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই আরশেদ মোল্লা বুঝতে পারে, আর লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে আফার থেকে বলে, 'খবরদার মাইয়া লোকের গায় আত দিও না। আমি আইতে আছি।'

সে নিচে নেমে বলে, 'মাইয়া বাড়িত নাই। জামাই আইয়া লইয়া গেছে। আইছেন যহন বিচরাইয়া দ্যাহেন।'

সবুজ গামছাধারী টর্চ মেরে তন্নতন্ন করে খোঁজে। আফারে উঠে তালাশ করে, কিন্তু রূপজানকে পাওয়া যায় না।

বাইরে থেকে লাল গামছাধারী বলে, 'আরে তোরা আইয়া পড়। কুনখানে আছে বোঝতে পারছি।'

তারা পশ্চিমভিটি ঘর ঘিরে ফেলে। ঘরের দুটো দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ।

'ঘরে কে আছে, দরজা খোলো।'

কেউ দরজা খুলছে না দেখে লাল গামছাধারী দমাদম লাথি মারে দরজার ওপর। অর্গল ভেঙ্গে দরজা খুলে যায় আর অমনি ভেতর থেকে শিশি, বোতল, খোড়া, বাটি ছুটে আসে লোকগুলোর দিকে। তারা ঢাল দিয়ে সেগুলো ফিরিয়ে আত্মরক্ষা করে। টর্চের আলোয় দেখা যায় রূপজান মরিয়া হয়ে হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই ছুঁড়ে মারছে।

'আরে বোবা মিয়াভাই, ধরেন শিগ্‌গির।' লাল গামছাধারী বলে। 'আমাগো মাথা ভাইঙ্গা ফালাইব।'

মুখে সাদা রুমাল-বাঁধা লোকটা ঢাল দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে এগিয়ে যায়।

রূপজান চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'খবরদার আউগ্‌গাইস না। দাও দ্যাখছস, জবাই কইর‍্যা ফালাইমু।'

বোবা লোকটি এগিয়ে যায়। অন্য একজন লাঠির বাড়ি দিয়ে রূপজানের হাত থেকে দাটা ফেলে দেয়। সে এবার পেছনের দরজা খুলে নদীর দিকে দৌড় দেয়।

টর্চের আলো অনুসরণ করছে রূপজানকে। সাতজনই এবার তার পেছনে ধাওয়া করে।

শাড়ির আঁচলে পা আটকে রূপজান মাটিতে পড়ে যায়। তার ওপর টর্চের আলো ফেলে সবুজ গামছাধারী বলে, 'ও বোবা মিয়াভাই, ধরেন জলদি। আমাগ তো আবার ধরন মানা।'

বোবা লোকটি রূপজানকে ধরে ফেলে।

'অ্যাই গোলামের ঘরের গোলাম, খবরদার আমার গায়ে আত দিস না।'

'আরে বোবা মিয়াভাই, পাতালি কোলে কইর‍্যা উডাইয়া ফালান।'

বোবা লোকটা রূপজানকে পাঁজাকোলা করে নদীর দিকে এগিয়ে যায়।

রূপজান হাত-পা ছুঁড়ছে, গালাগাল দিচ্ছে, আর দু'হাত দিয়ে খামচে দিচ্ছে বোবা লোকটার শরীর। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে এগিয়েই যাচ্ছে। যেতে যেতে সে 'আঁ-আঁ-আঁ' শব্দ করে মাথা নেড়ে কিছু একটা ইশারা দেয়।

ইশারার ভাষা বুঝতে পেরে লাল গামছাধারী বলে, 'আপনেরা নায় উইট্যা বহেন। আমি আরশেদ মোল্লারে দাওয়াত দিয়া আহি।'

রূপজানকে কোলে নিয়ে বোবা লোকটা নৌকায় ওঠে। কিন্তু রূপজানের আর সড়া পাওয়া যাচ্ছে না এখন। সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

লোকটা তাকে শুইয়ে দেয় পাটাতনের ওপর। স্খলিত আঁচল টেনে শরীর ঢেকে দেয়।

কিছুক্ষণ পর লাল গামছাধারী ফিরে এলে দুটো ডিঙি তাদের নিয়ে রওনা হয়।

অন্ধকারের মধ্যে কে একজন বলে ওঠে, 'অ্যাই তোরা এইবার মোখের কাপড় খুইল্যা ফ্যাল। আন্ধারে আর কেও দ্যাখব না। তোরা তো ঢাল নিতে চাস নাই। ঢাল না নিলে আইজ উপায় আছিল না।'

'হ, শিশি-বোতল যেমনে উদ্দ মারতে আছিল, মাথা একজনেরও আস্ত থাকত না।' আর একজন বলে।

'হ মাথা ফাইট্টা চৌচির অইয়া যাইত।' অন্য একজন বলে।

অন্ধকার কেটে ডিঙি দুটো এগিয়ে যায়। বোবা লোকটা সস্নেহে হাত বুলায় রূপজানের গালে, কপালে, মাথায়।

অল্প সময়ের মধ্যেই ডিঙি দুটো গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যায়। বোবা লোকটা রূপজানকে কোলে নিয়ে নৌকা থেকে নেমে এগিয়ে যায় একটি বাড়ির দিকে। ঘরের কাছে গিয়ে বোবাটা হঠাৎ কথা বলে ওঠে, 'ও মা, কই তুমি? শিগগির দরজা খোল। তোমার গয়নার মানুষটারে লইয়া আইছি।'

বরুবিবি দরজা খুলে দেয়। ফজল রূপজানকে শুইয়ে দেয় চৌকির বিছানায়।

'আরে, এক্কেরে মাইর‍্যা লইয়া আইছস দেহি।' ভীত কণ্ঠ বরুবিবির।

'ও কিছু না। বেউঁশ অইয়া গেছে। মোখে পানির ছিডা দ্যাও।'

'ও আমিনা, জলদি পানি আন, দাঁত লাইগ্যা গেছে। ও আমার সোনার চানরে, তোর কি অইলরে!'

'কোনো চিন্তা কইর‍্যা না। আমরা অ্যাকটা ফুলের টোকাও দেই নাই। ও-ই আমাগ মারছে।'

'ক্যান্, আইতে চায় নাই?'

'জঙ্গুরুল্লার বাড়ি যাইতে চায় নাই। আমরাতো পা-না-ধোয়ার বাড়ি লইয়া যাইতে চাইছিলাম।'

নূরুর দিকে ফিরে সে বলে, 'কয়েকটা লটার ডাণ্ডি লইয়া আয় গরুর বাথান তন।'

নূরু বেরিয়ে গেলে গলা খাদে নামিয়ে সে আমিনাকে বলে, 'তুই লটা ছেঁইচ্যা রস বাইর কর। ঘায়ে লাগইতে অইব। তোর ভাবিসাব আমারে খামচাইয়া কিছু রাখে নাই।'

বেশ কিছুক্ষণ পর রূপজানের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলেই তার মাথার কাছে উবু হয়ে বসা বরুবিবিকে দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর মাথা উঠিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে সে জড়িয়ে ধরে শাশুড়িকে।

রাত অনেক হয়েছে। ফজলের শিথিল বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে রূপজান বিছানা ছেড়ে ওঠে। বেশ-বাস ঠিক করে। হারিকেনের আলো বাড়িয়ে দেয়।

'আমি বাইরে গেলাম।' রূপজান বলে। 'দরজা কিন্তুক খোলা রইল।'

'যাও, আমি চাইয়া রইছি।' ফজল বলে। 'গাঙ্গের ঘাটে কিন্তু যাইও না, জিনে ধইর‍্যা লইয়া যাইব।'

কিছুক্ষণ পর রূপজান ফিরে এসে দেখে, ফজল চিত হয়ে শুয়ে আছে।

'ঐ তাকের উপ্‌রে দ্যাখো বাটির মইদ্যে লটার রস আছে।' ফজল বলে। 'ঐ রস ঘায়ে লাগাইয়া দ্যাও দেখি।'

BanglaBook.org

রূপজান বকের পালক ভিজিয়ে ফজলের হাত ও গলার নখের আঁচড়গুলোয় রস লাগাতে লাগাতে বলে, 'ইস! খামচি লাইগ্যা কি অইছে! তোমারে যদি চিনতে পারতাম, তয় কি এমুন কইর‍্যা খামচাইতাম!'

'খামচিতো আমারে দ্যাও নাই। খামচি দিছ জঙ্গুরুল্লার মানুষরে। তোমার খামচি খাইতে তখন এমুন মজা লাগতে আছিল, কি কইমু তোমারে। তোমার গালাগালিগুলাও বড়ই মিঠা লাগতে আছিল।'

'খামচি বোলে আবার মজা লাগে! গালাগালি বোলে আবার মিঠা লাগে!'

'হ, আমিতো তখন জঙ্গুরুল্লার মানুষ। তখন মনে অইতে আছিল, আরো জোরে খামচি দ্যায় না ক্যান, কামড় দ্যায় না ক্যান ? আরো গালাগালি দ্যায় না ক্যান্ ?'

একটু থেমে ফজল আবার বলে, 'জোরজবরদস্তি কইর‍্যা তালাক নেওনের সময় তোমার বাপ, জঙ্গুরুল্লা, পুলিসের হাওয়ালদার আর ঐ সাক্ষী হারামজাদারা কইছিল—তুমি আমার ঘর করতে রাজি না। সেই কথা যাচাই করণের লেইগ্যা জঙ্গুরুল্লার মানুষ সাইজ্যা গেছিলাম। তুমি যদি বুইড়্যা পীরের লগে বিয়া বইতে রাজি অইয়া আমাগ নায় উঠতা, তয় কি করতাম জানো ?'

'কি করতা ?'

'মাঝ গাঙ্গে নিয়া ঝুপ্‌পুত কইর‍্যা ফালাইয়া দিতাম পানিতে।'

রূপজান ফজলের বুকের ওপর ঢলে পড়ে। ফজল তার দুই সবল বাহু দিয়ে তাকে অপার স্নেহে, পরম প্রীতিতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমরা জোড়াবান্দা কইতর-কইতরি। এই দুনিয়া জাহানের কেও আমাগো জোড়া ভাঙতে পারব না, কোনো দিন পারব না।'

❑

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

❑ আঞ্চলিক শব্দ পরিচিতি, ব্যাখ্যা ও অর্থ পরের পাতায়।

আঞ্চলিক শব্দ-পরিচিতি

সঙ্কেত

অব্য.—অব্যয়
আ.—আরবি
ইং—ইংরেজি
উ.—উর্দু
ওল.—ওলন্দাজ
ক্রি—ক্রিয়া
ক্রিবিণ.—ক্রিয়াবিশেষণ
তা.—তামিল
তু.—তুরকীয় ভাষা
প.—পর্তুগিজ
প্র.—প্রত্যয়
প্রা.—প্রাকৃত
প্রা. বাং—প্রাচীন বাংলা
ফা.—ফারসি ভাষা
বি—বিশেষ্য
বিণ.—বিশেষণ
বিপ.—বিপরীত শব্দ
ম. বাং—মধ্যযুগীয় বাংলা
লেখ্যরূপ (সাধু) ঃ
লেখ্য ও কথ্যরূপ (চলিত)
সং—সংস্কৃত
সর্ব.—সর্বনাম
হি.—হিন্দি
[ ] তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে
শব্দের ব্যুৎপত্তি বা জাতি
নির্দেশ করা হয়েছে।

অ

অইব—হইবে ঃ হবে। ক্রি
অইয়া—হইয়া ঃ হয়ে। ক্রি
অও—হও। ক্রি
অওনে—হওয়ায়। ক্রি
অজম—হজম, পরিপাক। বি [আ. হদ্‌ম]
অদস্থালে—অধঃস্থলে অধঃপাতে, উৎসন্নে। বি
অদিষ্ট—অদৃষ্ট, ভাগ্য। বি
অমুন—এমন। ক্রিবিণ.
অ্যাক মূলের—এক মূল্যের।
অ্যাদে—এই দ্যাখ।

আ

আইক্‌কা—বাঁশ থেকে কঞ্চি কেটে ফেলার পর কঞ্চির গোড়ায় যে অংশ বাঁশের গিঠের সাথে থেকে যায়। বি
আইচ্ছা—আচ্ছা, বেশ। অব্য,
আইছ—আসিয়াছ ঃ এসেছ। ক্রি
আইছি—আসিয়াছি ঃ এসেছি। ক্রি
আইছে—আসিয়াছে ঃ এসেছে। ক্রি
আইজ—অদ্য ঃ আজ। অব্য.
আইব—আসিবে ঃ আসবে। ক্রি
আইলো—আসিল ঃ এল। ক্রি
আইয়া—আসিয়া ঃ এসে। ক্রি
আউগ্‌গান—অগ্রসর হওয়া, আগাইয়া যাওয়া ঃ এগিয়ে যাওয়া; আগাইয়া আসা ঃ এগিয়ে আসা।
আউগ্‌গা—আগাইয়া আয়ঃ এগিয়ে আয় ঃ আগাইয়া যাঃ এগিয়ে যা। ক্রি
আউগ্‌গায়—আগাইয়া আসে ঃ এগিয়ে আসে; আগাইয়া যায় ঃ এগিয়ে যায়। ক্রি
আউত্যা—হাতুয়া, পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত যে পুত্র বা কন্যাকে হাতে ধরে কোনো বিধবা বা পরিত্যক্তা স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করে নতুন স্বামীর বাড়ি যায়। বিণ.
আউলাপাতালি—এলোপাতাড়ি। বিণ. ক্রিবিণ.
আওড়—আবর্ত, পাক-খাওয়া নদীর স্রোত। বি
আঁইট্যা[১]—হাঁটিয়া ঃ হেঁটে। ক্রি
আঁইট্যা[২]—আঁটি, আঁঠি। বি
আঁউক্‌ড়া—আঁকড়ি, বেতের কাঁটাযুক্ত লতা। বি
আক্ কইর‍্যা—হাঁ করিয়া ঃ হাঁ করে; মুখ ব্যাদান করে। ক্রি
আকাম-কুকাম—অপকর্ম ও কুকর্ম; খারাপ ও অন্যায় কাজ। বি
আক্কল—আক্কেল, বুদ্ধি-বিবেচনা। বি [আ. আক্‌ল্]
আখালি—কাঁকর, পাথরের বা ইটের ছোট কুচি। বি
আখেরাত—পরকাল। বি [আ.]
আছর—জিন, ভূত বা মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাব। বি [আ.]
আছিল—ছিল। ক্রি [প্রা. বাং ও ম. বাং]
আছোনি ?—আছ নাকি ?
আজার—হাজার। [বি বিণ. [ফা. হযার]
আটকাইছে—আটকাইয়াছে ঃ আট-কিয়েছে। ক্রি
আটি—বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ।
আঠাই—অথৈ, গভীর। বিণ.

আড়্ডি—হাড়্ডি, হাড়, অস্থি। বি
আতিয়ার—হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র। বি [হি. হথ্থিয়ার]
আতে—হস্তে, হাতে। বি
আদমসুরত—কালপুরুষ, নক্ষত্রপুঞ্জ-বিশেষ। বি

আন্তেশা পিডা—আন্তরসা বা আঁদরসা পিঠা; চালের গুঁড়ি ও গুড় মিশ্রিত তেলে-ভাজা একরকম গোল পিঠা। বি
আন্দাকুন্দি—অন্ধের মতো।
আনদুরা-বানদুরা—আঁধার কালো ও বাঁদরমুখো। বিণ.
আফার—খড় বা টিনের চালার নিচে তৈরি পাটাতন বা মাচান। বি
আবাত্তি—অপরিণত, কচি। বিণ.
আম্মক—আহাম্মক, বোকা, নিরেট মূর্খ। বি বিণ. [আ. আহমক]
আমুনে—আমন ধানের গাছ যেমন ধীরে ধীরে বাড়ে ও আউশ ধান গাছের মত ফল দিয়ে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় না এমন। বিণ. [বিপ. আউশে।]
আরজু—আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা। বি [আ, আরদ]
আরেট্টু—আর একটু। বিণ.
আলইকর—হালুইকর। বি [আ. হ'লবাই]
আলফেট—মহারানী ভিক্টেরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের অনুকরণে ছাঁটা চুলের সিঁথি। বি
আলাঝিলা—ঝাপসা ছায়া। বি
আলামত—চিহ্ন, নির্দশন [আ.] বি
আলৈয়াদানা—আলেয়া। বি
আসুলি—চর নয় এমন সাবেক অর্থাৎ প্রাচীন মাটির স্থান বা লোক। বি
আহিস—আসিস। ক্রি
আহেঙ্কাত—আকাঙ্ক্ষা। বি

ই

ইদ্দত—স্বামীর মৃত্যুর বা তালাক দেয়ার পরের মুসলমান শাস্ত্র-নির্দিষ্ট তিন মাস দশ দিনের মেয়াদ যা শেষ না হলে পুনর্বিবাহ হতে পারে না। বি
ইযারি—কাঠের চামচ। বি।
ইসাব—হিসাব ঃ হিসেব। বি [আ, হিসাব]

উ

উইট্যা—উঠিয়া ঃ উঠে। ক্রি
উইর‍্যাম—এক প্রকার গাছ যাতে ছোট ছোট কষযুক্ত ফল হয়। এর পাকা ফল হরিয়ালের প্রিয় খাদ্য। বি
উচকাইয়া—উঁচু করিয়া। ক্রি
উজাইয়া—উজাইয়া ঃ উজিয়ে। ক্রি
উডাইতে—উঠাইতে ঃ উঠাতে। ক্রি
উডাইয়া—উঠাইয়া ঃ উঠিয়ে। ক্রি
উডানে—উঠানে। বি
উডুক—উঠুক। ক্রি
উড়কি—নারকেলের মালা দিয়ে তৈরি হাতা। বি
উধার—ধার, কর্জ। বি [সং উদ্ধার]
উফায়—উপায়, অভীষ্ট লাভের বা কার্যসাধনের পন্থা বা প্রণালী। বি
উম—ওম, উষ্ণতা। বি [সং উষ্ণ]
উরুস—পীরের দরগায় বা পীরের নামে ধর্মোৎসব। [আঃ উরস]
উল্তাপাল্তা—উল্টাপাল্টা। বিণ.
উল্লাগুল্লা—প্রচণ্ডভাবে ওলটানো ও ঘোলানো। বি

এ

এইডার—এইটার ঃ এটার। সর্ব.
এইহানে—এইখানে ঃ এখানে। বি
এট্টুখানিক—একটুখানি। বিণ.
এডুক—এইটুকু ঃ একটুকু। বিণ.
এম্বায়—এমনভাবে ঃ এমনিভাবে। ক্রি বিণ.
এহন—এখন। ক্রি বিণ,

ঐ

ঐহানে—ঐখানে। বি

ও

ওচা—বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার ত্রিভুজাকৃতি ফাঁদ। বি
ওডো—উঠ ঃ ওঠ। ক্রি.
ওতঘাত—ওত পেতে আঘাত হানবার কায়দা-কৌশল; ফন্দি—ফিকির। বি
ওন্‌রা—ওনারা, তাঁরা। সর্ব.
ওলান—বাঁট, গবাদি পশুর স্তন। বি
ওস—হিম, শিশির। বি [সং অবশ্যায়, প্রা. ওসাঅ]

ক

ক'—বল্, বলে ফেল। ক্রি
কইতন—কোথা হইতে ঃ কোত্থেকে।

কইত্তন—কোথা হইতে ঃ কোত্থেকে।
কইমু—কহিব ঃ কইবো, বলবো। ক্রি
কইর্‍্য—করিও ঃ কোরো। ক্রি
কইর্‍্যা—করিয়া ঃ করে। ক্রি
কতা—কথা। বি
কদমবুসি—পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা [আ. কদম (পা)+ফা. বুসা (চুম্বন)= পদচুম্বন।
কবিরা—বড়। বিণ. [আ.]
করণফুল—কানের ফুল। বি [করণ—কর্ণ সং]
কলকাডি—চাবিকাঠি, সমস্যা সমাধানের উপায়। বি
করাইত্যা বালি—করাতের দাঁতের মতো বালি অর্থাৎ মোটা দানার বালি।
কাইজ্যা—ঝগড়া, মারামারি। বি [আ কাদীয়া]
কাইট্যা—কাটিয়া ঃ কেটে। ক্রি
কাইন্দা—কাঁদিয়া ঃ কেঁদে। ক্রি
কাঁজির ভাত—পানিতে গাঁজানো চালের ভাত। [সং কাঞ্জিক]
কাঁডা—কাঁটা। বি

কাডাকাডি—কাটাকাটি। বি
কাতলা—যে দুই মোটা খুঁটির মঝে আড়শলা দিয়ে ঢেঁকি পাতা হয়। বি
কানাভুলা—যে কল্পিত ভূত পথ ভুলিয়ে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। বি
কান্দাকাডি—কান্নাকাটি, কাঁদাকাটা, বিলাপ।
কাপড়িয়া—কাপুড়িয়া ঃ কাপুড়ে। বি বিণ.
কাফাল—খাদ, গভীর স্থান। বি
কাবার—শেষ, খতম বি [প.*acaber*]
কাবিজ—কাহিল। বিণ. [আ. কাবিয]
কামে-কাইজে—কাজে-কর্মে।
কায়ামরা—মৃতকায়, মরার মতো কায়া-বিশিষ্ট। বিণ. [সং কায়, কায়া-শরীর]
কালাকষ্টি—কষ্টিপাথরের মতো কালো। বিণ.
কালামাডি—কালো মাটির স্থান, টাটানগর।
কিনমু—কিনিব, ক্রয় করিব ঃ কেনব। ক্রি
কিন্যা—কিনিয়া ঃ কিনে। ক্রি
কিয়ের লেইগ্যা—কিসের জন্য।
কুইট্যা—কুটিয়া ঃ কুটে। ক্রি
কুদাকুদি—লম্ফঝম্প, লাফঝাঁপ। ক্রি। [সং কুর্দন]
কুচ্ছু—কিছু [হি, কুছ]
কুনখানে—কোনস্থানে, কোনখানে, কোথায়। অব্য
কুন্তু—কিন্তু। অব্য.
কুয়ত—শক্তি। বি [আ. কুবৎ—বলা]
কুলুপ—দু'হাত দিয়ে ইসক্রুপের (স্ক্রু) মতো দৃঢ়ভাবে চেপে ধরা [ওল. *Schroef*-স্ক্রু]
কেয়ারা—ভাড়াটে। বিণ. [আ. কিরায়া—ভাড়া]
কোচের কুতু—কোচের শলা যার মাথায় লোহার সরু ধারালো আচ্ছাদন থাকে।
কোর্ট—মাটিতে দাগকাটা খেলবার স্থান; চৌহদ্দি, আয়ত্তের স্থান। বি [ইং *Court*]
কোলশরিক—শরিকের অধীন শরিক। বি
কোহানে—কোনখানে। অব্য.
ক্যাঁ, ক্যান—কেন। অব্য.
ক্যাডা—কে ওটা। সর্ব,
ক্যাদা—কর্দম, কাদা। বি
ক্যামনে—কেমন করিয়া ঃ কেমন করে। অব্য.

ক্যামবায়—কেমনভাবে, কেমন করে।
ক্যালার ড্যাম—কলার চারা। বি
ক্বাজা—বিলম্ব, নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময় পার হওয়া। [আ. ক্বযা]

খ

খন্নাস—শয়তান। [আ, খান্‌নাস—আত্মগোপনকারী]
খবরিয়া—খবরদাতা, সংবাদদাতা। বি
খাই—গভীরতা। বি [সং খাত]
খাইল্যা ঘাস—সরু আখের মত এক প্রকার ঘাস।
খাওইন্যা সোডা—খাওয়ার সোডা।
খাঁড়ি—নদীর সরু শাখা। বি
খাজনার চেক—খাজনার রসিদ।
খাডো—খাটো। বিণ.
খাড়ইয়া—দাঁড়াইয়া ঃ দাঁড়িয়ে। ক্রি
খাড়া ঝিলকি—বিদ্যুৎ। বি
খাড়া ঝিলিক—বিদ্যুৎ। বি
খাদইন—বাঁশ দিয়ে তৈরি বড় মাছ ধরার ফাঁদ।
খাদিমদারি—খাবার পরিবেশনের কাজ। বি [আ. খাদিম-সেবক]
খামচাইতাম—খামচি দিতাম। ক্রি
খায়েশ—ইচ্ছা, বাসনা। বি
খিদা—ক্ষুধা ঃ খিদে। বি
খুই—খোলস, খোসা। বি

খুইদ্যা—খুদিয়া ঃ খুদে। ক্রি
খুঁডা—খুঁটা ঃ খোঁটা। বি
খেইল—খেলা। বি
খেও—খেপ, নিক্ষেপ। বি
খেপ—নিক্ষেপ। বি
খেলু—খেলোয়াড়। বি
খোঙা—খোসা, খোলস। বি
খোন্দল—গর্ত। বি [ফা. খনদক]

গ

গ, দিয়া—গোঁ ধরে প্রবল বেগে।
গউদ্যা বাইল্যা—গর্তের বেলে মাছ।
গরবাদ—বরবাদ, ধ্বংস। বি [ফা. বরবাদ]
গাঁইথ্যা—গাঁথিয়া ঃ গেঁথে। ক্রি
গাছ-মাতব্বর—প্রধান মোড়ল।
গাবুর—চাকর, ভৃত্য। বি
গিট্টু—গিঁঠ। বি
গিধড়—নোংরা। বিণ, [হি. গিদধর-শিয়াল]
গিল্যা—গিলিয়া ঃ গিলে। ক্রি
গুঁজাইয়া—লুকাইয়া ঃ লুকিয়ে, গোপন করে। ক্রি [তু. গুজঝা, প্রা. গুজঝ, সং গুহ্য]
গুজারিয়া—অতিবাহিত হইয়া ঃ পার হয়ে, কেটে। ক্রি [ফা. গুজর]
গুড়ি মারা—নৌকার হাল চালনা করা। ক্রি
গুনা—পাপ, অপরাধ, বি [ফা, গুনাহ]
গুর্জু—গদা, মুগুড়, বি [ফা. গুর্য]
গোডা—ফল, গাছের গোটা। বি
গোত্‌লাগুত্‌লি—পানির মধ্যে লাফালাফি
গ্যাণ্ডারি—ইক্ষু, আখ। বি [হি. গন্‌ডেরী]
গ্যারাফি—নোঙর। বি

ঘ

ঘষনা—যে বাঁশ বা কাঠের সাথে বৈঠা বা দাঁড় ঠেকিয়ে টানা হয়। বি
ঘাইট্যা—ঘাটিয়া ঃ ঘেটে। ক্রি
ঘাগু—বার বার ঘা খেয়ে শিখেছে এমন; ভুক্তভোগী। বিণ
ঘাড়ুয়া—ঘেড়ো, অবাধ্য, যে ঘাড় নত করে না। বিণ.
ঘুঁইট্যা—ঘুঁটিয়া ঃ ঘুঁটে, আলোড়িত করে। ক্রি

চ

চইল্যা—চলিয়া ঃ চলে। ক্রি
চউখ—চক্ষু, চোখ। বি
চক—বিস্তৃত মাঠ। বি [বং চতুষ্ক]
চটকানা—চপেটাঘাত, থাপ্পড়। বি [হি. চটখনা]
চরাটা—নৌকার দুই মাথির পাটাতন। বি
চরে-চঞ্চালে—চরে ও চর অঞ্চলে।
চলপানি—নৌকা চলার মতো গভীর পানি। বি
চলাচল—যাতায়াত। বি
চলাচলতি—চালচলন। বি
চাউলে পাতিলে তল—পাতিল ভেঙে চাল ও পাতিলের চুলার তলদেশে পতন।
চাঁই—বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার খাঁচা। বি
চাঁদবালি—অর্ধচন্দ্রাকার নাকের অলঙ্কার। বি
চাকরা—চাকর। বি
চাকইর‍্যা—চাকুরিয়া ঃ চাকুরে; ভাড়াটে লাঠিয়াল । বি
চাকুমচুকুম—যে খাদ্য চিবোবার সময় চাকুমচুকুম শব্দ হয়, যেমন মুড়ি।
চান্—চন্দ্র, চাঁদ। বি
চাবাইয়া—চিবাইয়া ঃ চিবিয়ে। ক্রি
চিক্কইর—চিৎকার, চেঁচানি। বি
চিকিয়ে—নখ দিয়ে ছাড়িয়ে। ক্রি
চিৎনা—প্রশস্ত অথচ অগভীর। বিণ.
চিতই পিঠা—এক প্রকার পিঠা। বি
চিন্যা—চিনিয়া ঃ চিনে। ক্রি
চিবি—চাপ। বি
চিলসত্বর—চিলের ছোঁ মারার মত তাড়াতাড়ি। ক্রিবিণ.

চুবানি—চুবুনি, নিমজ্জন। বি
চেঙ্গি—নখ বা দাড়ার সাহায্যে চিমটি দিয়ে চেপে ধরা। বি
চোখপলানি—কানামাছি, চোখবাঁধা খেলা। বি
চোত্‌রা—বিছুটি। বি
চোরামদ্দি—চোর শব্দের সাথে মদ্দি যোগ করে তৈরি বিদ্রুপাত্মক নাম।
চ্যাগবেগা—কাঁটাযুক্ত চ্যাপ্টা মৎস্যেতর জলজ প্রাণী। বি

ছ

ছট্‌কাছট্‌কি—লাফালাফি করে ছিটকে পড়া। ক্রি
ছনিবনি—ছটফট, আনচান। অব্য.
ছাইড়া—ছাড়িয়া ঃ ছেড়ে। ক্রি

ছাঁচতলা—চালের বা ছাতের প্রান্তভাগের তলদেশ ছঞ্চার তলদেশ।
ছাড়া ইচা—গলদা চিংড়ি। বি
ছাড়মু—ছাড়ব ঃ ছাড়ব। ক্রি
ছাপ্পর—চাল, আচ্ছাদন, নিচু ঘর। বি [হি. ছপ্পর]
ছাপ্পরছাড়া—ঘরছাড়া। বিণ.
ছিটা লাথি—ছিট্‌কে-মারা লাথি।
ছিট্টাভিট্টা—ছিটকে ছড়িয়ে। ক্রি
ছুলুম—এক কল্কে।
ছেঁইচ্যা—ছেঁচিয়া ঃ ছেঁচে। ক্রি
ছেক—বিরাম, ফাঁক। বি [সং ছেদ]
ছোডকালে—ছোটকালে।
ছোপ—ছোট ঝোপ। বি
ছ্যান—খেজুরগাছ কাটার ধারালো লম্বা দা। বি
ছ্যাবড়া—হঠাৎ ভয়ে চমকানো বা শিউরানো। ক্রি
ছ্যামড়া—বালক, ছোকড়া, ছোঁড়া। বি [সং ছমণ্ড]

জ

জ'ব—জবাব, উত্তর; জবান, বাকশক্তি। বি [আ. জবাব—উত্তর, ফা. জবান—বাকশক্তি]
জবর—কঠিন, প্রকাণ্ড। বিণ [আ. যবর]
জবান—কথা, বাকশক্তি। বি
জল্লা—খেলার মাঠের নির্দিষ্ট সীমা-রেখার বাইরে চলে যাওয়া।
জাইন্যা—জানিয়া ঃ জেনে। ক্রি
জাউ—বেশি পানি দিয়ে খুব নরম করে রান্না করা খুদ বা চালের ভাত। বি [সং জয়কার]
জাবড়ি—গলার নিচের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানিতে ডুবিয়ে দেয়া। বি
জারাজারা—জর্জরিত। বিণ.
জিগাইলা না—জিজ্ঞাসা করিলে না ঃ জিজ্ঞেস করলে না।
জিত্যা—জিতিয়া ঃ জিতে। ক্রি
জিরাইতে—জিরোতে, বিশ্রাম করতে। ক্রি
জিরান—বিশ্রাম [আ. জিরিয়ান]
জিলাফি—জিলিপি। বি
জুডা—ঝুটা, উচ্ছিষ্ট। বিণ. [সং জুষ্ট, হি. ঝুটা]
জুত—আরাম, সুযোগ, সুবিধা, মজা। বি
জুতের নাও—আরামের নৌকা।
জেতা—জীবিত। বিণ.
জেয়াফত—ভোজ। বি [আ. যিয়াপত]
জোরোয়ার—শক্তিশালী, ক্ষমতাবান। [ফা. যোরাওয়ার]

ঝ

ঝাঁজি মেরে—রাগ ও তেজ দেখিয়ে।

ট

টং—পাহারা দেয়ার জন্য তৈরি উঁচু ছোট ঘর। বি
টাইন্যা—টানিয়া ঃ টেনে। ক্রি
টাটকিনি—বাটা জাতীয় ছোট মাছ-বিশেষ। বি
টাডি সুপারি—খোসা-ছাড়ানো শক্ত আস্ত সুপারি।
টুঙি, টুঙ্গি—উঁচু ছোট ঘর। বি
টুবুটুবু—টুবটুবে, প্রায় পুরোপুরি ভরা। বিণ.
টোনা—পুরুষ বা স্ত্রীলোক, বিশেষ করে স্বামী বশ করার তন্ত্র-মন্ত্র। (জাদু-টোনা) বি [সং তন্ত্র; হি. টোনা]
ট্যাটা—গেঁথে মাছ মারবার বহু শলাকা বিশিষ্ট অস্ত্র যা দাঙ্গায়ও ব্যবহার করা হয়।
ট্যাংরা মাছ—তিনকাঁটাযুক্ত সুপরিচিত মাছ।

ঠ

ঠাডা—বজ্র। বি [তা. ঠিটু]
ঠাডা রউদ—প্রখর রোদ।
ঠেইল্যা—ঠেলিয়া ঃ ঠেলে। ক্রি

ড

ডওরা—নৌকার খোলের মধ্যবর্তী স্থান। বি [হি. ডহরা]
ডফল—ডবল, দ্বিগুণ। বিণ. [ইং *double*]
ডলা—মর্দন করা, ঘষা। ক্রি
ডাউগ্‌গা—কলাগাছের ডাল। বি
ডাওর—একটানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি। [সং ধারা]
ডাকাইত্যা—ডাকাতের মতো সর্বনেশে। বিণ. [ডাকাতিয়া]
ডাফ—মাছের পুচ্ছাঘাত, ঘাই। বি
ডাফলাডাফলি—ঘাই মেরে ছুটাছুটি, দাপাদাপি।
ডিল্‌কি—পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান। ক্রি [ডিংগি]
ডিলিক—আনন্দের আতিশয্যে ডিংগি মারা অর্থাৎ পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো। ক্রি
ডুলা—খালুই, বাঁশের তৈরি ছিদ্রওয়ালা মাছ রাখার পাত্র। বি
ডোগা—ডগা। বি
ডালট—ঢালু জায়গা। বি

ঢিপলা—ছিপি, দলামুচড়ি করা যে জিনিস দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করা যায়। বি
ঢিশমিশ—খারিজ, বাতিল। [ইং dismiss]
ঢেমনি—উপপত্নী, ব্যাভিচারিণী। বি বিণ.
ঢোন—অর্ধডিম্বাকারের নদীর যে অংশ পাড়ে প্রবিষ্ট হয়েছে। বি

ত

তকবির—'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি [আ.]
তক্কাতক্কি—তর্কাতর্কি। বি
তন—হইতে ঃ থেকে। অব্য.

তয়—তাহা হইলে ঃ তাহলে, তবে। অব্য
তলক—কড়া, ঝাঁঝালো। বিণ. [ফা. তল্‌খ]
তসবি—মুসলমানি জপমালা। বি [আ. তস্‌বীহ]
তাম্‌শা—তামাশা, মজা। বি [আ. তমাশা]
তামুক—তামাক।
তারিফ—প্রশংসা। বি [আ. তা'রিফ]
তালিম—শিক্ষা, প্রশিক্ষণ। বি [আ. তাআলীম]
তিরখণ্ড—ত্রিখণ্ড, তিনখণ্ড।
তিরতিরে—সামান্য, অল্প। বিণ.
তেড়েংবেড়েং—তেড়িবেড়ি, টালবাহানা।
তেলামাখি—তেলা মাখানো (অন্যের শরীরে); হীনভাবে খোশামোদ।
তোতাশলা ও মুইন্যাশলা—হালের ওপর দিকে মুইন্যাশলা ও তার নিচে উল্টো দিকে তোতাশলা থাকে। এ দুই কাঠের শলা ধরে হালে গুড়ি মারা হয়। বি
তোলা—হাট-বাজারের মালিক বা জমিদারের তরফ থেকে বিনামূল্যে গৃহীত পণ্যের অংশ। বি
তৌজি—বিশেষ এলাকার প্রজাগণের নাম এবং তাদের জমি ও খাজনার পরিমাণের সরকারি তালিকা। বি [আ.]
ত্বরাত্বরি—তাড়াতাড়ি। ক্রিবিণ. [সং ত্বর+ত্বরিত]
ত্বরাহুড়া—তাড়াহুড়া। বি

থ

থইলতদার—চোরাই মাল যে গচ্ছিত রাখে। বি
থিকা—হইতে ঃ থেকে। অব্য.
থুইয়া—রাখিয়া ঃ রেখে। ক্রি

দ

দলামুচড়ি—মোচড়ের ফলে পিণ্ডাকার। ক্রিবিণ.
দাঁত-কপাট—দাঁতে দাঁত লাগা অবস্থা। বি
দাউন—এক ডোরে বা রশিতে পরপর বাঁধা অনেক বড়শি। বি
দিছে—দিয়েছে ঃ দিয়েছে। ক্রি
দিমু—দিব ঃ দেব। ক্রি
দিঘে-পাশে—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। ক্রিবিণ.
দুইডা, দুইট্টা—দুইটা ঃ দুটো। বিণ.
দুইন্যায়—দুনিয়া, পৃথিবীতে। বি
দুদু—বাপের ছোটভাই, খুড়ো, চাচা। বি
দুফর—দ্বিপ্রহর ঃ দুপুর। বি
দেইখ্যা—দেখিয়া ঃ দেখে। ক্রি
দেগা—দে গিয়ে। ক্রি
দেশকুলের মেয়ে—দেশের (চর নয় এমন স্থানের) বংশীয় ঘরের মেয়ে।
দেহি—দেখি। ক্রি
দোয়াইর—মাছ ধরবার বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি ফাঁদ। বি
দ্যাখছনি—দেখিয়াছ নাকি ? ঃ দেখেছ নাকি ? ক্রি

ধ

ধলপহর—সূর্যোদয়ের আগে যখন আকাশ ধলা (সাদা, ফরসা) হয়ে ওঠে। বি [সং ধবল+প্রহর]
ধুইন্যা—ধুনিয়া ঃ ধুনে, ভর্ৎসনা করে তুলোর মত ছিন্নভিন্ন করে। ক্রি
ধোয়া-পাখলা—মেজে-ধুয়ে পরিষ্কার করা। [ধোয়া+সং প্রক্ষালন]

ন

নওল—নবীন [ব্রজবুলি, যেমন নওল কিশোর-নব কিশোর, কৃষ্ণ]
নসিহত—সংশোধনের জন্য উপদেশ ও ভর্ৎসনা। [আ.]
নাইয়র—শ্বশুরবাড়ি থেকে আরাম ভোগ করতে বাপের বাড়ি অল্প কালের জন্য গমন। [হি. নইহর]
নাইম্যা—নামিয়া ঃ নেমে। ক্রি
নাদান—অবোধ, অবিবেচক। বি বিণ. [ফা.]
না-মরদ—কাপুরুষ। বি
নিকা—বিধবা বিবাহ অথবা তালাক দেয়া স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ। বি [আ. নিকাহ্—বিবাহ]

প

পইড়্যা—পড়িয়া ঃ পড়ে। ক্রি
পক্ষীর গুঁড়া—পাখির বাচ্চা, বাচ্চা পাখি।
পয়দা—জন্ম। বি [ফা.]
পয়স্তি—নদীতে ভেঙে যাওয়ার জমির স্থানে আবার চর পড়া। বি [ফা. পয়বস্ত, [বি বিপ. শিকস্তি]
পরামিশ—পরামর্শ। বি
পাইজ্যামি—পাজিপনা, হীনকাজ। বি
পাইন—লোহার অস্ত্রাদির ধার ওঠাবার জন্য ঝালাই।
পাও—পা। বি
পাছড়া-পাছড়ি—জাপটে ধরে পরস্পরকে কাবু করার চেষ্টা, ধস্তাধস্তি। বি
পাট্টি—বিপক্ষ পাট্টির (দলের) সবাইকে মেরে জয়লাভ; লোনা; হা-ডু-ডু খেলায় বিপক্ষ দলের সবাইকে ধরে বা ছুঁয়ে মারতে পারলে এক পাট্টি হয়। [ইং *party*]
পাডাতন—পাডাতন, মাচা। বি
পাড়া গাড়া—খোঁটা পুঁতে নৌকা বাঁধা। ক্রি
পাড়াইয়া চডাইয়া—মাড়াইয়া-চটকাইয়া ঃ মাড়িয়ে-চটকিয়ে। ক্রি
পাতনা—চর ভাঙ্গার পর বা কোনো কারণে ঘর-দরজা নিয়ে অন্যত্র গিয়ে কিছুকালের জন্য খুঁটিহীন চালের নিচে অবস্থান। (কেহ যায়রে হাঁসের কাঁদি, কেহ খিলগাঁয় কেহ কেহ পাতনা দিয়ে বসে দিন কাটায়।–জয়চন্দ্র ভট্ট)
পাতালি—আড়াআড়ি। ক্রিবিণ.
পানিয়াল—পানিযুক্ত, জলীয় বাষ্পযুক্ত। বিণ.
পারন—বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি বড় মাছ ধরার ফাঁদ।

পারমু—পারিব ঃ পারব। ক্রি
পালি—পাইলি ঃ পেলি। ক্রি
পিড়া—মাটির মেঝের যে অংশ বেড়ার বাইরে ঘরের চারদিকে জুড়ে থাকে। বি
পুত্রা—ছেলের শালা-সম্বন্ধী বা মেয়ের দেবর-ভাশুর। বি
পুনুপুনু—আস্তে আস্তে। ক্রিবিণ.
পুলকি-মাতব্বর—অল্পবয়স্ক মাতব্বর।
পূন্নিমা—পূর্ণিমা। বি
পেডি—পেটি, মাছের পেটের অংশ। বি
পোয়াত্যা তারা—প্রভাতী তারা, শুকতারা, শুক্রগ্রহ। বি
পোস্তা—সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। [ফা. পুশতাহ্]
প্যাট—পেট। বি
প্যাডেল ঝুলি—পেটের নাড়িভুঁড়ি। বি

ফ

ফতে—বিজয়। বি; সিদ্ধ, হাসিল বিণ. [ফ. ফতহ্]
ফরজ গোছল—সহবাসের পর অবশ্যকরণীয় স্নান।
ফাইট্যা—ফাটিয়া ঃ ফেটে। ক্রি
ফালাইয়া—ফেলিয়া ঃ ফেলে। বি
ফিরা আওড়—উল্টো দিকে গতিশীল আবর্ত।
ফির‍্যা—ফিরিয়া ঃ ফিরে। ক্রি
ফুক্কা—ফাঁকা, শূন্য। বিণ,
ফেরেববাজ—প্রবঞ্চক, দাগাবাজ। বিণ. [ফা. ফরেব—ধোকা, প্রবঞ্চনা]
ফ্যাজাগোজা—হাবজা-গোবজা, হাবড়-জাবড়; রসকষহীন আবর্জনা। বি

ব

বইচনা—বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ।
বইস্যা—বসিয়া ঃ বসে। ক্রি
বউকনা—মাটির পাত্রবিশেষ। বি
বচ্ছর—বৎসর ঃ বছর। বি
বন্দ—পরিমাণ (তিরিশের বন্দ ঘর-১৮ হাত লম্বা এবং ১২ হাত চওড়া ঘর) বি [ফা. বন্দ]

বয়সউমরে—বয়সকালে।
বরই কাঁটা—কুল-কাঁটা। [সং বদরী; হি. বইর]
বাইছা—মাঝি। বি [বাইচ+আ, (প্র.)]
বাইজ্যা—বাঁধিয়া ঃ বেঁধে; আটকাইয়া ঃ আটকে। ক্রি
বাইতা বাইতা—বমি বমি ভাব। ক্রিবিণ. [বাইত (সং বান্তি=বমি)]
বাইয়া—গড়াইয়া ঃ গড়িয়ে। ক্রি
বাঁইয়া পা—বাম পা।
বাইল্যা—বাবুই পাখি। বি
বাইল্যা মাছ—বেলে মাছ। বি
বাও—বাতাস। বি [সং বায়ু]
বাইন্দা—বাঁধিয়া ঃ বেঁধে। ক্রি
বাঁইচ্যা—বাঁচিয়া ঃ বেঁচে। ক্রি
বাগাড়—সম্বরা, ফোড়ন। বি [সং সম্ভার]
বাজান—বাবাজান, শ্রদ্ধেয় পিতা। বি
বাট্টি—বাটি, পেয়ালা। বি
বানা—বাঁশের শলা রশি দিয়ে বুনিয়ে যে বেড়া তৈরি করা হয়; চালি। বি

বারহায় বারহায়—বারম্বার, বারবার অব্য. [ফা. বারহা—অনেক বার]

বারালি—কলাগাছের কাণ্ডের মধ্যেকার সাদা অংশ। বি
বালিগচা—কাঠ বা সুপরি গাছের বাখারি যার ওপর বালি রেখে দা, ছুরি ইত্যাদি ধারানো হয়। বি [বালি+গাছ+আ (প্র.)]
বাহারিয়া—সুন্দর, ভালো। বিণ. [ফা, বাহার]
বিচরাইছি—খুঁজিয়াছি ঃ খুঁজেছি। [ক্রি সং বিচয়ণ—অন্বেষণ]
বিয়ানে—ভোরে, প্রভাতে। বি [সং বিভাত]
বিয়ালে—বিকালে, বিকেল বেলায়। বি
বু'—বুবু, বোন। [বি হি. বুবু]
বুইজ্যা—বুজিয়া ঃ বুজে, বন্ধ করে। ক্রি
বেইচ্যা—বেচিয়া ঃ বেচে। বিণ.
বেউঁশ—বেহুঁশ, মূর্ছিত। বিণ.
বেবাক—সমস্ত, সমুদয়। বিণ. [ফা. বে+আ. বাকী]
বেবাক—যার বুঝবার শক্তি নেই। বিণ.
বেরুয়া—যে বাঁশের দণ্ড কাঁধে ঠেকিয়ে গুন টানা হয়। বি
বেলকুঁড়ি কাঁটা—বেলফুলের কুঁড়ির মতো পুঁতি বসানো খোঁপার কাঁটা।
বৈডক—বৈঠক, সভা, অধিবেশন। বি [হি. বৈঠক]
বৈডা—বৈঠা। বি
বৌকা—মাছ রাখার পাত্র। বি
বোকাট্টা—প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘুড়্ডি কেটে দেয়ার সাফল্যে জয়ধ্বনি বা আনন্দধ্বনি। অব্য.
বোলাইয়া—ডাকিয়া ঃ ডেকে। ক্রি [বুলানো তু বুলানা হি]

ভ

ভরতা—পেঁয়াজ, মরিচ ও সর্ষের তেল সহযোগ চটকানো খাদ্য। বি
ভর্দলোক—ভদ্রলোক। বি
ভস্‌সা—ভরসা, আশা, আশ্রয়, নির্ভর অবলম্বন। বি [হি. ভরোসা]
ভাইট্‌টাইয়া—ভাটি পানিতে ভাসিয়া গিয়া ঃ ভাটিয়ে। ক্রি
ভাওর ঘর—দূরের বা নতুন চরের জমিতে চাষীদের অস্থায়ী বাসের ঘর। বি
ভাগবাট্‌রা—ভাগ-বাটোয়ারা। বি
ভাল্ মাইন্‌ষের—ভালো মানুষের, ভদ্রলোকের।
ভুড্‌ড—ভীত বা পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশ্যে টিটকারি।
ভোক্ষস—ভুখা রাক্ষস। বি
ভোলতে—ভুলিতে ঃ ভুলতে।
ভ্যাদা—ভেদা, মৎস্যবিশেষ। কোনো কোনো অঞ্চলে মেনি বা রয়না মাছও বলে।

ম

মইদ্যে—মধ্যে, মাঝে, ভেতরে। বি ক্রিবিণ.
মকসেদ—অভিপ্রায়, অভীষ্ট। বি [আ. মক্‌স'দ]
মহরানা—দেনমহর, বিয়ের সময় স্ত্রীকে যে স্ত্রীধন দিতে স্বামী অঙ্গীকার করে। বি
মাইন্‌ষের—মানুষের।
মাইপ্যা—মাপিয়া ঃ মেপে। ক্রি
মাইয়া—মেয়ে। বি
মাইর—মারামারি। বি
মাগ্‌না—বিনামূল্যে। বিণ,
মাডার—খুন, হত্যা। বি [ই *murder*]
মাডি—মাটি। বি
মাড়ুয়া নাও—মাড়ুয়াখোর পশ্চিম-দেশীয়দের নৌকা [মাড়ুয়া—বাজরা-জাতীয় শস্য-বিশেষ]
মাতবর, মাতব্বর—প্রধান, মোড়ল। বি [আ. মু'আ'তবর]
মাতায়—মাথায়।
মানদার কাঁটা—মাদার গাছের কাঁটা। [সং মন্দার]
মারু ডাকাইত—মারকুটে হিংস্র ডাকাত।

মালামত—শায়েস্তা, তিরস্কার। কি [আ. মালামত]
মহাজন—মহাজন। বি
মিডাইয়া—মিটাইয়া ঃ মিটিয়ে। ক্রি
মিন্নত—মেহনত, পরিশ্রম। বি
মিয়াজি—শ্বশুর। বি
মিরদিনা—মেরুদণ্ড। বি
মিল্যা—মিলিয়া ঃ মিলে। ক্রি
মুইন্যাশলা—তোতাশলা দ্রষ্টব্য।
মুরিদান—শিষ্য। বি [ফা. মুরিদান]
মুহূর্তুক—এক মুহূর্ত, [মুহূর্ত+এক]
মেকুর—বিড়াল। বি
মোখ—মুখ। বি
মোচড়া—মোচড় দিয়ে পাকানো ও শুকানো তামাক পাতা। বি
মোট্টা—মোটা
মোনাজাত—প্রার্থনা। বি [ফা. মুনাজাত]

য

যেমবায়—যেমনভাবে। ক্রিবিণ,

র

রফটের জুতা—রাবারের জুতা।
রাইখ্য—রাখিও ঃ রেখো। ক্রি
রাইখ্যা—রাখিয়া ঃ রেখে। ক্রি
রান্দন—রন্ধন। বি
রাব—চিটাগুড়। বি
রাহেলিল্লাহ—আল্লাহ রাস্তায় (কোনো দাবি না রেখে)। [ফা. রাহ—রাস্তা]
রুহ্—রুহ্, আত্মা। বি [আ. রুহ]
রেকট—রেকর্ড, দলিল। বি [ইং *record*]
রোজানা—দৈনিক বেতন। বি [ফা. রোযানা]

ল

লগে—সঙ্গে, সাথে। অব্য.
লটা—এক প্রকার ঘাস।
লপ্তে—লাগাও, সংলগ্ন স্থানে। বি [সং লিপ্ত]
লম্ফা—লম্বা, দীর্ঘ। বিণ.
লাইথ্থাইয়া—লাথি মারিয়া ঃ লাথি মেরে। ক্রি
লাগুড়—নাগাল। বি
লাডি—লাঠি। বি
লাফ্ফা—লাফ, লম্ফ
লায়েক—যোগ্য, সমর্থ, সাবালক। বিণ
লেইখ্যা—লিখিয়া ঃ লিখে, ক্রি
লেইগ্যা—লাগিয়া (কাব্যে). জন্য। অব্য.
লেংডি—লেঙ্গি, হা-ডু-হু খেলায় বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ছুঁয়ে মারার উদ্দেশ্যে হঠাৎ পা চালনা।
লেদুফেদু—চট্পটে নয় এমন ছেলে-ছোকরা। বি
লোট—উখলি, উদুখল। বি
লোসকান—লোকসান।
লোহারু—লোহার, কর্মকার।
ল্যাগবেগা—নড়বড়ে, যেন খসে যাবে এরূপ শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট; নরম ও দুর্বল। বিণ.

শ

শরীল—শরীর। বি
শাচক—কনেপক্ষকে দেয় বিয়ের পণ। বি
শিকস্তি—নদীর ভাঙনে বিনষ্ট। বিণ [ফা. শিক্স্ত—বিনাশ। বিপ. পয়স্তি]
শুঁয়াসম্বল—এক প্রকার বুনো ফল যার রেণু গায়ে গাললে সাংঘাতিক চুলকায়।
শুদ্দা—সহ। অব্য.
শুমার করা—গুনে শেষ করা। ক্রি [ফা. শুর্দু—শুদ্ধ। বিণ,
শেরাদ্দ—শ্রাদ্ধ, মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-পূর্বক অন্নাদি দান। বি
শোঁশাইয়া—উর্ধ্বশ্বাসে, শোঁ-শোঁ শব্দ করে। ক্রি বিণ.
শোকরগুজারি—কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বি [আ. শুক্র্]
শোদ—শোদ। বি
শোশা—শসা। বি

স

সইন—সাইন দস্তখত [ইং *Sign.*]
সওয়াব—পূণ্য। বি
সওয়াল—প্রশ্ন। বি
সন্দ—সন্দেহ। বি
সবক—পাঠ, শিক্ষা। বি [আ.]
সর্মান—সম্মান। বি
সাঁতলানো—জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করে রাখ। বিণ.
সরদা আইন—বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত উনিশ নম্বর আইন)। ভারতীয় আইনজ্ঞ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হরবিলাস সারদার প্রস্তাবে এই আইনটি প্রবর্তিত হয়।
সুলুপ—মালবাহী পালে-চলা পোত-বিশেষ। [ইং স্লুপ]
সোঁতা—নদীর ধীরে প্রবহমান অগভীর শাখা। বি
সোনাদানা—নানা ধরনের সোনার অলঙ্কার। বি

হ

হউর-হাউড়ি—শ্বশুড়-শাশুড়ি। বি
হক-হালালের জমি—ন্যায্য প্রাপ্য বৈধ জমি।
হট্টিটি—টিট্টিভ পাখি।
হবরি ক্যালা—শবরি কলা, মর্তমান কলা।
হবিরে—সকালে, তাড়াতাড়ি। ক্রিবিণ. [হি. সরিবে]
হমান—সমান। বিণ.
হমুন্দির পুত—স্ত্রীর বড় ভাইয়ের ছেলে (গালিবিশেষ)
হরদারি—সরদারি। বি
হাউজ্যা—সাঁঝের, সন্ধ্যাকালের। বিণ
হাঁতরাইয়া—সাঁতরাইয়া ঃ সাঁতরে। ক্রি
হাংগাল-বাংগাল—অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ লোক। বি

হাইল্যা—যে হাল চালায়, চাষী। বি
হাজাহাজি—সাজাসাজি। বি
হাতুয়া পোলা—আউত্যা দ্রষ্টব্য।
হানদাইয়া—ঢুকাইয়া ঃ ঢুকিয়ে, সেঁধিয়ে। ক্রি
হাপন—আপন। বি. বিণ
হাবিয়া দোজখ—বড় নরক। বি
হামতাম—গণ্ডগোল তাড়াহুড়া। বি
হামাহামি—আস্ফালন, তর্জন-গর্জন। বি
হালট—হালের গো-মহিষাদির চলার নিচু রাস্তা। বি
হালা—শালা। বি
হিগলে—শিখলে। ক্রি
হিগে নাই—শিখে নাই। ক্রি
হিদ্দ—সিদ্ধ। বিণ.
হিম্মত—সাহস। বি [আ.]
হুইন্যা—শুনিয়া ঃ শুনে। ক্রি
হুইয়া—শুইয়া ঃ শুয়ে। ক্রি
হুইসাল—হুইস্‌ল্‌, সিটি। বি [ই *whistle*]
হুগনা—শুকনা ঃ শুকনো। বিণ.
হুগাইয়া—শুকাইয়া ঃ শুকিয়ে।
হুতি দিয়া—মাথা নিচু করে লুকিয়ে। ক্রি
হুনতে—শুনতে ঃ শুনতে। ক্রি
হুনলাম—শুনিলাম ঃ শুনলাম।
হুনলে—শুনিলে ঃ শুনলে। ক্রি
হুনা—শোনা। ক্রি
হুন্‌লি—শুনলি। ক্রি
হুনি নাই—শুনি নাই। ক্রি
হেই—সেই। বিণ.
হেফাজত—রক্ষণাবেক্ষণ। ক্রি
হেমবায়—সেভাবে। ক্রিবিণ.
হেষে—শেষে। ক্রিবিণ.
হোন—শোন। ক্রি
হ্যাংমাইঙ্গা—ভীরু, কাপুরুষ। বি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG